

কিতাবুল ঈমান

শাইখুল ইসলাম ইবনে
তাইমিয়ার(রাঃ)
মতানুযায়ী

মূল : ড. মুহাম্মাদ নাজ্জিম
ইয়াসিন

অনুবাদ : ড. মাওলানা শামসুল হক সিদ্দিক



কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ১ : ঈমানের আরকান বা স্তম্ভসমূহ

ঈমানের আরকান বা স্তম্ভসমূহ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَمَلَائِكَتِهِ بِأَلَلِهِ أَمَّنَ كُلُّ وَالْمُؤْمِنُونَ رَبِّهِ مِنْ إِلَيْهِ أُنْزِلَ بِمَا الرُّسُولُ أَمَّنَ
الْمَصِيرُ وَإِلَيْكَ رَبَّنَا غُفْرَانُكَ وَأَطْعْنَا سَمِعْنَا وَقَالُوا رُسُلِهِ مِنْ أَحَدٍ بَيْنَ رُقُوفٍ لَا

‘রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নায়িলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর, আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল’ - (সূরা আল বাকারা : ২৮৫)

তিনি অন্য এক আয়াতে বলেন ,

وَالْكِتَابِ رُسُولِهِ عَلَى نَزَلِ الَّذِي وَالْكِتَابِ وَرُسُولِهِ بِأَلَلِهِ أَمَّنُوا أَمَّنُوا لَّذِينَ أَيْهَا يَا
ضَلَالًا ضَلَّ فَقَدْ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَمَلَائِكَتِهِ بِأَلَلِهِ يَكْفُرُ وَمَنْ قَبْلُ مِنْ أُنْزِلَ الَّذِي
بَعِيدًا

‘হে মুমিনগণ, তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের ওপর নায়িল করেছেন এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি পূর্বে নায়িল করেছেন। আর যে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং শেষ দিনকে অস্বীকার করবে, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হবে’ - (সূরা আন-নিসা : ১৩৬)

তিনি আরও বলেন ,

وَالْيَوْمِ بِأَلَلِهِ أَمَّنَ مَنْ الْبِرِّ وَلَكِنَّ وَالْمَغْرِبِ الْمَشْرِقِ قَبْلَ وَجْهِكُمْ ثَوَّلُوا أَنْ الْبِرِّ لَيْسَ
تُيَيَّنُ وَالْكِتَابِ وَالْمَلَائِكَةِ الْآخِرِ

‘ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাবে; বরং ভালো কাজ হলো যে ঈমান আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি’ - (সূরা আল-বাকারা : ১৭৭)

প্রসিদ্ধ হাদিসে জিবরিল অনুযায়ী, জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জনৈক বেদুইন ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করে এলেন এবং ইসলাম, ঈমান ও ইহসান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি ঈমান সম্পর্কে বলেছেন ,

وشره خيره بالقدر وتؤمن الآخر، واليوم ورسله وكتبه وملائكته با لله تؤمن أن

অর্থাৎ ‘তুমি ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও পরকালের প্রতি এবং ঈমান আনবে ভাগ্যের ভালোমন্দের প্রতি।’

এ ছয়টি বিষয় হলো ঈমানের আরকান। এ গুলো হলো মৌলনীতি যা দিয়ে রাসূলগণকে (আলাইহিস সালাম) পাঠানো হয়েছে।এবং আসমানি কিতাব নায়িল করা হয়েছে। এ ছয়টি বিষয়ের সবকটিতে যদি কেউ ঈমান না আনে, তবে তার ঈমান পূর্ণাঙ্গ হবে না। আর এ ঈমান হতে হবে ঠিক সেভাবে যেভাবে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নতে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি এসবের কোনো একটি অস্বীকার করবে, সে ঈমানের সীমানা থেকে বের হয়ে যাবে এবং কাফেরদের দলভুক্ত হয়ে পড়বে।

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ২ : আল্লাহর প্রতি ঈমান

আল্লাহর প্রতি ঈমান

আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ- এ মর্মে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তাআলা সকল জিনিসের রব, মালিক, সৃষ্টিকর্তা এবং একমাত্র তিনিই ইবাদত পাবার উপযোগী। যেমন নামাজ, রোজা, দুআ, আশা, ভয়, বান্দার হীনতা-দীনতা, অধীনস্থতা ইত্যাদি পাবার উপযোগী এবং তিনি পূর্ণাঙ্গতার সকল গুণে গুণান্বিত, সকল অপূর্ণতা থেকে পবিত্র এবং সম্যক শ্রবণকারী।

অতএব আল্লাহর প্রতি ঈমান- রুবুবিয়াত, উলুহিয়াত, আসমা ও সিফাত (নাম ও গুণাবলি) এই তিন ক্ষেত্রে তাঁকে অদ্বিতীয় হিসেবে বিশ্বাস করাকে शामिल করে। এ তিন ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাকে অদ্বিতীয় মানার অর্থ রুবুবিয়াত, উলুহিয়াত, পূর্ণাঙ্গ গুণাবলি ও মহিমান্বিত নামসমূহ একমাত্র আল্লাহর জন্য সুনির্ধারিত, এ কথায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা। অতএব কোনো ব্যক্তিই মুমিন হবে না যতক্ষণ না সে বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তাআলাই সকল কিছুর রব, তিনি ছাড়া অন্যকোনো রব নেই। একমাত্র তিনিই সকলের অদ্বিতীয় ইলাহ, তিনি ছাড়া অন্যকোনো ইলাহ নেই। তিনি তাঁর গুণাবলি ও নামে কামেল-পূর্ণাঙ্গ এবং তিনি ছাড়া অন্য কেউ কামেল নয়।

এই তিন প্রকার তাওহিদের অর্থই হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান। তিন প্রকার তাওহিদের আলোচনাই ধারাবাহিকভাবে আসবে...

[দেখুন শারহুল আকীদা আত্-তাহাবিয়াহ ৭৬; তাইসিরুল আযীযিল হামীদ পৃ. ১৭; আর রাওয়া আন-নাদিইয়া, পৃ.৯ - আলেমদের কেউ কেউ এ তিন প্রকার তাওহিদকে দু-প্রকারে অনুপ্রবিষ্ট করে উল্লেখ করেন। একটি হলো ইলম ও ইতিকাদ অর্থাৎ জ্ঞান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাওহিদ, যাতে তাওহিদে রুবুবিয়াত ও তাওহিদে আসমা ওয়াস সিফাত অনুপ্রবেশ করে। আর-এক প্রকার হলো ইরাদা ও কাস্দ অর্থাৎ ইচ্ছার ক্ষেত্রে তাওহিদ, আর এটাই হলো তাওহিদে উলুহিয়াত। দেখুন শারহুল আকীদা আত্-তাহাবিয়াহ পৃ. ৮৮; ফাতহুল মাজীদ ১৫; তাতহীরুল ইতিকাদ পৃ. ৩।]

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৩ : প্রথম প্রকার : তাওহিদে রুবুবিয়াত

প্রথম প্রকার : তাওহিদে রুবুবিয়াত

সংক্ষিপ্তভাবে তাওহিদে রুবুবিয়াত হলো এ দুট বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তাআলা সকল জিনিসের রব এবং তিনি ছাড়া অন্যকোনো রব নেই।

বিশ্লেষণ : রব শব্দের আভিধানিক অর্থ, মালিক, বিধায়ক। [দেখুন আল মিসবাহুল মুনীর] আর সৃষ্টিজগতের ওপর আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়াতের অর্থ- সৃষ্টি, মালিকানা ও বিধায়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর তাআলার অদ্বিতীয়ত্ব। অতএব রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাকে অদ্বিতীয় মানার অর্থ হলো, স্বীকার করে নেয়া যে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সকল সৃষ্টির প্রস্টা, সকল সৃষ্টির মালিক। তিনি তাদের জীবনদাতা ও জীবন-নাশকারী, উপকারকারী ও অনুপকার-সাধক, তাদের অপারগতার মুহূর্তে তাদের ডাকে সাড়াদাতা, তিনি তাদের ওপর ক্ষমতাবান। একমাত্র তিনিই তাদের দাতা ও নিষিদ্ধকারী। সৃষ্টি তাঁরই, নির্দেশও তার। যেমন তিনি বলেছেন ,

وَالْأَمْرُ الْخَلْقُ لَهُ أَلَا

‘জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই’ - (সূরা আল-আরাফ , ৫৪)।

তাওহিদে রুবুবিয়াতে, ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসও শামিল। অর্থাৎ এ মহাবিশ্বে যা-কিছু ঘটে তা আল্লাহ তাআলার ইলম, ইচ্ছা ও ক্ষমতা থেকেই ঘটে। [দেখুন শারহুল আকীদা আত তাহাবিয়াহ পৃ.৭৬-৭৭; তাইসীরুল আযীযিল হামীদ পৃ.১৭-১৮]

এক কথায়, তাওহিদে রুবুবিয়াত হলো এ ব্যাপারে দুট বিশ্বাস পোষণ করা যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই এ মহাবিশ্বের সার্বভৌম বিধায়ক- সৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা, পরিবর্তন, সহজীকরণ, কমানো-বাড়ানো, জীবন ও মৃত্যু দান ইত্যাদি কর্মে আল্লাহর সঙ্গে কোনো অংশীদার নেই। আল্লাহ তাআলা আল কুরআনে তাওহিদের এ প্রকারকে অত্যন্ত স্পষ্টাকারে ব্যক্ত করেছেন। এমনকি আল কুরআনের এমন কোনো সূরা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে, যেখানে তিনি এ প্রকার তাওহিদের কথা বলেননি- সরাসরি অথবা ইশারা-ইঙ্গিতে; এর কারণ তাওহিদের অন্যান্য প্রকারগুলি তাওহিদে রুবুবিয়াতের ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত; কেননা যিনি সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও ব্যবস্থাপক একমাত্র তিনিই ইবাদত ও খুশখুয়ু পাবার হকদার, প্রশংসা-শোকর-যিকির-দুআ-আশা-ভয় ইত্যাদি পাওয়ার উপযোগী। আর সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র সেই সত্তার জন্যই পেশ করা শুদ্ধ হবে যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টিজগতে সকল নির্দেশের মালিক। [দেখুন তাফসিরে তাবারী ৫/৩৯৫; শারহ মুল্লা আলী কারী আলাল ফিকহিল আকবার পৃ. ৯]

অন্য দিকে যিনি সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও বিধায়ক তিনিই সকল মহিমাম্বিত গুণ, সৌন্দর্য ও পূর্ণতার অধিকারী; এ সব গুণ রাব্বুল আলামীন ছাড়া আর কারও থাকতে পারে না। কারণ রুবুবিয়াত ও মহাবিশ্বের সার্বভৌম রাজত্ব এমন কারও জন্য নির্দিষ্ট হতে পারে না যে জীবিত নয়, যে সম্যক শ্রবণকারী ও সম্যক দ্রষ্টা নয়, যে সম্যক ক্ষমতাবান নয়, যে কথা বলতে পারে না, যা-ইচ্ছা তাই করতে পারে না এবং যে তার কথায় ও কর্মে প্রজ্ঞাবান নয়। [ফাতহুল মাজীদ পৃ.১৩]এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, আল কুরআনের যেখানে আল্লাহর প্রশংসা, ইবাদত ও আনুগত্যের অনুশঙ্গ এসেছে অথবা আল্লাহর মহিমাম্বিত নাম ও গুণের উল্লেখ এসেছে সেখানে এ প্রকার তাওহিদের কথা এসেছে। যেমন ,

প্রশংসার স্থল

একজন মুসলিম নামাজের প্রতিরাকাতেই তিলাওয়াত করে বলে , اَلْغَالَمِينَ رَبُّهُمُ الْحَمْدُ (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের রব) [সূরা আল ফাতিহা ১ আয়াত]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ,

اَلْغَالَمِينَ رَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ السَّمَاوَاتِ رَبُّ الْحَمْدِ فَلِلَّهِ

‘অতএব আল্লাহরই জন্য সকল প্রশংসা, যিনি আসমানসমূহের রব, জমিনের রব ও সকল সৃষ্টির রব’ – (সূরা আল জাছিয়া , ৩৬)।

আল্লাহর জন্য অনুগত হওয়া ও আত্মসমর্পণ করার স্থল

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَسْلِمُوْا لِرَبِّ لِيُنْصِلَكُمْ وَاَمْرًا اَلٰهٰدٰى هٰذَا اِنَّ قُلَّ

‘বল, ‘আল্লাহর পথই সঠিক পথ। আর আমরা রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য করতে আদিষ্ট হয়েছি’ – (সূরা আল আনআম , ৭১)।

আল্লাহর জন্য ঐকান্তিকতা ও একনিষ্ঠতা প্রকাশের স্থল

اَلْعٰلَمِيْنَ رَبُّ اللّٰهِ وَمَمَاتِيْ وَمَحْيَايْ وَتُسْكِيْ صَلَاتِيْ اِنَّ قُلَّ

‘বল, ‘নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব’ – (আল আনআম , ৭১)।

অন্য কাউকে নয়, বরং একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই পরম বন্ধু হিসেবে সাব্যস্ত করার স্থল

اَنْ اُمِرْتُ اِنِّيْ قُلُّ يٰطَعُمْ وَلَا يٰطَعُمْ وَهُوَ لَا رُفُوْا السَّمٰوٰتِ فَاطِرٌ وَلِيًّا اَتَّخِذُ اللّٰهُ اَعِيْرَ قُلَّ
اَلْمُشْرِكِيْنَ مِنْ تَكُوْنُ وَلَا اَسْلَمَ مَنْ اَوَّلَ اَكُوْنُ

‘বল, ‘আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করব, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা? তিনি আহার দেন, তাঁকে আহার দেয়া হয় না। বল, ‘নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে যেন আমি তাদের প্রথম হই’। আর তুমি কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না’ – (সূরা আল আনআম , ৬৪)।

দুআর স্থল

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَسْلِمُوْا لِرَبِّ لِيُنْصِلَكُمْ وَاَمْرًا اَلٰهٰدٰى هٰذَا اِنَّ قُلَّ
اَلْمُشْرِكِيْنَ مِنْ تَكُوْنُ وَلَا اَسْلَمَ مَنْ اَوَّلَ اَكُوْنُ

‘জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই। আল্লাহ মহান, যিনি সকল সৃষ্টির রব। তোমরা তোমাদের রবকে ডাক অনুনয় বিনয় করে ও চুপিসারে। নিশ্চয় তিনি পছন্দ করেন না সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে’ – (সূরা আল আরাফ , ৫৪-৫৫)।

ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই, এ কথা বর্ণনার স্থলে ,

تَرْجِعُوْنَ وَاِلَيْهِ فَرَّطَنِي الَّذِيْ اَعْبُدُ لَا لِىْ وَمَا

‘আর আমি কেন তাঁর ইবাদত করব না যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন? আর তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে’ – (সূরা ইয়াসীন , ২২)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ,

اَلَّذِيْ . تَتَّقُوْنَ لَعَلَّكُمْ قَبْلَكُمْ مِنْ وَاَلَّذِيْنَ خَلَقَكُمْ الَّذِيْ رَبُّكُمْ اَعْبُدُوْا النَّاسُ اِيْهَا يٰ
اَلثَّمَرَاتِ مِنْ بِيْهِ فَاَخْرَجَ مَّاءَ السَّمٰوٰتِ مِنْ وَاَنْزَلَ بِنَاءً وَالسَّمٰوٰتِ فِرَاشًا اَلْاَرْضَ لَكُمْ جَعَلَ
تَعْلَمُوْنَ وَاَنْتُمْ اَنْدَادُ اللّٰهِ تَجْعَلُوْا فَلَا لَكُمْ قَارِزُ

‘হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে করেছেন বিছানা,

আসমানকে ছাদ এবং আসমান থেকে নামিল করেছেন বৃষ্টি। অতঃপর তাঁর মাধ্যমে উৎপন্ন করেছেন ফল-ফলাদি, তোমাদের জন্য রিমিকস্বরূপ। সুতরাং তোমরা জেনে-বুঝে আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না' - (সূরা আল বাকারা , ২১-২২)

অতএব আকাশ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যে যা আছে সব-কিছু যিনি সৃষ্টি করেছেন, একমাত্র তিনিই উপযোগী যে মানুষ তাঁকে ইলাহ ও সর্বময়-কর্তা হিসেবে সাব্যস্ত করবে এবং তাঁর সমীপে নিজকে সমর্পণ করবে। অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই যে, আল কোরান- আসমান ও জমিনে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর রাজত্ব-আধিপত্য এবং আসমায়ে হুসনা ও গুণমাধুরী একত্র করে উল্লেখ করেছে। আয়াতুল কুরসিতে এ বিষয়টি স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। ইরশাদ হয়েছে ,

فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا لَهُ نَوْمٌ وَلَا سِنَّةٌ تَأْخُذُهُ لَا الْقِيَوْمُ الْحَيُّ هُوَ إِلَّا إِلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُحِيطُونَ وَلَا خَلْفَهُمْ وَمَا بَيْنَ مَا يَعْلَمُ ذُنُبُهُمْ إِلَّا عِنْدَهُ يَشْفَعُ الَّذِي ذَا مَنْ الْأَرْضِ وَهُوَ حِفْظُهُمَا يَتُودُهُ وَلَا وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ كُرْسِيُّهُ وَسِعَ شَاءَ بِمَا إِلَّا عِلْمِهِ مِنْ بَشْيٍ الْعَظِيمِ الْعَلِيِّ

‘আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরজীব, সুপ্রতিষ্ঠিত ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। তাঁর জন্যই আসমানসমূহে যা রয়েছে তা এবং জমিনে যা আছে তা। কে সে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা আছে তাদের পেছনে। আর তারা তাঁর জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ত করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ছাড়া। তাঁর কুরসি আসমানসমূহ ও জমিন পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং এ দু’টোর সংরক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ, মহান - (সূরা আল বাকারা , ২৫৫)।

অতএব যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা তিনিই হলেন চিরজীব, চিরন্তন, সর্বজ্ঞানী, মহারক্ষক, মহত্তম, মহামহিম।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ,

الْوَرِيدِ حَبْلٍ مِنْ إِلَيْهِ أَقْرَبُ وَنَحْنُ نَفْسُهُ بِهِ تُوسَّوْسُ مَا وَنَعْلَمُ الْإِنْسَانَ خَلَقْنَا وَلَقَدْ

‘আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমি জানি। আর আমি তার গলার ধমনী হতেও অধিক কাছে - (সূরা ক্বাফ , ১৬)।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন ,

الْخَيْرِ اللَّطِيفُ وَهُوَ خَلَقَ مَنْ يَعْلَمُ إِلَّا

‘যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী, পূর্ণ অবহিত’ - (সূরা আল মুলক , ১৪)।

উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে আমরা নিঃসন্দেহে জানতে পারি যে, যিনি সকল সৃষ্টির স্রষ্টা, তিনিই তাদের মহাপর্যবেক্ষক, তিনি তাদের সবকিছুর ব্যাপারে অতি সূক্ষ্মদর্শী, পূর্ণ অবহিত।

আর যারা স্বীকার করে যে আল্লাহ তাআলা সকল জিনিসের রব এবং সকল জিনিসের স্রষ্টা, কিন্তু উলুহিয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে অদ্বিতীয় হিসেবে বিশ্বাস করে না, বরং ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করে, অনুরূপভাবে আল্লাহর নাম ও গুণসমগ্রের ক্ষেত্রেও তাঁকে অদ্বিতীয় হিসেবে সাব্যস্ত করে না, বরং তা বাতিল করে দেয়, অথবা সৃষ্টিজীবের কোনো গুণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ করে ব্যক্ত করে, অথবা ঐর বিকৃত কোনো তাবীল-ব্যাখ্যা দাঁড় করায়, তাহলে এমন তাওহিদ তাদের কোনো উপকারে আসবে না। এ ধরনের তাওহিদ তাদের কুফর থেকে বের করে ঈমানের বলয়ে আনবে না। আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, তারা স্বীকার করত- একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সব-কিছুর স্রষ্টা, কিন্তু এ স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও তারা

মুশরিকই থেকে গিয়েছে। [দেখুন শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ পৃ. ৭৯; ফাতহুল মাজীদ পৃ. ১৭; তাইসীরুল আযীযিল হামীদ পৃ. ১৭; তাত্হীরুল ইতিকাদ পৃ. ৫]

কারণ তারা উলুহিয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে অদ্বিতীয় হিসেবে মানেনি। বরং তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরও ইবাদত করেছে। আল্লাহর নাম ও গুণসমগ্রের ক্ষেত্রেও তাকে অদ্বিতীয় মানেনি। বরং এসবের কিছু তারা অস্বীকার করেছে, অবিশ্বাস করেছে। আল্লাহর তাআলা বলেন ,

مُشْرِكُونَ وَهُمْ لَا يَاللَّهِ أَكْثَرُهُمْ يُؤْمِنُ وَمَا

‘তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তবে (ইবাদাতে) শির্ক করা অবস্থায়’ - (সূরা ইউসূফ , ১০৬)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত কোরান ব্যাখ্যাকার মুজাহিদ বলেছেন, ‘إيمانهم بالله إن قولهم با الله إيمانهم’ ‘আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমানের অর্থ হলো- তারা বলত, আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদের রিযিক দান করেন এবং মৃত্যু দেন।’ এটা এমন ঈমান যার সঙ্গে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদতের ক্ষেত্রে শরীক করা হয়। [তাকসিরে তাবারী ১৬/২৮৭]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সালাফদের একটি দল বলেছেন, ‘তাদের যদি জিজ্ঞাসা কর- কে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন? উত্তরে তারা বলবে, আল্লাহ। তারা এ স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করে যায়।’ [ইবনে কাছীর এ কথাটি ইবনে আব্বাস (রাযি.) মুজাহিদ, আতা, ইকরামা, শাবী, কাতাদা, দাহহাক ও আবদুর রহমান বিন য়াসীদ বিন আসলাম থেকে বর্ণনা করেছেন। দেখুন তাকসিরে ইবনে কাছীর ২/৪৯৪; তাবারী ১৬/২৮৮]

সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা ও মালিক হিসেবে যে মুশরিকরা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখত, বিষয়টি আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এসেছে। ইরশাদ হয়েছে ,

لَلَّهِ نَلْيَقُولُ خَلَقَهُمْ مَنْ سَأَلْتَهُمْ وَلَيْنَ

‘আর তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ’ - (সূরা যুখরুফ , ৮৭)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ,

مِنَ الْحَيِّ يُخْرِجُ وَمَنْ وَالْأَبْصَارَ السَّمْعَ بِمَلِكٍ أَمَّنْ وَالْأَرْضَ السَّمَاءِ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مَنْ قُلْ تَتَّقُونَ أَفَلَا فَكُلْ اللَّهُ فَسَيَقُولُونَ الْأَمْرُ يُدْبَرُ وَمَنْ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ

‘বল, ‘আসমান ও জমিন থেকে কে তোমাদের রিযিক দেন? অথবা কে (তোমাদের) শ্রবণ ও দৃষ্টিসমূহের মালিক? আর কে মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন আর জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন? কে সব বিষয় পরিচালনা করেন? তখন তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ’। সুতরাং, তুমি বল, ‘তারপরও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না’? - (ইউনুস , ৩১)।

অতএব বুঝাই যাচ্ছে যে -আল্লাহ তাআলা সকল জিনিসের স্রষ্টা- শুধু এ কথা বললেই উলুহিয়াত এবং নাম ও গুণের ক্ষেত্রে আল্লাহকে অদ্বিতীয় বলে স্বীকার করা হয়ে যায় না। [ফাতহুল মাজীদ পৃ. ১৭; শারহুল মুল্লা আলী কারী আলফিকহিল আকবার পৃ. ৯]

বরং অধিকাংশ মানুষ সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহকে অস্বীকার করে না, সৃষ্টিজগতের ওপর আল্লাহর রুবুবিয়াতকে অস্বীকার করে না। তবে তাদের অধিকাংশের কুফর নিহিত থাকে ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করার মধ্যে। [এহয়ায়ে উলুমুদ্দীন ১/১৮২; শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ পৃ. ৭৮]

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৪ : দ্বিতীয় প্রকার : তাওহিদে উলুহিয়াত

দ্বিতীয় প্রকার : তাওহিদে উলুহিয়াত

সংক্ষেপে তাওহিদে উলুহিয়াত হলো, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সত্য ইলাহ এবং তিনি ছাড়া অন্যকোনো ইলাহ নেই, এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা এবং সকল ইবাদত তাঁর জন্যেই নির্দিষ্ট করা।

বিশ্লেষণ : ইলাহ শব্দটি مَالُوه এর অর্থ। [ব্যাকরণগতভাবে إله শব্দটি فعَال এর ওয়ানে, যার অর্থ مفعول (কৃত) যেমন كتاب অর্থ مكتوب (লিখিত)। দেখুন: মিসবাহুল মুনীর; তারীকুল উসুল ইলা সুলামিল মামুল. পৃ.১২।] অর্থাৎ মা'বুদ-যার ইবাদত করা হয়। আর ইবাদতের আভিধানিক অর্থ আনুগত্য, হীনতা ও অধীনস্থতা প্রকাশ। [আমরা বলি যে, مذل أي معبد طريق অর্থাৎ সুগম পথ, যা মানুষের পদপতনে হীন হয়েছে। দেখুন যামাখশারী আসাসুল বালাগাহ; মিসবাহুল মুনীর; তাতহীরু ইতিকাদ পৃ. ৬] আলেমদের কেউ-কেউ ইবাদতের অর্থ করেছেন الخضوع الكم مع المحبة كمال 'পরিপূর্ণ মহব্বতের সঙ্গে পরিপূর্ণ অধীনস্থতা।' [ইগাছাতুল লুহফান, ১/১২৮-১২৯]

অতএব তাওহিদে উলুহিয়াত (উলুহিয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে অদ্বিতীয় মানা) -বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ- সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করার ভিত্তির ওপর স্থাপিত। আর তা এভাবে যে, ইবাদতের কোনো অংশই গায়রুল্লাহর জন্য নিবেদিত হবে না। সে হিসেবে, একজন মুমিন একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না। একমাত্র আল্লাহর জন্যই মহব্বত, ভয়, আশা, দোয়া, তাওয়াক্কুল, আনুগত্য, হীনতা-দীনতার অনুভূতি, অধীনস্থতা এবং সকল ধরনের ইবাদত একনিষ্ঠতার সঙ্গে সুনির্দিষ্ট করবে। এ প্রকার তাওহিদ, বস্তুত, অন্যান্য সকল প্রকার তাওহিদকে শামিল করে- যেমন রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে তাওহিদ, নাম ও গুণের ক্ষেত্রে তাওহিদ। তবে এর উল্টোটা নয়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহকে একমাত্র রব হিসেবে মানে তবে এর অর্থ এটা হবে না যে, সে তাঁকে অদ্বিতীয় ইলাহ হিসেবেও মানছে; কেননা হতে পারে সে আল্লাহকে রব হিসেবে মানে, কিন্তু তাঁর ইবাদত করে না। অনুরূপভাবে নাম ও গুণের ক্ষেত্রে তাওহিদও অন্যান্য তাওহিদকে শামিল করে না। এর বিপরীতে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে অদ্বিতীয় ইলাহ হিসেবে সাব্যস্ত করে এবং স্বীকার করে যে একমাত্র তিনিই ইবাদত পাবার হকদার, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের হকদার নয়, অন্য কেউ ইবাদতের সামান্যত অংশও পাবার অধিকার রাখে না, তাহলে এ ব্যক্তি- একমাত্র আল্লাহ তাআলাই যে রব, তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলি- এ বিষয়টিও মূলত স্বীকার করে নিচ্ছে; কেননা যে রব নয় অথবা যার মধ্যে অপূর্ণতা রয়েছে, তাঁর জন্য ইবাদত নির্দিষ্ট হতে পারে না। [শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ: ৭৯ ও তৎপরবর্তী।] কারণ যে সৃষ্টি করেনি এবং যে সৃষ্টির বিষয়-আশয়ের ব্যবস্থাপক নয় অথবা যে অপূর্ণ তাকে কীভাবে ইবাদত করা যেতে পারে? এ কারণেই لا إله إلا الله (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই) এ সাক্ষ্যটি সকল প্রকার তাওহিদকেই শামিল করে। এ সাক্ষ্যের সরাসরি অর্থ হলো উলুহিয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে অদ্বিতীয় হিসেবে সাব্যস্ত করা, যা রুবুবিয়াত ও নাম ও গুণের ক্ষেত্রে আল্লাহকে অদ্বিতীয় সাব্যস্ত করাকেও শামিল করে। এ কারণেই, এ তাওহিদ হলো দ্বীনের শুরু এবং শেষ, দ্বীনের যাহের ও বাতেন। এ তাওহিদকে উদ্দেশ্য করেই সৃষ্টি করা হয়েছে জিন ও মানব জাতিকে। ইরশাদ হয়েছে ,

لِيَعْبُدُونِ إِلَّا وَالْإِنْسَ الْجِنَّ خَلَقْتُ وَمَا

‘আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদত করবে’ - (সূরা আয-যারিয়াত , ৫৬)।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. বলেন, ‘একত্ববাদী ও মুশরিকের মধ্যে এ তাওহিদই হলো মূল পার্থক্য। এ তাওহিদের নিরিখেই দুনিয়া ও আখেরাতে ছাওয়াব ও প্রতিদান সুনির্দিষ্ট হবে। অতএব যে ব্যক্তি এ তাওহিদকে ধারণ করবে না, সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’ [মজমুয়াতু রাসাইল, পৃ: ২৬১]

এ তাওহিদের জন্যই রাসূলগণের (আ.) প্রেরণ ঘটেছে। কিতাব নাযিল করা হয়েছে। আর তাই আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি যখনই কোনো রাসূল প্রেরণ করতেন, এ তাওহিদই হত তাঁর দাওয়াতের মূল ভিত্তি ও সারকথা। আল্লাহ তাআলা বলেন ,

الطَّاعُونَ وَاجْتَنِبُوا اللَّهَ اُغْبِذُوا اَنْ رَّسُولًا اُمَّةٍ كُلِّ فِي بَعَثْنَا وَلَقَدْ

‘আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং পরিহার কর তাগূতকে’ - (সূরা আন-নাহল , ৩৬)।

فَاُغْبِذُونَ اَنَا اِلَهَ لَا اُتُّهُ اِلَيْهِ تُوحِي اِلَّا رَّسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ نُمِ اَرْسَلْنَا وَمَا

‘আর তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, ‘আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর’ - (সূরা আল আশ্বিয়া , ২৫)।

আল কোরান থেকে আমরা জানতে পাই- নূহ, হুদ, সালেহ, শূয়াইব (আলাইহিমুস সালাম) তাঁদের কাওমকে অভিন্নভাবে যে কথার প্রতি আহ্বান করেছেন, তা হলো , اُغْبِذُوا ‘তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই’ - (সূরা আল মুমিনুন , ২৩; সূরা হুদ , ৬১; সূরা আল আরাফ , ৬৫)।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এ সংবাদ দিয়েছেন যে, ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর কাওমকে খেতাব করে বলেছেন ,

الْمُشْرِكِينَ مِنْ اَنَا وَمَا حَنِيفًا وَالْاَرْضَ السَّمَاوَاتِ فَطَرَ لِلَّذِي وَجْهِي وَجْهْتُ اِنِّي

‘নিশ্চয় আমি নিবিষ্ট করেছি আমার চেহারা একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্য, যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই’ - (সূরা আল আনআম , ৭৯)।

যেহেতু এ তাওহিদ দ্বীন ইসলামের হাকীকত, তাই দু-বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান হলো ইসলামের রোকনসমূহের মধ্যে প্রথম রোকন বা স্তম্ভ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ,

وإقام الله ، رسول محمدا وأن الله لا إله إلا لا شهادت ، خمس على الإسلام بني البيت وحج رمضان، وصوم الزكات، وإيتاء الصلوات،

‘ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর নির্মিত হয়েছে , এ সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। নামাজ কয়েম করা, জাকাত দেওয়া, রমজানের রোজা রাখা ও বায়তুল্লাহর হজ করা।’
[বর্ণনায় বুখারি ও মুসলিম]

আল্লাহ তাআলাকে অদ্বিতীয় ইলাহ হিসেবে সাব্যস্ত করার অবশ্যম্ভাবী দাবি হলো- আমরা আমাদের সকল ইবাদত-বন্দেগি একমাত্র তাঁর জন্যই নিবেদন করব। আমাদের অন্তরাত্মকে এ ব্যাপারে একনিষ্ঠ-ঐকান্তিক করব। আর এ কথাটি অনেক বিষয়কেই শামিল করে, যার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি ,

১ . ঐকান্তিক মহববত একমাত্র আল্লাহর জন্যই সুনির্দিষ্ট করা। অতএব মহববত করার ক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে সমকক্ষ হিসেবে সাব্যস্ত করা যাবে না; যাকে এমনভাবে মহববত করা হবে যেমনভাবে আল্লাহকে করা হবে অথবা যার মহববতকে আল্লাহর মহববতের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যদি এর অন্যথা হয়, তবে তা শিরক হিসেবে গণ্য হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন ,

لِلَّهِ حُبًّا أَشَدُّ أَمَنُوا وَالَّذِينَ اللَّهُ كَحَبِّ يُجِبُّونَهُمْ أَنْدَادًا لِلَّهِ دُونَ مَنْ يَتَّخِذُ مِنَ النَّاسِ وَمِنْ الْعَذَابِ شَدِيدًا لِلَّهِ وَأَنْ جَمِيعًا لِلَّهِ الْقُوَّةُ أَنْ الْعَذَابَ يَرَوْنَ إِذْ ظَلَمُوا الَّذِينَ يَرَى وَلَوْ

‘আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহকে ভালবাসার মত ভালবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর জন্য ভালবাসায় দৃঢ়তর। আর যদি জালিমগণ দেখে- যখন তারা আজাব দেখবে- যে, নিশ্চয় সকল শক্তি আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আল্লাহ আজাব দানে কঠোর’ - (সূরা আল বাকারা , ১৬৫)।

অতএব যদি কেউ মহববতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক সাব্যস্ত করে, যার জন্য একই মাত্রার মহববত প্রকাশ করে যে মাত্রায় করে আল্লাহ জন্য, তবে তা শিরকে আকবর তথা বড় শিরক বলে বিবেচিত হবে, তাওবা ছাড়া যা আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন না। [শারহ কাসীদাতি ইবনিল কাইয়েম, ২/২৬৮]

প্রশ্ন হতে পারে- মানুষ তো তার সহজাত প্রকৃতি হিসেবে নিজেকে, নিজের মাতা-পিতাকে, নিজ দেশ ও অর্থসম্পদকে ভালোবাসে। অতএব যদি আল্লাহকে মহববতের অর্থ এটা হয় যে, অন্যসব মহববত অন্তর থেকে মুছে ফেলতে হবে, তবে শিরক থেকে মুক্ত হওয়া সাধ্যাতীত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এর উত্তর হলো, না, সকল মহববত অন্তর থেকে মুছে ফেলা শর্ত নয়, তবে মুমিনের কাছে কাম্য হলো- আল্লাহর মহববতকে সে সকল বিষয়-আশয়ের মহববতের ঊর্ধ্বে রাখবে। অর্থাৎ আল্লাহর মহববত প্রথম স্তরে রাখবে এবং দুনিয়ার অন্যান্য বিষয়ের মহববত রাখবে দ্বিতীয় স্তরে। আল্লাহর মহববত সকল বিষয়ের মহববতের ঊর্ধ্বে রাখার অর্থ হলো, আল্লাহর জন্য দুনিয়ার সকল মহববত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকা। বিশেষ করে যখন আল্লাহর মহববত ও অন্যান্য মহববতের মধ্যে সাংঘর্ষিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তখন সকল মহববত বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর মহববতকে প্রাধান্য দেওয়া। আর যারা দুনিয়ার বিষয়-আশয়ের মহববতকে আল্লাহর মহববতের ওপর প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ তাদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন ,

اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَأَمْوَالٌ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ أَبَاؤُكُمْ كَانَ إِنَّ قُلَّ سَبِيلِهِ فِي وَجْهِهِ وَرَسُولِهِ اللَّهُ مِنْ إِلَيْكُمْ أَحَبُّ تَرْضَوْنَهَا وَمَسَاكِينُ كَسَادَهَا تَخْشَوْنَ تَجَارَةً وَ
الْفَاسِقِينَ الْقَوْمَ يَهْدِي اللَّهُ إِلَى مَسْجِدِهِ اللَّهُ يَأْتِي حَتَّى تَقْرَبُوا

‘বল, ‘তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে-ব্যবসা, যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে-বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত’। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন না’ - (সূরা আত-তাওবা , ১৪)।

২ - দোয়া-প্রার্থনা, তাওয়াক্কুল, প্রত্যাশা - যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ পূরণ করতে পারে না- ইত্যাদি বিষয়ও একমাত্র আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট রাখা ওয়াজিব। দোয়া প্রার্থনার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন ,

الطَّالِبِينَ مِنْ إِذَا فَإِنَّكَ فَعَلْتَ فَإِنْ يَضُرُّكَ وَلَا يَنْفَعُكَ لَا مَالُ اللَّهِ دُونَ مِنْ تَدْعُ وَلَا

‘আর আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে ডেকো না, যা তোমার উপকার করতে পারে না এবং তোমার ক্ষতিও করতে পারে না। অতএব তুমি যদি কর, তাহলে নিশ্চয় তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ - (সূরা ইউনুস , ১০৬)।

‘তাওয়াক্কুলে’র ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন ,

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ فَتَوَكَّلُوا اللَّهَ وَعَلَى

‘আর আল্লাহর ওপর তোমরা তাওয়াক্কুল কর, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক’ - (সূরা আল মায়েদা , ২৩)।

‘আশা’র ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন ,

اللَّهُ رَحْمَةً يَرْجُونَ أُولَئِكَ اللَّهُ سَبِيلٌ فِي وَجَاهَهُدُوا هَاجِرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ إِنَّ

‘নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের আশা করে’ - (সূরা আল বাকারা , ২১৮)।

৩ . একমাত্র ভয়ের পাত্র হিসেবেও আল্লাহ তাআলাকে নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব। অতএব যদি কেউ কোনো সৃষ্টিজীবের ব্যাপারে এ বিশ্বাস রাখে যে, তা তার নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতা বলে ['ইচ্ছায় ও ক্ষমতা বলে' কথাটি দুধরনের ভয়ের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার জন্য বললাম। অর্থাৎ ইবাদতকেন্দ্রিক ভয় ও সহজাত প্রকৃতিগত ভয়। ইবাদতকেন্দ্রিক ভয় কেবল আল্লাহ তাআলার জন্যই সুনির্দিষ্ট থাকবে। অর্থাৎ যিনি তার ইচ্ছাবলে ও ক্ষমতাবলে মানুষের ক্ষতিসাধন করতে পারেন তিনি হলেন একমাত্র আল্লাহ। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ কোনো উপকার বা ক্ষতিসাধন করতে পারে না, তবে যদি আল্লাহ তাকে ক্ষতিসাধনের কারণ বানিয়ে দেন, তবে ভিন্ন কথা। ইবাদতকেন্দ্রিক ভয়ের আলামত হলো- যিনি ভয়ের পাত্র তার কথা স্মরণ হলেই অন্তরে ভয় চলে আসা। এর বিপরীতে প্রকৃতিগত ভয় হলো- কোনো হিংস্রপ্রাণী এবং এ জাতীয় ভয়ের বিষয় দেখলে অন্তরে যে ভয় আসে তা। এ ধরনের ভয় কেবল তখনই অন্তরে আসে যখন মানুষ কোনো আতঙ্কের বিষয়ের মুখোমুখি হয়। এ ধরনের ভয় তাওহীদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়; কেননা তা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিকৃত মানুষের ফিতরত।] তার কোনো ক্ষতি করতে পারে, অতঃপর সে তাকে ভয় করতে শুরু করে, তবে সে আল্লাহর সঙ্গে শিরককারী বলে গণ্য হবে। ইরশাদ হয়েছে ,

فَارْهَبُونِ فَإِيَّايَ

‘সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর’ - (সূরা আন নাহল , ৫১)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ,

مَنْ بِهِ يُصِيبُ لِفَضْلِهِ رَآدٌ فَلَا يُرِيخُ يُرْدُّكَ وَإِنْ هُوَ إِلَّا لَهُ كَاشِفٌ فَلَا يَضُرُّ اللَّهَ يَمْسَسُكَ وَإِنْ
الرَّحِيمُ الْعَفُورُ وَهُوَ عِبَادِهِ مِنْ يَشَاءُ

‘আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো ক্ষতি পৌঁছান, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনুগ্রহের কোন প্রতিরোধকারী নেই। তিনি তার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা তাকে তা দেন। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু’ - (সূরা ইউনুস , ১০৭)।

৪ . সকল শারীরিক ইবাদত-অর্থাৎ যেসব ইবাদতে শরীর ব্যবহৃত হয়- যেমন নামাজ, রুকু, সিজদা, রোজা, যবেহ, তাওয়াফ এবং সকল কাওলী ইবাদত - অর্থাৎ যেসব ইবাদত মৌখিকভাবে আদায় করা হয়- যেমন মানত, ইস্তিগফার ইত্যাদি- একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব।

এ সব ইবাদতসহ অন্যান্য সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট থাকতে হবে। অতএব যে ব্যক্তি ইবাদতের কোনো একটি অথবা কোনো অংশ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য নিবেদন করবে, সে মুশরিক বলে গণ্য হবে। আর শিরকের ওনাহ তাওবা ছাড়া আল্লাহ তাআলা কখনো ক্ষমা করেন না। ইরশাদ হয়েছে ,

افْتَرَى فَقَدْ يَأْثُرُ بِاللهِ يُشْرِكُ وَمَنْ يَشَاءُ لِمَنْ ذَلِكَ دُونَ مَا وَيَغْفِرُ بِهِ يُشْرِكُ أَنْ يَغْفِرَ لَا اللهُ إِنَّ
عَظِيمًا إِنَّمَا

‘নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি ক্ষমা করেন এ ছাড়া অন্যান্য পাপ, যার জন্য তিনি চান। আর যে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে সে অবশ্যই মহাপাপ রচনা করে’ - (সূরা আন-নিসা , ৪৮)।

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৫ : তৃতীয় প্রকার : তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত

তৃতীয় প্রকার : আল্লাহর নাম ও গুণাবলিকেন্দ্রিক তাওহিদ

সংক্ষেপে তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত হলো- এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তাআলা সকল সিফাতে কামাল তথা পূর্ণাঙ্গ গুণাবলিতে গুণান্বিত এবং সকল অপূর্ণাঙ্গ গুণাবলি থেকে পবিত্র। তিনি এ ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়। এ প্রকার তাওহিদে বিশ্বাস পোষণের পদ্ধতি হলো- আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের জন্য যেসব নাম ও গুণাবলি তালিকাভুক্ত করেছেন অথবা যেসব নাম ও গুণের কথা উল্লেখ করেছেন- যা কোরান-সুন্নাহয় উল্লিখিত হয়েছে- শব্দে অথবা অর্থে- সে-সবে কোনোরূপ বিকৃতিসাধন, অস্বীকৃতি ও বাতিলকরণ, তার হাকীকত কী তা নির্ণয়করণ ও তার ধরন-ধারণ নির্দিষ্টকরণ, এবং সৃষ্টিজীবের কোনো গুণের সঙ্গে সাদৃশ্যকরণ ব্যতীত তা মেনে নেয়া ও বিশ্বাস করা।

উল্লিখিত সংজ্ঞা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নাম ও গুণের ক্ষেত্রে তাওহিদ, তিনটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা থেকে বিচ্যুত হলে আল্লাহর নাম ও গুণের ক্ষেত্রে একত্ববাদী হওয়া যাবে না।

ভিত্তি তিনটি হলো :

প্রথমত : আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুলের সাদৃশ্য এবং সকল অপূর্ণতা থেকে পবিত্র বলে বিশ্বাস করা।

দ্বিতীয়ত : আল্লাহ তাআলার যেসব নাম ও গুণাবলি কোরান-সুন্নাহয় এসেছে, তাতে কোনো কমবেশ না করে, কোনো বিকৃতি অথবা বাতিলকরণ প্রক্রিয়ার আশ্রয়ে না গিয়ে, যেভাবে আছে সেভাবেই মেনে নেওয়া।

তৃতীয়ত : আল্লাহর তাআলার এ সব গুণাবলির কাইফিয়ত তথা ধরন-ধারণ কী, তা জানা সম্ভব নয় বলে বিশ্বাস করা।

অতএব প্রথম ভিত্তিটি হলো- আল্লাহ তাআলার কোনো গুণ সৃষ্টিকুলের কোনো গুণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। এর প্রমাণ আল্লাহ তাআলার বাণী ,

شَيْءٌ كَمِثْلِهِ لَيْسَ

‘তার মতো কিছু নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা’ - (সূরা আন-নাহল, ৭৪)।

ইমাম কুরতুবী র. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- এ ক্ষেত্রে যা বিশ্বাস করতে হবে তা হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর বড়ত্ব ও মহিমায়, তাঁর রাজত্বে, তাঁর সর্বসুন্দর নাম ও গুণাবলিতে সৃষ্টিকুলের কোনো কিছুর সঙ্গেই সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। আর যেসব গুণ স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, তা প্রকৃত অর্থের দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। কেননা অনাদি আল্লাহ তাআলার গুণসমূহ মাখলুকের গুণসমূহ থেকে ভিন্ন। [তাকসিরে কুরতুবী ১৬/পৃ ৮] ওয়াসেতী র. বলেন, ‘আল্লাহর সত্তার মতো কোনো সত্তা নেই, আল্লাহর নামের মতো কোনো নাম নেই, আল্লাহর কর্মের মতো কোনো কর্ম নেই, আল্লাহর গুণের মতো কোনো গুণ নেই- হ্যাঁ, তবে এ ক্ষেত্রে শাব্দিক সাদৃশ্য থাকতে পারে। আর এটাই স্বাভাবিক যে অনাদি আল্লাহর তাআলার এমন কোনো গুণ থাকবে না যা সৃষ্টিকুলের কোনো গুণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। অনুরূপভাবে সৃষ্টিকুলের এমন কোনো গুণ থাকা অসম্ভব, যা অনাদি আল্লাহ তাআলার গুণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। আর এ সবই হলো আহলে হক তথা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মামহাব। [সাইয়েদ কুতুব, ফী মিলালিল কুরান ৭/২৭২] উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় সাইয়েদ কুতুব র. বলেন, ‘মানবপ্রকৃতি এ বিষয়টি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিশ্বাস করে। অতএব, যিনি সকল বিষয়ের স্রষ্টা তিনি ওইসব বিষয়ের সমান হবেন না, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। [প্রাগুক্ত ৭/৩৭২]

উল্লিখিত ভিত্তির আরেকটি প্রসঙ্গ হলো- আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের জন্য যেসব গুণাবলি প্রমাণ করেছেন অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর জন্য যেসব গুণাবলি প্রমাণ করেছেন, সে সবার বিপরীত বিষয়গুলো থেকে আল্লাহ তাআলাকে পবিত্র বলে বিশ্বাস করা। অতএব গুণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাকে অদ্বিতীয় হিসেবে বিশ্বাস করার দাবি হলো, একজন মুসলিম তাঁর রবকে- স্ত্রী, অংশীদার, সমকক্ষ, সাহায্যকারী,

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশকারী ও অভিভাবক থেকে পবিত্র বলে বিশ্বাস করবে। আরও দাবি হলো, সে তাঁকে নিদ্রা, ক্লান্তি-অবসাদ, মৃত্যু, অঙ্গুতা, জুলুম, উদাসীনতা, ভুলে-যাওয়া, তন্দ্রা, স্থানবদ্ধ হওয়া ও অন্যান্য দুর্বলতা থেকে পবিত্র বলে বিশ্বাস করবে।

আর দ্বিতীয় ভিত্তির দাবি হলো, আল্লাহর তাআলার নাম ও গুণের ব্যাপারে আল কোরান এবং সহীহ হাদীস দ্বারা যা প্রমাণিত, তাতেই ক্ষান্ত থাকা; কেননা বিষয়টি শ্রবণনির্ভর; বুদ্ধি-বিবেচনানির্ভর নয়। অতএব আল্লাহ তাআলা নিজেকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন অথবা তাঁর রাসূল তাঁকে যেসব গুণে গুণান্বিত থাকার সংবাদ দিয়েছেন কেবল সে সব গুণেই তাঁকে গুণান্বিত করতে হবে। এর বাইরে অন্যকোনো গুণ আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না।

নামের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তাআলা নিজেকে যেসব নাম দিয়েছেন অথবা তাঁর রাসূল তাঁকে যেসব নাম দিয়েছেন, তার বাইরে অন্যকোনো নামে আল্লাহকে ডাকা যাবে না; কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজ সত্তা, গুণাবলি ও নাম সম্পর্কে সমধিক অবহিত। আল্লাহ তাআলা বলেন , أَعْلَمُ أَنْتُمْ , 'তোমরা কি অধিক জান, না আল্লাহ?' - (সূরা আল বাকারা , ১৪০)। আর আল্লাহ তাআলা যেহেতু নিজ সম্পর্কে অধিক জানেন এবং তাঁর রাসূলগণ যেসব সংবাদ দিয়েছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীপ্রাপ্ত হয়ে দিয়েছেন, তাই আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণের ক্ষেত্রে কোনটা বলা হবে কোনটা বলা হবে না, তার একমাত্র উৎস হবে আল্লাহ তাআলা-প্রদত্ত এবং তাঁর রাসূল-প্রদত্ত সংবাদ। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. বলেন, 'এমন কোনো বিশেষণে আল্লাহকে বিশেষিত করা যাবে না, যা দ্বারা আল্লাহ তাআলা নিজেকে বিশেষিত করেননি, বা রাসূল তাকে বিশেষিত করেননি, অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে কোরান-সুন্নাহর সীমানা অতিক্রম করা যাবে না। [আর রাওয়া আন-নাদিইয়া পৃ. ২৩; শারহুল আকীদা আত তাহাবিয়াহ পৃ. ২১]

ইমাম বুখারি র. এর উস্তাদ নাসিম ইবনে হাম্মাদ র. বলেন ,

كفر، رسوله به وصف أو نفسه به الله وصف ما حجد ومن كفر، بخلقه الله شبه من تمثيل و لا تشبيه رسوله به وصف أو نفسه به الله وصف فيما وليس .

'যে ব্যক্তি আল্লাহকে মাখলুকের সঙ্গে তুলনা করল, সে কাকের হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি এমন কোনো বিশেষণ অস্বীকার করল, যা আল্লাহ তাআলা নিজের ওপর প্রয়োগ করেছেন, অথবা তাঁর রাসূল তাঁর ওপর প্রয়োগ করেছেন, সেও কাকের হয়ে গেল। আর আল্লাহ তাঁর নিজের ওপর যে বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন অথবা তাঁর রাসূল তাঁর ওপর যে বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন, তাতে কোনো তাশবিহ তথা সাদৃশ্যকরণ, তামছীল তথা উপমানির্ধারণ নেই। [দেখুন ইতহাফুল কায়েনাত পৃ. ৬; শারহে মুল্লা আলী কারী পৃ ১৫]

প্রতিটি মুসলমানের কাছে এ ভিত্তিটির দাবি হলো যে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে, আল্লাহর যেসব নাম ও গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং আরবী ভাষায় এ সব নাম ও গুণের যে বাহ্যিক অর্থ রয়েছে, সে অর্থ অনুযায়ী তা মেনে নিতে হবে, এগুলোকে অস্বীকার করা অথবা এর কোনোটিকে আল্লাহর জন্য অনুপযোগী মনে করে প্রত্যাখ্যান করা কখনো উচিত হবে না। সঙ্গে-সঙ্গে এ সবার যে বাহ্যিক অর্থ রয়েছে, তা থেকে এগুলোকে বিচ্যুতও করা যাবে না।

তৃতীয় ভিত্তিটির দাবি হলো- কোরান-সুন্নাহয় আল্লাহর যেসব নাম ও গুণের উল্লেখ রয়েছে, তা যেভাবে আছে সেভাবেই বিশ্বাস করা, এ সবার ধরন-ধারণ কি সে ব্যাপারে আদৌ কোনো প্রশ্ন না করা, এ সবার প্রকৃতি ও হাকীকত কি, সে ব্যাপারে কোনো গবেষণায় না যাওয়া; কেননা 'সিফাত' তথা গুণের ধরন-ধারণ জানা, 'যাত' তথা আল্লাহর সত্তার ধরন-ধারণ জানার ওপর নির্ভরশীল; কেননা বিশেষণ বিশেষ্য অনুযায়ী পার্থক্য হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তাআলার সত্তার হাকীকত-প্রকৃতি, ধরন-ধারণ কি, সে ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করা অনুমোদিত নয়। অনুরূপভাবে আল্লাহর সিফাত সম্পর্কিত ধরন-ধারণের ব্যাপারে প্রশ্ন করারও কোনো অনুমতি নেই। এ কারণেই সালাফদের অনেককেই যখন ইস্তিওয়া (استواء) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তারা বলেছেন ,

بدعة عنه والسؤال واجب، به والإي مان مجهول، والكيف معلوم، الاستواء

অর্থাৎ 'ইস্তিওয়ার অর্থ জ্ঞাত। এর ধরন অজ্ঞাত। এর প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদআত। [আর রাওয়া আন-নাদিইয়া পৃ. ২৯]

অতঃপর সালাফগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ধরন-ধারণ আমাদের অজ্ঞাত এবং এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা বিদআত।

অতএব, যদি কোনো প্রশ্নকারী বলে যে- আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আকাশে কীভাবে নেমে আসেন? অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নেমে আসার ধরন-ধারণ কী? তবে তাকে পাল্টা প্রশ্ন করে বলা হবে, প্রথমে বলুন, আল্লাহর তাআলার ধরন-ধারণ কী? সে যদি বলে, আল্লাহর তাআলার ধরন-ধারণ কী, তা আমার জানা নেই। তাহলে এবার তাকে বলা হবে, একইরূপে আল্লাহর তাআলার নেমে আসার ধরন-ধারণ কী, তা আমাদের জানা নেই; কারণ কোনো সিফাত তথা বিশেষণের ধরন-ধারণ জানা মাওসুফ তথা বিশেষ্যের ধরন-ধারণ জানার ওপর নির্ভরশীল। বিশেষণ হলো বিশেষ্যের অধীন। অতএব, কীভাবে আমাদের ব্যাখ্যা করতে বলেন- আল্লাহর শ্রবণ, দর্শন, কথা, ইস্তিওয়া ও নেমে আসা ইত্যাদির ধরন-ধারণ কী? অথচ আপনি জানেন না আল্লাহর তাআলার সত্তার ধরন-ধারণ কী। আর যদি স্বীকার করে নেন, যে আল্লাহ তাআলা সকল বিবেচনার বাইরে এমন এক প্রতিষ্ঠিত সত্য, যার রয়েছে সকল পূর্ণ গুণাবলি এবং যার তুল্য অন্য কেউ নেই, তাহলে শ্রবণ, দর্শন, কথা, অবতরণ, ও ইস্তিওয়াও সকল বিবেচনার বাইরে প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতা। আর তাঁর ওই সকল পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মাখলুকের শ্রবণ, দর্শন, কথা, নেমে আসা ও ইস্তিওয়ার কোনো তুলনা হয় না। [আর রাওয়া আন-নাদিইয়া, পৃ. ৩৪]

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এমন কিছু বিষয় আছে, যা তাওহিদকে কলুষিত করে এবং যা থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। আর তা হলো নিম্নরূপ ,

১ . তাশবিহ : আর তা হলো সৃষ্টিকর্তার গুণাবলিকে মাখলুকের গুণাবলির সাদৃশ্য বা তুল্য বলে ধারণা করা। যেমন নাসারা সম্প্রদায় ঈসা ইবনে মারযাম আলাইহিস সালামকে আল্লাহর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে ভেবেছে। ইহুদি সম্প্রদায় উযাইর আলাইহিস সালামকে আল্লাহর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ভেবেছে। এমনকি মুসলিম সম্প্রদায়ের কোনো-কোনো দল আল্লাহর চেহারা ও হাতকে মাখলুকের চেহারা ও হাতের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে ভেবেছে। আল্লাহর শ্রবণকে মাখলুকের শ্রবণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে করেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। [আল আসইলা ওয়াল আজায়েবা আল উসুলিয়া পৃ. ৩৫, আর রাওয়া আন-নাদিইয়া পৃ. ৩৫]

২ . তাহরিফ : অর্থাৎ পরিবর্তন ও বিকৃতিসাধন। যেমন আল্লাহ তাআলার নাম ও বিশেষণ বর্ণনায় যেসব শব্দ উল্লিখিত হয়েছে তাতে কোনো কমবেশ করা, ব্যাকরণের দৃষ্টিতে তাতে যে হরকত (যের-যবর-পেশ ইত্যাদি) রয়েছে, তা পরিবর্তন করা, অথবা তার অর্থ বিকৃত করে ফেলা, যেটাকে মুসলিম সম্প্রদায়ের কোনো কোনো দল তাবীল বলে থাকে। অর্থ বিকৃত করার মানে- শব্দকে এমন অযাচিত অর্থে ব্যবহার করা, আরবী ভাষায় যার ব্যবহার আদৌ প্রচলিত নয়। যেমন وجه (চেহারা) এর অর্থ করা الذات (সত্তা), استواء (উপরে ওঠা) এর অর্থ করা استيلاء (নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা)। [আর রাওয়া আন-নাদিইয়া পৃ. ২৫]

৩ . তাতিল (التعطيل) : আর হলো আল্লাহ তাআলার কোনো সিফাত-বিশেষণ প্রত্যাখ্যান করা এবং তা যে আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, তা অস্বীকার করা। যেমন আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলি প্রত্যাখ্যান করে তাঁর পূর্ণতায় অস্বীকৃতিজ্ঞাপন। যেমন আল্লাহর তাআলার সৃষ্টির গুণকে প্রত্যাখ্যান করা- বলা, যে সৃষ্টিজগৎ অনাদিকাল থেকেই বিরাজমান। [প্রাগুক্ত]

৪ . তাকঈফ (التكليف) : আর তা হলো গুণের আকৃতি-প্রকৃতি নির্ধারণ এবং তার স্বরূপ স্থির করা। সালাফ তথা সাহাবায়ে কেলাম ((রাযি.)) তাবেঈন (র.), তাবে তাবেঈন (র.) এর পদ্ধতি ছিল, নাম ও গুণের ক্ষেত্রে তাহরিফ, তাতিল ও তাক-ঈফ এর আশ্রয়ে না যাওয়া। ইমাম শাওকানী র. বলেন, 'সালাফ তথা সাহাবায়ে কেলাম ((রাযি.)), তাবেঈন (র.), তাবে-তাবেঈন (র.) এর মাযহাব হলো, সিফাতকেন্দ্রিক

দলিলগুলো তার প্রকাশ্য অর্থেই রেখে দেয়া। এ ক্ষেত্রে কোনো বিকৃতিসাধন, কোনো একটিকে অযাচিতভাবে তাবীলকরণ, সাদৃশ্য-নির্ধারণ, এবং প্রত্যাখ্যানকরণ- যা তাবীলেরই ফলাফল- এ সব থেকে বিরত থাকা। অতএব কোনো প্রশ্নকারী যদি সিফাত সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করত, জবাবে তারা সরলভাবে কেবল এ বিষয়ক দলিলটি পাঠ করে শুনিye দিতেন, এর অতিরিক্ত কোনো কথা বলতেন না। তারা বলতেন, আল্লাহ তাআলা এরূপই বলেছেন, আর এর অতিরিক্ত কিছু জানি না। আমরা আড়ম্বরতার আশ্রয় নিই না এবং যা জানি না তা বলি না। আর আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে আমাদের সীমালঙ্ঘনের অনুমতি দেননি। যদি প্রশ্নকারী, প্রকাশ্য অর্থের বাইরে অতিরিক্ত কিছু জানার আগ্রহ ব্যক্ত করত, তারা তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিতেন এবং এমন বিষয় তলব করা থেকে বারণ করতেন যা হাসিল করা বিদআতে নিপতিত হওয়া ছাড়া সম্ভব নয়। আর বিদআতের পথ ছিল ওই পথ থেকে ভিন্ন যা সাহাবায়ে কেলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সংরক্ষণ করেছেন, এরপর তাবেঈগণ (র.) সাহাবায়ে কেলাম ((রাযি.)) থেকে এবং তাবে-তাবেঈগণ (র.) তাবেঈদের থেকে সংরক্ষণ করেছেন। অতএব, উত্তম শতাব্দিসমূহে আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর বাক্য ছিল এক ও অভিন্ন। তাদের সকলের পথ ছিল অভিন্ন। আল্লাহ তাদের যা করতে বলেছেন তা নিয়েই তারা ব্যস্ত ছিলেন। আল্লাহ তাদের যেসব দায়িত্ব দিয়েছেন, যেমন- ঈমান আনা, নামাজ কায়েম করা, জাকাত দেয়া, রোজা রাখা, হজ করা, কল্যাণমূলক কাজে সম্পদ ব্যয় করা, উপকারী ইলম তালাশ করা, মানুষকে সৎকাজের পথ দেখানো, জান্নাতমুখী আমল করা এবং জাহান্নামমুখী আমল থেকে বিরত থাকা, সৎকাজের আদেশ দেয়া ও অসৎকাজ থেকে বারণ করা, সাধ্যমত জালেমকে জুলুম থেকে নিবৃত্ত করা- ইত্যাদিতেই তারা নিজেদের ব্যস্ত রাখতেন। এর বিপরীতে, যে সর্বের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দেননি, যার হাকীকত-বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা ইবাদত হিসেবে সাব্যস্ত করেননি, তা নিয়ে তারা ব্যস্ত হতেন না। অতএব সে যুগে দ্বীন ছিল স্বচ্ছ ও সকল বিদাত থেকে মুক্ত। [শাওকানী, আত-তুহাফ ফী মাযাহিবিল সালাফ পৃ. ৭]

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৬ : আল্লাহর তাআলার সিফাতের (গুণ) প্রকার

আল্লাহর তাআলার সিফাতের (গুণ) প্রকার

কোরান সুন্নাহয় আল্লাহর তাআলার যেসব সিফাত উল্লিখিত হয়েছে, তা দু'প্রকার : এক. জাতি সিফাত তথা আল্লাহর সত্তাসংলগ্ন সিফাত । দুই. ফেলি সিফাত তথা আল্লাহর কর্মসংলগ্ন সিফাত।

জাতি সিফাত হলো, যা আল্লাহর সত্তা থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না, যেমন- নফস, ইলম, জীবন, ক্ষমতা, শ্রবণ, দৃষ্টি, চেহারা, কথা, পা, রাজস্ব, আজমত, মহিমা, সর্বশীর্ষতা, ধনাঢ্য, রহমত, প্রজ্ঞা। এ প্রকৃতি সিফাত বুঝার মূল উপায় হলো যে, তা আল্লাহর সত্তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত এবং কখনো তা বিচ্ছিন্ন হয় না।

ফেলি সিফাত হলো, যা আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন- ইস্তিওয়া, অবতরণ, আসা, গর্ব করা, হাসা, সন্তুষ্ট হওয়া, মহব্বত করা, ঘৃণা করা, বিরক্ত হওয়া, খুশি হওয়া, রাগ করা, কৌশল করা, বিদ্রোহ পোষণ করা।

উপরে বর্ণিত উভয় প্রকার সিফাতের ক্ষেত্রে আমাদের যা করণীয়, তা হলো- আল্লাহ তাআলার কামাল ও পূর্ণতার জন্য উপযোগী হয় এমন অর্থে এ সিফাতগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। অর্থাৎ এগুলোকে তার প্রকৃত অর্থেই ব্যবহার করা; যেহেতু তাতে কোনো তাশবিহ, তাতিল, তাহরিফ ও তাকদীফ নেই। যেমন ইমাম শাফেয়ি (র.) বলেছেন ,

عن جاء وبما الله ، برسول وآمنت الله ، مراد على الله عن جاء وبما با الله آمنت
وسلم عليه الله صلى الله رسول مراد على الله رسول

‘আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যা এসেছে তার প্রতি ঈমান এনেছি -আল্লাহর উদ্দেশ্য অনুযায়ী। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছি এবং যা তাঁর পক্ষ থেকে এসেছে, তার প্রতি ঈমান এনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য অনুযায়ী। [দেখুন, আল আস-ইলা ওয়াল আজওয়েবা আল উসুলিইয়াহ, পৃ. ৫০]

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৭ : আল্লাহ তাআলার নামসমূহ

আল্লাহ তাআলার নামসমূহ

কোরান-সুন্নাহ থেকে আমরা আল্লাহ তাআলার নামসমগ্র বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা নিতে পারি। কোরান-সুন্নাহয় আল্লাহ তাআলার যেসব নামের কথা এসেছে, তার প্রত্যেকটি কোনো গুণকে নির্দেশ করে এবং এ নামসমূহের প্রতিটি তার ক্রিয়াবিশেষ্য (মাসদার) থেকে উৎকলিত। যেমন :- العليم (সর্বজ্ঞানী), القدير (অতি ক্ষমতাধর), السميع (সর্বশ্রোতা), البصير (সর্বদ্রষ্টা)। العليم নামটি العلم ক্রিয়াবিশেষ্য থেকে উৎকলিত- অর্থ, জ্ঞান। অতএব 'আল-আলিম' নামটি আল্লাহর তাআলার 'ইলম-জ্ঞানী' গুণকে বুঝায়। তদ্রূপভাবে অন্যান্য নামগুলোও। আর আল্লাহ তাআলার যে নামটি সকল নামের অর্থকে একত্র করে, সকল সীফাত-বিশেষণকে যে-নামটি একীভূত করে তা হলো- الله । 'আল্লাহ' শব্দটি অন্য-কোনো উৎসশব্দ থেকে রূপান্তরিত হয়ে এসেছে কি-না, সে ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

কেউ বলেছেন, তা রূপান্তরিত হয়ে এসেছে। এর উৎসশব্দটি হলো اءل , শব্দটির মাঝখানে যে হামযা () রয়েছে, তা ফেলে দেয়া হয়েছে। এরপর প্রথম লামকে দ্বিতীয় লামে ইদগাম তথা ঢুকিয়ে দিয়ে তাশদীদ-বিশিষ্ট করা হয়েছে, যা পুড় বা মোটা আওয়াজে পড়া হয়। ইবনুল কাইয়েম, সিবওয়াইহ ও তাবারি এ মতটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আবার কেউ-কেউ বলেছেন, না, শব্দটি অন্যকোনো শব্দ থেকে রূপান্তরিত হয়ে আসেনি। বরং তা মৌলিক শব্দ যা এভাবেই ছিল। [দেখুন ফাতহুল মাজীদ পৃ.১১- ইমাম তাবারী মহিমাম্বিত 'আল্লাহ' শব্দের অর্থ করেছেন: যিনি সৃষ্টিকুলের ওপর উলুহিয়াত ও মা'বুদিয়াতের অধিকারী' - তাবারী ২০/১২৩]

আল্লাহ তাআলার এ নামগুলো এক দিকে আল্লাহর বিশেষণ ও নাম উভয়ভাবে ব্যবহৃত হওয়ার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। যেমন 'আর-রাহমান' এক দিকে আল্লাহর নাম, অন্যদিকে আল্লাহর বিশেষণ। অতএব আল্লাহর সকল নাম এক দিকে তার অর্থ তথা আল্লাহর সত্তাকে নির্দেশ করে, অন্য দিকে আল্লাহ তাআলার গুণ-বিশেষণকেও বুঝায়। [ফাতহুল মাজীদ পৃ.১৪]

আল্লাহর নামগুলোকে 'আল-হসনা' বিশেষণযুক্ত করে উল্লেখ করা হয়। বলা হয় 'আসমাউল্লাহ হিল হসনা'। হসনা শব্দের অর্থ সুন্দরতম। সুন্দরতম বলার কারণ, তা সুন্দরতম শীর্ষতম বিশেষ্যকে নির্দেশ করে। নামের ক্ষেত্রে আল্লাহকে অদ্বিতীয় মানার দাবি হলো, আল্লাহ তাআলা নিজেকে যে সব নাম দিয়েছেন, তার প্রতি ঈমান আনা। এ নামগুলোর যে অর্থ রয়েছে, তার প্রতি ঈমান আনা এবং এ নামগুলোর যে প্রভাব রয়েছে, তার প্রতিও ঈমান আনা। যেমন- আল-কোরানে আল্লাহ তাআলার যে সব নাম এসেছে, তন্মধ্যে একটি হলো 'আর-রাহিম'। অতএব আমরা ঈমান আনব যে এটি আল্লাহর সত্তা-নির্দেশক তথা নামবাচক একটি শব্দ-নাম। সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারেও ঈমান আনব যে, এ নামটি নির্দেশ করছে যে, আল্লাহ তাআলা রহমতের মালিক। আরও ঈমান আনব যে আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা তাকে রহম করেন। অনুরূপভাবে কোরান-সুন্নাহয় আল্লাহ তাআলার যেসব নাম উল্লিখিত হয়েছে, সকল নামের ক্ষেত্রে একইরূপে ঈমান আনতে হবে ।

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৮ : আল্লাহর নামের সংখ্যা

আল্লাহর নামের সংখ্যা

আল্লাহ তাআলার নিরানববইটি নাম পাওয়া যায়। সহিহ বুখারি ও মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলার নিরানববইটি নাম, একটা কম একশ’। যে ব্যক্তি এ নামগুলো গুনবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আল্লাহ বেজোড়, তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন।’ [বুখারি , তিরমিযি, নাসায়ি ও ইবনে মাজাহ]

‘আল্লাহ তাআলার নিরানববইটি নাম’, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথার ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেছেন যে, হাদিসটির অর্থ এটা নয় যে আল্লাহ তাআলার নাম নিরানববইটির মধ্যেই সীমিত। বরং উক্ত হাদিসের উদ্দেশ্য, এ কথা বলা যে আল্লাহ তাআলার নিরানববইটি নাম রয়েছে, যা গণনা করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে। এ নিরানববই নামের বাইরে আল্লাহ তাআলার কোনো নাম নেই, হাদিসটি তা বলছে না। [দেখুন আল আসমা ওয়াসসিফাত লিল বাইহাকী পৃ. ৬; ফাতহুল বারী ৫/৩৭২; হেদায়াতুর বারি ১/১৩৫; মুসলিম, আস-সহিহ (নববীর ব্যাখ্যাসহ) ১৫/৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত এক হাদিস দ্বারা জানতে পারি, আল্লাহ তাআলার এমন নাম আছে যার ব্যাপারে আমাদের জানানো হয়নি। বরং তাঁর ইলম আল্লাহ তাআলা নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন। হাদিসটি হলো-

أَمْتُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ إِنِّي اللَّهُمَّ، فَقَالَ وَلَا حَزْنَ هُمْ قَطَّ مُسْلِمًا أَصَابَ مَا بِهِ سَمِيتَ لَكَ، هُوَ اسْمُ كُلِّ أَسْأَلَكَ قِضَاؤُكَ، فِي عَدْلٍ حَكَمِكَ، فِي مَاضٍ بَيْدِكَ، نَاصِيَتِي عِلْمٌ فِي بِهِ اسْتَأْثَرْتُ أَوْ خَلَقْتُكَ، مِنْ أَحَدًا عِلْمَتُهُ أَوْ كِتَابِكَ، فِي أَنْزَلْتَهُ أَوْ نَفْسِكَ، لَا وَغَمِي، هُمِي وَذَهَابَ حَزْنِي، وَجَاءَ قَلْبِي، رُبِيعَ الْقُرْآنِ تَجْعَلُ أَنْ عِنْدَكَ، الْغَيْبِ نَتَعْلَمُ أَلَا، اللَّهُ يَارَسُولَ، قَالُوا. فَرَحًا هُمُ مَكَانَ وَأَبْدَلَهُ هُمُ عَنْهُ اللَّهُ أَذْهَبَ. يَتَعْلَمُهُنَ أَنْ سَمِعَهُنَ لِمَنْ يَنْبَغِي، بَلَى، قَالَ الْكَلِمَاتُ؟ هَذِهِ

‘কোনো মুসলমান যদি চিন্তা-উৎকণ্ঠায় আক্রান্ত হয়, অতঃপর বলে- হে আল্লাহ আমি আপনার বান্দা এবং আপনার বান্দার সন্তান, আপনার বান্দীর সন্তান। আমার ললাট আপনার হাতে। আপনার হুকুম আমার উপর অনিবার্যরূপে বাস্তবায়িত, আমার ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত ন্যায়পূর্ণ। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি প্রত্যেক ওই নামের মাধ্যমে যা আপনার, যার দ্বারা আপনি নিজের নাম রেখেছেন, অথবা যে নাম আপনি আপনার কিতাবে নাজিল করেছেন, অথবা যে নাম আপনি অন্য কাউকে না জানিয়ে নিজের গায়েবি ইলমে রেখে দিয়েছেন- যে আপনি কোরানকে আমার অন্তরের বসন্ত বানিয়ে দিন, আমার চিন্তা চলে যাওয়া ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূরীভূত হওয়ার কারণ বানিয়ে দিন। যে এরূপ বলবে আল্লাহ তার অন্তরের চিন্তা-উৎকণ্ঠা দূর করে দেবেন এবং তা তিনি খুশির দ্বারা রূপান্তরিত করে দেবেন। সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি এ শব্দসমূহ শিখব না? তিনি বললেন, অবশ্যই। যে এগুলো শুনবে তার উচিত হবে তা মুখস্থ করা।’ [বর্ণনায় আহমদ ও আবু উআনা। হাইছামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ-এ বলেছেন- হাদিসটি ইমাম আহমদ, আবু ইউলা ও বাযযার বর্ণনা করেছেন। আবু সালামা আল জুহানী ছাড়া ইমাম আহমদের বর্ণনার সকল রাবী এমন যাদের বর্ণিত হাদিস সহিহ হাদীসের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। তবে ইবনে হিব্বান আবু সালামা আল জুহানীকেও ছিকাহ তথা বিশ্বস্ত বলেছেন- দেখুন ইছারুল হক পৃ. ১৭০; আল আসমা ওয়াস সিফাত লিল বাইহাকী পৃ. ৬-৭]

আল্লাহ তাআলার নিরানববইটি নাম যে গণনা করবে, সে জান্নাতে যাবে- এর অর্থ যে এ নামগুলো জানবে, সংরক্ষণ করবে ও বুঝবে, এ নামগুলোর প্রতি ঈমান আনবে, এর যথার্থ মর্যাদা দেবে, এ নামগুলোকেন্দ্রিক আল্লাহ তাআলার সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে এ নামগুলোর সীমানা রক্ষা করে চলবে। এ নামগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলাকে ডাকবে। অতএব হাদিসের অর্থ হবে , যে ব্যক্তি এ নামগুলোর অর্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে এবং তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে তা সংরক্ষণ করবে, এ নামগুলির দাবি অনুযায়ী আমল করবে, এ নামগুলো যে

সত্তাৰ তাঁৰ পবিত্ৰতা ঘোষণা কৰবে, সে জান্নাতে প্ৰবেশ কৰবে।[আল আসমা ওয়াস সিফাত লিল বাইহাকী
পৃ. ৬; ফাতহুল বারী ১৩/৩২২; মুসলিম, আস-সহিহ (নববীৰ ব্যাখ্যাসহ) ১৭/৫, ৬]

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৯ : আল্লাহর নাম ও সিফাত-কেন্দ্রিক তাওহিদের দলিল

আল্লাহর নাম ও সিফাত-কেন্দ্রিক তাওহিদের দলিল

কোরান-সুন্নাহয় এ প্রকার তাওহিদের দলিল প্রচুর। বরং আল-কোরানের এমন কোনো সূরা পাওয়া যাবে না, এমনকি কোনো পৃষ্ঠাও পাওয়া যাবে না, যেখানে আল্লাহর নাম ও সিফাতের উল্লেখ নেই। আল-কোরান চাই তাওহিদের কথা বলুক, অথবা ইবাদত ও বিধানের কথা বলুক, অথবা আদেশ-নিষেধ ওয়াদা ও হুঁশিয়ারির কথা বলুক, অথবা কাহিনী ও উপমা উল্লেখ করুক সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহর নাম ও সিফাত পাওয়া যাবে। আমি এখানে একটি সূরা উল্লেখ করব, যা তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাতকে একত্র করেছে। সূরাটি হলো সূরা আল ইখলাস, যা হাদিস অনুযায়ী আল-কোরানের এক-তৃতীয়াংশের সমান। [সহিহ বুখারিতে আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) এর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যার হাতে আমার নফস তাঁর কসম, তা [সূরা ইখলাস] আল-কোরানের এক-তৃতীয়াংশের সমান।' [বুখারি, আস-সহিহ ৯/৪৯]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

. أَحَدٌ كُفُوًا لَهُ يَكُنْ وَلَمْ . يُؤَلَّدْ وَلَمْ يَلِدْ لَمْ . الصَّمَدُ اللَّهُ . أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ .

‘বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাঁর কোনো সমকক্ষও নেই’ - (সূরা ইখলাস)।

এ মহৎ সূরাটি আল্লাহ তাআলার জন্য সকল কামাল ও পূর্ণতাকে সাব্যস্ত করেছে। সকল অপূর্ণতা থেকে আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তাআলা এ সূরায় আমাদের জানিয়েছেন যে তিনি অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনি কারো থেকে জন্ম নেননি এবং তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই। ‘আহাদ’ শব্দের অর্থ- যার কোনো সাদৃশ্য ও তুলনা নেই। [শারহ মুল্লা আলী কারী আলাল ফিকহিল আকবার পৃ. ১৪] অতএব এ মহিমাম্বিত নামটি স্পষ্টরূপে নির্দেশ করেছে যে, আল্লাহ তাআলার জন্য সকল পূর্ণাঙ্গ গুণাবলি সুনির্দিষ্ট রয়েছে, আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কোনো জিনিসের অস্তিত্ব নেই। আর ‘আস্সামাদ’ শব্দের অর্থ হলো এমন সরদার সকল বিষয়ে যার মুখাপেক্ষী হতে হয়, প্রয়োজন ও সমস্যায় যাকে ডাকতে হয়। [শারহ মুল্লা আলী কারী আলাল ফিকহিল আকবার পৃ. ১৪] অতএব এ নামটি যা নির্দেশ করেছে, তা হলো- একমাত্র আল্লাহ তাআলাই হলেন সেই সত্তা, যিনি প্রয়োজন ও সমস্যায় শরণাপন্ন হওয়ার উপযোগী। যদি কোনো ব্যক্তি সত্যচ্যুত হয়ে, পথহারা হয়ে- যে বিষয়ে কেবল আল্লাহরই শরণাপন্ন হতে হয়- সে বিষয়ে কোনো মাথলুকের শরণাপন্ন হয়, তাহলে আল্লাহর এ অধিকার চলে যায় না। কেননা যদি আল্লাহ তাআলাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির সকল বিষয়ের মুদাবেবর-ব্যবস্থাপক হয়ে থাকেন, যিনি ছাড়া অন্যকোনো সৃষ্টিকর্তা ও ব্যবস্থাপক নেই, তাহলে আল্লাহ তাআলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং তাঁর শরণাপন্ন না-হওয়া চরম বোকামি ও মূর্থতা; কেননা সকল বিষয় একমাত্র আল্লাহর হাতে। [আল আসমা ওয়াস সিফাত পৃ. ৫৮] আর এ ভাবেই আল্লাহর ‘আহাদ’ নামটি আল্লাহ তাআলা থেকে সকল অপূর্ণতাকে ‘না’ করে দিচ্ছে এবং সকল পূর্ণতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। [ফাতহুল বারী ৯/৫০]

বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না, কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সূরাটিকে আল-কোরানের এক-তৃতীয়াংশ বলে ঘোষণা করেছেন। সূরাটি ইসলামের সকল আকীদাকেই শামিল করেছে, যা আল্লাহর জন্য সকল পূর্ণ গুণাবলিকে প্রমাণ করে এবং সকল অপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থেকে আল্লাহর তাআলার পবিত্রতার ঘোষণা দেয় এবং কেবল আল্লাহ তাআলাই যে ইবাদত ও শরণাপন্ন হওয়ার একমাত্র পাত্র তা নির্দেশ করে। আর আল কোরান সামগ্রিকভাবে একটি আকীদা যা- আল্লাহ, তাঁর নাম ও সিফাতের ক্ষেত্রে বান্দাদের করণীয় কী তা বলে দেয়; আল কোরান একটি শরিয়ত যা অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে বর্ণনা দেয়, মানুষের পরস্পর আচরণবিধি কি তা বলে দেয়; আল কোরান সংবাদ ও কাহিনী, যা বান্দাদের বলে দেয় সৃষ্টিকুলের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা কী ধরনের আচরণ করেন। আল্লাহর ছাওয়াব ও শাস্তি, ওয়াদা ও হুঁশিয়ারি সব কিছুই আল কোরান বিস্তারিত বলে দেয়।

ইমাম ইবনুল কাইয়েম এ সূরার হাকিকত বর্ণনা করে বলেন, ‘সূরা ইখলাস যা শামিল করে তা হলো- বিশ্বাস ও জ্ঞানগত তাওহিদ; রব তাআলার অদ্বিতীয়ত্বে এমন বিশ্বাস যা সকল প্রকার অংশীদারিত্বকে প্রত্যাখ্যান করে দেয়; আল্লাহ তাআলার সামাদিত- সকলকে তাঁর মুখাপেক্ষী হওয়া এবং তাঁর কারও মুখাপেক্ষী না হওয়া- আল্লাহ তাআলার কারও সন্তান হওয়া এবং কারও পিতা হওয়াকে অস্বীকার করা, যা আল্লাহর অমুখাপেক্ষীতার অবশ্যজ্ঞাবী একটি দাবি। আল্লাহর কোনো সমকক্ষ না থাকা, যা আল্লাহর কোনো সাদৃশ্য না থাকা, তুলনা ও উপমা না থাকাকে শামিল করে। অতএব এ সূরাটি আল্লাহর জন্য সকল পূর্ণতাকে প্রমাণ করছে, এবং সকল অপূর্ণতা থেকে তাঁর পবিত্র হওয়াকে ব্যক্ত করছে। আল্লাহর কোনো সদৃশ অথবা তুলনা নেই, তাঁর আদৌ কোনো শরীক নেই, সূরাটি তা ব্যক্ত করছে। এ মূলনীতিগুলি বিশ্বাস ও জ্ঞানগত তাওহিদকে একত্রকারী, যা সত্যিকার ঈমানদারকে সকল গোমরাহ ও শিরকপন্থী লোকদের থেকে আলাদা করে দেয়। [যাদুল মাআদ, ১/৮১-৮২]

আল্লাহর নাম ও বিশেষণ সংবলিত যে আয়াতটি উল্লেখ করব, তা হলো আয়াতুল কুরসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে এ আয়াতটি আল-কোরানের সমধিক মহিমাম্বিত আয়াত। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন ,

فِي مَآ السَّمَاوَاتِ فِي مَآ لَهُ نَوْمٌ وَلَا سِنَّةٌ تَأْخُذُهُ لَا الْقِيَوْمُ الْحَيُّ هُوَ إِلَّا إِلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُحِيطُونَ وَلَا خَلْفَهُمْ وَمَا أَيْدِيهِمْ بَيْنَ مَا يَغْلَمُ يَأْذَنُ إِلَّا عِنْدَهُ يَشْفَعُ الَّذِي ذَا مَنْ الْأَرْضِ وَهُوَ حِفْظُهُمَا يَنْوُدُّهُ وَلَا وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ كُرْسِيُّهُ وَسِعَ شَاءَ بِمَا إِلَّا عَلَيْهِ مِنْ بِشْيءٍ الْعَظِيمِ الْعَلِيِّ

‘আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরজীব, সুপ্রতিষ্ঠিত ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। তাঁর জন্যই আসমানসমূহে যা রয়েছে তা এবং জমিনে যা আছে তা। কে সে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা আছে তাদের পেছনে। আর তারা তাঁর জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ত করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ছাড়া। তাঁর কুরসি আসমানসমূহ ও জমিন পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং এ দু’টোর সংরক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ, মহান’ – (সূরা আল বাকারা , ২৫৫)।

মহিমাম্বিত এ আয়াতটি তাওহিদের তিনটি ভিত্তিকেই শামিল করছে; কেননা আয়াতটি আল্লাহ তাআলার এমন নাম ও বিশেষণকে শামিল করে আছে, যার প্রত্যেকটি ইসলামী আকীদার একেকটি মূলনীতি বলে পরিগণিত। যেমন- ‘আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।’ এ বাণীটি উলুহিয়াতের মূলনীতিকে নির্দেশ করছে, যা তাওহিদের ভিত্তি এবং যা থেকে ইসলামের গোটা জীবন-পদ্ধতিই বের হয়ে আসে। অর্থাৎ- ‘আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই’ এ কথার আবশ্যিক দাবি হলো সকল ইবাদত ও দাসত্ব একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিবেদন করা। অতঃপর মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও বান্দা হবে না। অন্য কারও উদ্দেশ্যে ইবাদত-বন্দেগি নিবেদন করবে না। যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও আনুগত্য নিষিদ্ধ, সে সব ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই আনুগত্য করবে। দ্বীন-শরিয়ত-আইন-বিধান-মূল্যবোধ-মতাদর্শ সবকিছু আল্লাহর কাছ থেকেই নেবে ও তাঁর বিধান মুতাবেক নির্ধারণ করবে।

‘তিনি চিরজীব, সুপ্রতিষ্ঠিত ধারক’ এ বাণীর দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাঁর দুটি মহিমাম্বিত নাম উল্লেখ করেছেন , একটি হলো চিরজীব- যার জন্য সার্বক্ষণিক প্রশংসা নির্ধারিত এবং যিনি অনাদি-অনন্তভাবে জীবিত। বলা প্রয়োজন যে আল্লাহর জীবন বলতে যা বুঝায় তা হলো আল্লাহর নিজ সত্তাগত জীবন। তা অন্য কোনো উৎস থেকে আসা জীবন নয়। সৃষ্টিকুলের জীবনের মতো নয়, যা সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে হাদিয়া হিসেবে দেয়া। অনুরূপভাবে আল্লাহর জীবন আযালী-আবাদী, তথা অনাদি ও অনন্ত। [ফী যিলালিল কুরআন, ১/৪১৮-৪১৯]

আল কাইয়ুম (সুপ্রতিষ্ঠিত ধারক) : এ নামের অর্থ তিনি সৃষ্টিকুলের সকল বিষয়-আশয়ের ধারক এবং মহাবিশ্বের সকল অবস্থার ব্যবস্থাপক। তিনি সব কিছু দেখাশোনারকারী- তিনি তাদের রিয়কের ব্যবস্থা করেন,

হিফায়ত করেন, লালন-পালন করেন, তিনি তাঁর ইচ্ছা ও ইরাদা মুতাবেক তাদের পরিচালনা করেন। [আল আসমা ওয়াস সিফাত, পৃ ৪৮]

‘আল হাইয়ুল কাইয়ুম’ আল্লাহ তাআলার সুনদরতম মহিমাস্থিত নামসমূহের মধ্যে দুটি নাম, যা অন্যান্য নামসমূহের কেন্দ্রবিন্দু। কেননা ‘জীবন’ সকল পূর্ণাঙ্গ সিফাত-বিশেষণের উপস্থিতি দাবি করে। পূর্ণাঙ্গ সিফাতের কোনো একটির অনুপস্থিতির অর্থ হবে জীবনের কোনো দুর্বলতা। অতএব যেহেতু আল্লাহর তাআলা পূর্ণাঙ্গতম জীবনের মালিক, অতএব তিনি সকল পূর্ণাঙ্গ গুণেরও মালিক। আর আল্লাহর কাইয়ুমিয়াত তথা সুপ্রতিষ্ঠিত ধারকত্ব আল্লাহর পূর্ণাঙ্গতম ধনাত্ম ও ক্ষমতাকে শামিল করে। অতএব তিনি নিজেই নিজের অস্তিত্বের ধারক, এ ক্ষেত্রে তিনি কোনোভাবেই অন্য কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি অন্য সকলের ধারক। অতএব অস্তিত্বশীল সব-কিছুই আল্লাহর অস্তিত্ব ও তার ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভরশীল। [শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ, পৃ ১২৪-১২৫]

এ দুটি নাম একজন মুসলমানের জীবনে বিশাল প্রভাব ফেলে। অতঃপর যে ব্যক্তি এ দু-নামের প্রতি ঈমান আনবে, এ দু-নামের যে বিশাল অর্থ রয়েছে তা অন্তরে হাজির করবে, তার অন্তরাত্মা ভালোবাসা, ইবাদত ও আনুগত্যের বাঁধনে আল্লাহর সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে; কেননা সে জানে যে আল্লাহ হলেন তাঁর রব, যিনি তার ও মহাবিশ্বের সকল বিষয়-আশয় পরিচালনা করেন, তাঁর হিকমত ও ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী। অতএব সে তার জীবনে আল্লাহ তাআলার হিকমত ও ব্যবস্থাপনার ওপর প্রতিষ্ঠিত জীবন-পদ্ধতিকে আপন করে নেয়। আল্লাহ তাআলার কাছ থেকেই সে মূল্যবোধ ও মানদণ্ড সংগ্রহ করে। আল্লাহ তাআলা তার সকল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন এ অনুভূতি সে হৃদয়ে সদা জাগ্রত রাখে। [ফী যিলালিল কুরআন, পৃ ৪১৯]

‘তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না।’ আল্লাহ তাআলাই যে সব-কিছুর ধারক এবং সব-কিছুর অস্তিত্ব যে একমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল, এ বাণীটি এ কথার প্রতিই তাগিদ করছে; কেননা তন্দ্রা ও নিদ্রা পূর্ণাঙ্গতম জীবন ও পূর্ণাঙ্গতম ধারকত্বের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। [প্রাগুক্ত]

‘তাঁর জন্যই আসমানসমূহে যা রয়েছে তা এবং জমিনে যা আছে তা।’ এ বাণীটি আল্লাহ তাআলার পূর্ণ মালিকানাতে নির্দেশ করছে, যে মালিকানা নিঃশর্ত ও সকল প্রকার অংশীদারিত্ব থেকে পবিত্র। এই আকীদাটি কারও অন্তরে বসে গেলে তা সীমাহীন প্রভাব ফেলতে বাধ্য। সাইয়্যেদ কুতুব র. বলেন, ‘যদি প্রকৃত মালিকানা কেবল আল্লাহরই হবে এবং মৌলিকভাবে কোনো কিছুর ওপরই মানুষের কোনো মালিকানা না থাকে বরং তারা মূল মালিকের পক্ষ থেকে কেবল খলীফা হয়ে থাকে, তাহলে তাদের ওপর আবশ্যিক হলো খেলাফতসূত্রে প্রাপ্ত মালিকানার ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূল মালিকের শর্তানুযায়ী আমল করা। মূল মালিকের শর্ত কী, তাঁর বিধানই তা বলা আছে। অতএব এ থেকে বিচ্যুত হওয়া তাদের অধিকারভুক্ত নয়। অন্যথায় খেলাফতের অঙ্গীকারসূত্রে-সৃষ্ট তাদের মালিকানা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তাদের আচরণ, লেনদেন অকার্যকর বলে বিবেচিত হবে। আর তাই -যদি কারো অন্তরে এ অনুভূতি শক্তভাবে বসে যায় যে, যা-কিছু আসমান ও জমিনে আছে, বাস্তবিক অর্থে তার প্রকৃত মালিক আল্লাহ। মানুষ যা- কিছুকে নিজের মালিকানাধীন মনে করে, প্রকৃত অর্থে সে তার মালিক নয়, বরং প্রকৃত মালিক হলেন আল্লাহ তাআলা, যিনি তাকে সীমিত সময়ের জন্য এসব কেবল ধার দিয়েছেন, যা সুনির্দিষ্ট সময় পেরুলেই মূল মালিকের কাছে চলে যাবে- যদি কেউ এই হাকীকত ও অনুভূতি হৃদয়ে হাজির করে, তাহলে অশাচিত ও লালসার প্রচণ্ডতা থেকে, কৃপণতা ও লোভের প্রচণ্ডতা থেকে, পাগলের মতো দুনিয়ার কোনো বিষয়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়া থেকে তাকে তা রক্ষা করবে। এ অনুভূতি হৃদয়ে অল্পে তুষ্ট থাকা, রিমিক যা অর্জিত হয় তাতে রাজি থাকা, বদান্যতা, দানশীলতা ইত্যাদির ভাব সৃষ্টি করতে বাধ্য। এ অনুভূতি হৃদয়-মনকে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি উভয় অবস্থায় সন্তোষ জোগায়। অতএব যা পাওয়া যায়নি তার প্রতি আফসোস এবং ভবিষ্যতে যা পাওয়ার ইচ্ছা করা হয় তা পাওয়ার জন্য অন্তর্দাহ সৃষ্টি হওয়া থেকে ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রাখে। [ফী যিলালিল কুরআন:১/৪২০-৪২১]

‘কে সে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া?’ আল্লাহ তাআলার এ বাণীটি মাকামে উলুহিয়াত ও মাকামে উবুদিয়াতকে স্পষ্ট করে ব্যক্ত করছে। অর্থাৎ প্রতিটি সৃষ্টিজীবই আল্লাহর দাস, যে দাস তার দাসত্বের

সীমানা অতিক্রম করে না, সীমার বাইরে যায় না। অতএব আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো মানুষই তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে না। বুঝাই যাচ্ছে যে, শাফাআত-বিষয়ক এ আকীদাটি হাকীকতে রুবুবিয়াত ও হাকীকতে উলুহিয়াতের মাঝে একটি স্পষ্ট সীমানা নির্ধারণকারী। অতএব এ দুটি কখনো মিশে না, একটি অপরটির সঙ্গে শরীক হয় না। কি গুণ কি বৈশিষ্ট্য কোনো ক্ষেত্রেই না। [প্রাগুক্ত]

‘তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা আছে তাদের পেছনে। আর তারা তাঁর জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ত করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ছাড়া।’

এ আয়াতাত্‌শটি আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের ব্যাপকতা, অসীমত্ব, স্থান-কাল-পাত্রকে পরিবেষ্টন করে থাকাকে বোঝাচ্ছে। অন্যদিকে তা সৃষ্টিজীবের অসহায়ত্ব ও তাদের জ্ঞানের অপূর্ণতাকে বোঝাচ্ছে। তারা কেবল সেইটুকু জ্ঞানই লাভ করতে পারে যেটুকু আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ তাআলার এ সিফাতের ওপর যখন একজন মুসলিম বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং অন্তরে তা হাজির করবে- আল্লাহকে সদাদ্রষ্টা হিসেবে জাগ্রত অনুভূতি রেখে, আল্লাহর নির্ধারিত সীমানা সংরক্ষণ করে, ভুল করলে অতি দ্রুত তাওবা করে এবং নিজের হাকীকতকে জেনে ও বিভিন্ন বাস্তবতার জ্ঞানের আকারে আল্লাহ তাকে যে নিয়ামত দিয়েছেন তা অনুভূতিতে এনে-তাহলে বান্দার এ ঈমান ও অনুভূতি তাকে আল্লাহ তাআলার সীমাহীন শোকরগুজার বান্দায় পরিণত করবে এবং দম্ভ-গর্ব- উল্লাসিকতা থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দেবে।

তাঁর কুরসি আসমানসমূহ ও জমিন পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং এ দু’টোর সংরক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না।’ আয়াতের এ অংশটি আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও কুদরতের একটি দলিল।

এই মহিমাম্বিত আয়াতটির শেষাংশে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেন, الْعَظِيمُ الْعَلِيُّ وَهُوَ ‘আর তিনি সুউচ্চ, মহান’ ‘الْعَلِيُّ - সুউচ্চ’ অর্থ সৃষ্টিকুলের উর্ধ্বে, ওপরে। [তাবারী ৫/৪০৫] অতএব আল্লাহ তাআলার শীর্ষতা স্পর্শ করার ক্ষমতা কারও নেই। যদি কেউ অনুচিতভাবে এ ধরনের স্পর্ধা দেখায় এবং উলুহিয়াত দাবি করে বসে, আল্লাহ তাআলা তাকে পৃথিবীতেই হীন ও অপদস্থ করে ছাড়েন। আর আখিরাতের আজাব তো অবশ্যস্তাবীরূপে আছেই।

الْعَظِيمُ - (আল আজিম) মহামহিম। অর্থাৎ একমাত্র তিনিই মহামহিম, তাঁর চেয়ে মহামহিম অন্য কারও অস্তিত্ব নেই। যখন আল্লাহ তাআলার সুউচ্চ ও মহামহিম হওয়ার বিশ্বাস কারো হৃদয়ে প্রথিত হবে, তখন মানুষ তার নিজের মূল্য বুঝতে পারবে। এবং আল্লাহর সামনে দাসত্বের অবস্থান অর্জনের প্রতি লালায়িত হবে। অতঃপর সে দম্ভ-গর্ব থেকে বিরত থাকবে, ঔদ্ধত্য থেকে দূরে থাকবে। আল্লাহকে সে ভয় করবে, আল্লাহর সঙ্গে ও তাঁর মাথলুকের সঙ্গে আদবপূর্ণ আচরণ করবে। [ফী যিলালিল কুরআন, ১/৪২৪]

এ হলো আয়াতুল কুরসির মহান কিছু দিক। অতএব সবার উচিত এ বিষয়গুলো গুরুত্বসহ নেয়া, তা সংরক্ষণ করা, এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা, অন্তরে তা হাজির করা, এগুলোর যে হক রয়েছে তা যথার্থরূপে আদায় করা। আয়াতুল কুরসির ফজিলত সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রাযি.) এর বর্ণনায় ইমাম বুখারির র. উল্লিখিত একটি দীর্ঘ হাদিসের একাংশে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তুমি যখন বিছানায় যাবে, আয়াতুল কুরসি পড়বে...; কেননা তা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার সুরক্ষক হিসেবে থাকবে, অতঃপর সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটবর্তী হবে না।’ [বুখারি : ২/৩৮৪]

সহিহ মুসলিমে উবাই ইবনে কাআব (রাযি.) থেকে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘হে আবুল মুনযের, তুমি কি জান, তোমার সঙ্গে-থাকা আল-কোরানের কোন আয়াত সমধিক মহান? আমি বললাম, الْفَيْئُومُ الْحَيُّ هُوَ إِلَّا إِلَهُ لَأَ اللَّهِ অতঃপর তিনি আমার বুকে আঘাত করে বললেন, ইলম থাকার কারণে তোমাকে মোবারকবাদ হে আবুল মুনযের। [মুসলিম : ৬/৯৩]

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ১০ : ফেরেশতার প্রতি ঈমান

ফেরেশতার প্রতি ঈমান

ঈমানের রোকনসমূহের একটি হলো ফেরেশতার প্রতি ঈমান। ফেরেশতার প্রতি ঈমানের অর্থ হলো- এ দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যে আল্লাহ তাআলার ফেরেশতা রয়েছে, যারা নূর দ্বারা সৃষ্ট, যারা আল্লাহর কোনো নির্দেশই অমান্য করেন না এবং আল্লাহ তাআলা তাদের যে দায়িত্বে নিয়োজিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, তারা তা যথার্থরূপে পালনরত। [দেখুন আল আস-ইলা ওয়াল আজওয়েবা আল উসুলিয়া: পৃ: ২১]

ফেরেশতা হলো আল্লাহ তাআলার এক প্রকার মাখলুক। তাঁদের অস্তিত্ব এবং কোরান-সুন্নাহয় তাদের যেসব গুণাবলি ও কর্মের কথা উল্লিখিত আছে তার প্রতি কোনো কমবেশ ও বিকৃতিসাধনের আশ্রয়ে না গিয়ে, ঈমান না-আনলে কারও ঈমানই শুদ্ধ হবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন ,

وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ نَكْتِهَ وَمَلَا يَأْلَهُ أَمَّنْ كُلُّ وَالْمُؤْمِنُونَ رَبِّهِ مِنْ إِلَيْهِ أُنْزِلَ بِمَا الرُّسُولُ أَمَّنْ
الْمَصِيرُ وَإِلَيْكَ رَبُّنَا غُفْرَانُكَ وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا وَقَالُوا رُسُلِهِ مِنْ أَحَدٍ بَيْنَ تَفَرُّقٍ لَا

‘রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নামিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর, আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল’ - (সূরা আর বাকারা , ২৮৫)।

সহিহ বুখারি ও মুসলিম ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদিসে জিবরিলে এসেছে। ‘ঈমান কি?’ জিবরীল আলাইহিস সালামের এ প্রশ্নের জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং ভাগ্যের ভালোমন্দের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করবে।’ [বুখারি ও মুসলিম]

ফেরেশতাদের অস্তিত্ব অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কারণেই ফেরেশতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা আল কোরান ও মুসলমানদের ঐকমত্য অনুযায়ী কুফরি।

ইরশাদ হয়েছে ,

بَعِيدًا ضَلَالًا ضَلَّ فَقَدْ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَمَلَائِكَتِهِ يَأْلَهُ يَكْفُرُ وَمَنْ

‘আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং শেষ দিনকে অস্বীকার করবে, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হবে’ - (সূরা আন-নিসা , ১৩৬)।

কোরান হাদিসের যেসব জায়গায় ফেরেশতা, তাদের গুণাবলি, কর্ম ও অবস্থা সম্পর্কে কথা এসেছে, তা ঘেঁটে দেখলে বুঝা যায় যে, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে ফেরেশতাদের সম্পর্ক, মানুষ ও মহাবিশ্বের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের এমন বিষয়গুলোই আমাদের জানিয়েছেন, যা অন্তর পবিত্রকরণ ও আমল শুদ্ধিকরণের জন্য আমাদের প্রয়োজন।

তবে ফেরেশতার হাকীকত কী, আল্লাহ তাদের কীভাবে সৃষ্টি করেছেন, তাদের বিস্তারিত অবস্থা কী, এ সব বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ তাআলা নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন। বরং ইসলামী আকীদার এটি একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য যে তা মহাবৈশ্বয়িক বাস্তবতার পরিচিতি ঠিক সে-পরিমাণেই উল্লেখ করেছে যে পরিমাণ মানুষের মেধাবুদ্ধি ধারণ করতে পারবে এবং তাদের ইহ-পরকালীন অবস্থার পরিশুদ্ধিতে উপকারী হবে। অতএব আল্লাহ

তাতালা আতাদের সকল অদৃশ্য বিষয়গুলো জানাননি, হোক তা তাঁর সত্তা, গুণাবলি ও নাম বিষয়ক, অথবা অদৃশ্য সৃষ্টিজীব বিষয়ক।

সে হিসেবে একজন মুমিন, আল্লাহ তাতালা যেসব বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন তার সবগুলির প্রতিই সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তারিত আকারে ঈমান আনে এবং এ ক্ষেত্রে কোরান-সুন্নাহয় যা বর্ণিত আছে তাতে কোনো কমবেশ করে না । উপরন্তু যেসব বিষয় জানানো হয়নি তাতে ঘাঁটাঘাঁটি করতেও যায় না, তা আলোচনার বিষয় বানায় না ।

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ১১ : ফেরেশতাদের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য

ফেরেশতাদের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো যে, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অতি সামান্যই আমাদের জানিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের জানিয়েছেন যে, তিনি তাদের আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টির পূর্বেই সৃষ্টি করেছেন। [দেখুন ফাতহুল বারী : ৬/২৩৪] এর প্রমাণ, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণকে এ ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন যাকে পৃথিবীতে বসবাস করাবেন। তিনি বলেছেন ,

فِيهَا يُفْسِدُ مَنْ فِيهَا أَتَجْعَلُ قَالُوا خَلِيفَةُ الْأَرْضِ فِي جَاعِلُ إِنِّي مَلَايِكَةٌ لَدُ رَبِّكَ قَالَ وَإِذْ تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلَمُ إِنِّي قَالَ لَكَ وَتُقَدَّسُ بِحَمْدِكَ تُسَبِّحُ وَنَحْنُ الدَّمَاءُ وَيَسْفِكُ

‘আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, ‘নিশ্চয় আমি জমিনে একজন খলীফা সৃষ্টি করছি’, তারা বলল, ‘আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে তাতে ফাসাদ করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে? আর আমরা তো আপনার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি জানি যা তোমরা জান না’ - (সূরা আল বাকারা , ৩০)।

আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত সহিহ মুসলিমের এক হাদীসে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘ফেরেশতাদের নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, জিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে ধোঁয়াবিহীন আগুন দ্বারা এবং আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা থেকে যার বর্ণনা তোমাদের শুনানো হয়েছে।’ [দেখুন প্রাগুক্ত: ৬/২৩২]

ফেরেশতা বিষয়ে কোরান-সুন্নাহর পাঠ থেকে যে বিষয়টি উঠে আসে, তাহলো ফেরেশতার নূরের তৈরি মাখলুক। তাদের কোনো পদার্থিক শরীর নেই যা মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতির আওতায় আসতে পারে। তারা মানুষের মতো নয়। অতএব তাদের খাদ্য ও পানীয়ের প্রয়োজন পড়ে না। তারা ঘুমান না। বিবাহ করেন না। পশুপ্রবৃত্তি থেকে তারা পবিত্র। গুনাহ থেকে তারা পবিত্র। মানুষের যেসব পদার্থিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে ফেরেশতার তা থেকে মুক্ত। [শারহ মুল্লা আলী আল কারী আল ফিকহিল আকবার: পৃ : ১১; ফাতহুর বারী ৬/২৩২]

তবে আল্লাহর অনুমতিতে তারা মানুষের আকৃতি ধারণ করতে পারেন। যেমন আল্লাহ তাআলা জিবরিল আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন যে তিনি মারযাম আ. এর কাছে মানবাকৃতি ধারণ করে উপস্থিত হয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে ,

دُونَهُمْ مِنْ فَاتَخَذَتْ . شَرْقِيًّا مَكَانًا أَهْلِهَا مِنْ أَنْتَبَذَتْ إِذْ مَزِيمَ الْكِتَابِ فِي وَادُكُرْ سَوِيًّا بَشَرًا لَهَا فَتَمَثَّلَ رُوحَنَا إِلَيْهَا فَأَرْسَلْنَا حَجَابًا

‘আর স্মরণ কর এই কিতাবে মারযামকে যখন সে তার পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে পূর্ব দিকের কোনো এক স্থানে চলে গেল। আর সে তাদের নিকট থেকে (নিজকে) আড়াল করল। তখন আমি তার নিকট আমার রূহ (জিবরীল) কে প্রেরণ করলাম। অতঃপর সে তার সামনে পূর্ণ মানবের রূপ ধারণ করল’ - (সূরা মারযাম , ১৬-১৭)।

উমর (রাযি.) বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদিস, হাদিসে জিবরিলে রয়েছে যে, জিবরিল আ. একজন পুরুষের আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসেছেন, যার কাপড় ছিল ধবধবে সাদা, চুল ছিল কুচকুচে কালো, যার গায়ে সফরের কোনো লক্ষণই দেখা যায়নি। তিনি তাঁর হাঁটুদ্বয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাঁটুদ্বয়ের সঙ্গে লাগিয়ে এবং দু-হাত তাঁর রানের ওপর রেখে বসেছেন। এর পর প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন। [এ হাদিসটি তথ্যসূত্র পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।]

ফেরেশতাদের সৃষ্টিগত আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো তাদের বিভিন্ন সংখ্যায় পাখা থাকা। আল-কোরানে ইরশাদ হয়েছে

وَرُبَاعَ وَثَلَاثَ مِثْنَى أَجْنَحَةٍ أُولَى رُسُلًا الْمَلَائِكَةِ جَاعِلٍ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ فَاطِرٌ لِلَّهِ الْحَمْدُ قَدِيرُ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى اللَّهِ إِنَّ يَشَاءُ مَا الْخَلْقِ فِي يَزِيدُ

‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা, ফেরেশতাদেরকে বাণীবাহকরূপে নিযুক্তকারী, যারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান’ - (সূরা ফাতির , ১)।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত এক হাদিস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীল আলাইহিস সালামকে দেখেছেন যে, তাঁর ছয়শত পাখা রয়েছে। [বুখারি : ৬/২৪২]

সম্মানিত মাখলুক ফেরেশতাদের সৃষ্টিগত আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আমাদের এ টুকুই জানিয়েছেন। অতএব আমরা এ টুকুর ওপরই হুবহু বিশ্বাস স্থাপন করব। এর অতিরিক্ত কিছু দাবি করব না। যদি ফেরেশতাদের ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানায় মানুষের কোনো উপকার নিহিত থাকত, তাহলে আল্লাহর তাআলা অবশ্যই তা জানাতেন, এ বিষয়ক জ্ঞান তিনি গোপন করতেন না; কেননা তিনি বান্দাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু।

সম্মানিত ইবাদ : আল্লাহর সঙ্গে ফেরেশতাদের সম্পর্ক খালিস-দাসত্ব, ঐকান্তিক-আনুগত্য ও একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন করে যাওয়ার সম্পর্ক, আল্লাহর নির্দেশমালার সামনে চূড়ান্ত পর্যায়ের নতি স্বীকারের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক ছাড়া অন্যকোনো সম্পর্কে তারা আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত নন। তারা ইলাহ নন। তারা আল্লাহর সন্তানসন্ততি বা মেয়ে নন, যেমন মুশরিকরা দাবি করেছিল।

আল্লাহ তাআলা বলেন ,

وَهُمْ بِالْقَوْلِ يُسَبِّحُونَ لَا . مُكْرَمُونَ عِبَادٌ بَلْ سُبْحَانَهُ وَلَدًا الرَّحْمَنُ اتَّخَذَ وَقَالُوا مِنْ وَهُمْ ارْتَضَى لِمَنْ إِلَّا يَشْفَعُونَ وَلَا خَلْفَهُمْ مَا وَ أَيْدِيهِمْ بَيْنَ مَا يَعْلَمُ . يَعْمَلُونَ بِأَمْرِهِ مُشْفِقُونَ خَشِيَّتِهِ

‘আর তারা বলে, ‘পরম করুণাময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।’ তিনি পবিত্র। বরং তারা [বনু খুযা‘আ দাবি করত, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা। এ ভুল ধারণা দূর করতে আল্লাহ বলেন, ফেরেশতারা আল্লাহর সন্তান নয়; বরং তারা সম্মানিত বান্দা। আল-কাশশাফ] সম্মানিত বান্দা। তারা তাঁর আগ বাড়িয়ে কোনো কথা বলে না, তাঁর নির্দেশেই তো তারা কাজ করে। তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। আর তারা শুধু তাদের জন্যই সুপারিশ করে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। তারা তাঁর ভয়ে ভীত’ - (সূরা আল আশ্বিয়া , ২৭-২৮)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ,

يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ فَوْقَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ يَخَافُونَ

‘তারা তাদের উপরস্থ রবকে ভয় করে এবং তাদেরকে যা নির্দেশ দেয়া হয়, তারা তা করে’ - (সূরা আন-নাহল , ৫০)।

তিনি আরও বলেছেন ,

يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْمَلُونَ لَا

‘আল্লাহ তাদের যে ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন সে ব্যাপারে তারা অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদের আদেশ করা হয়’ – (সূরা আত-তাহরীম , ৬)।

তারা আল্লাহর অনেক সৃষ্টিজীবের মধ্যে এমন এক সৃষ্টি, যারা কেবল আল্লাহর আনুগত্য করেন এবং নিজদের পক্ষ থেকে কোনো-কিছুই করতে পারেন না। তারা নিজেদের ক্ষমতায় আল্লাহর কাছে কোনো প্রস্তাবও পেশ করতে পারেন না। তারা সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহর ইবাদত-আনুগত্যে নিমগ্ন থাকেন। আল-কোরানের এক জায়গায় তাঁদের উদ্ধৃতি এভাবে এসেছে ,

الْمُسَبِّحُونَ لَنَحْنُ وَإِنَّا . الصَّافُّونَ لَنَحْنُ وَإِنَّا . مَعْلُومٌ مَقَامُ لَهُ إِلَّا مِنَّا وَمَا

‘আমাদের প্রত্যেকের জন্যই একটা নির্ধারিত স্থান রয়েছে। আর অবশ্যই আমরা সারিবদ্ধ। আর আমরা অবশ্যই তাসবীহ পাঠকারী’ – (সূরা সাফফাত , ১৬৪-১৬৬)।

যদি এটাই তাদের বাস্তবতা হয়ে থাকে, তাহলে যদি কেউ তাদের ইবাদত করে, অথবা তাদের সাহায্য প্রার্থনা করে অথবা বিশ্বাস করে যে মহাবিশ্বের পরিচালনায় তাদের কোনো অধিকার রয়েছে, তবে তাও শিরক বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন ,

أَنْتُمْ إِذْ بَعَدَ بِالْكَفْرِ أَيَّامُكُمْ أَرْبَابًا وَالنَّبِيِّينَ الْمَلَائِكَةَ وَاتَّخَذُوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ وَلَا مُسْلِمُونَ

আর তিনি তোমাদের নির্দেশ করেন না যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ কর। তোমরা মুসলিম হওয়ার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরের নির্দেশ দেবেন?’ – (সূরা আলে ইমরান , ৮০)।

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ১২ : মানুষ ও মহাবিশ্বের সঙ্গে ফেরেশতাদের সম্পর্ক

মানুষ ও মহাবিশ্বের সঙ্গে ফেরেশতাদের সম্পর্ক

আল্লাহর তাআলার সঙ্গে ফেরেশতাদের সম্পর্ক হলো, পূর্ণাঙ্গ দাসত্ব ও আনুগত্যের সম্পর্ক। তাঁরা আল্লাহ তাআলার সকল আদেশ-নিষেধ নির্দিধায় মেনে চলেন। অতএব মানুষ ও মহাবিশ্বের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটাও হলো আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও দাসত্ব-কেন্দ্রিক। আর তা এভাবে যে- ফেরেশতাদের ইবাদত শুধু আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা, গুণকীর্তন ও মহিমা বর্ণনা করায় সীমাবদ্ধ নয়। বরং মহাবিশ্বের পরিচালনায় আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা-অনিচ্ছার অনুপুঙ্খ বাস্তবায়ন করেও তারা আল্লাহর আনুগত্যের পরিচয় দেন। যেমন মহাবিশ্বে আল্লাহর যেসব সৃষ্টি রয়েছে, জৈব অথবা অজৈব, এবং প্রত্যেকের যে নড়াচড়া ও কর্মচাঞ্চল্য রয়েছে, এবং মহাবিশ্বে যেসব নিয়ম নীতি রয়েছে, আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা তা তদারকিসহ আল্লাহর সিদ্ধান্তমালা সকল সৃষ্টিকুলের ওপর বাস্তবায়ন করে থাকেন। মহাবিশ্বে যত মুভমেন্ট ঘটে- হোক তা ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত- সব-কিছুর রেকর্ড ও পর্যবেক্ষণে তাঁরা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করে যান। এক-কথায়- তাঁরা আসমান ও জমিনের দায়িত্বে নিয়োজিত এবং এ মহাবিশ্বে যেকোনো ধরনের মুভমেন্ট, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছানুযায়ী, তাদের দায়িত্বের আওতাধীন। [ইগাছাতুল লুহফান: ২/১২০; শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়্যাহ: ২৩৫]

আল্লাহ তাআলা বলেন , أَمْرًا فَالْمُدَبِّرَاتِ 'অতঃপর কসম সকল কার্যনির্বাহকারীদের' - (সূরা আন-নাযিআত , ৫)। 'কার্যনির্বাহকারী' বলতে আল্লাহর নির্দেশে আসমান ও জমিনের কার্যনির্বাহকারী ফেরেশতাদের বোঝানো হয়েছে। তিনি অন্যত্র বলেছেন, أَمْرًا فَالْمُقَسَّمَاتِ 'আর কসম নির্দেশ বন্টনকারীদের' - সূরা আয-যারিয়াত , ৪)। 'নির্দেশ বন্টনকারী' বলতে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ বন্টনকারী ফেরেশতাদের বোঝানো হয়েছে। [ইগাছাতুল লুহফান : পৃ ১২০]

ফেরেশতারা বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন- কোরান-সুন্নাহ থেকে এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা চাঁদ ও সূর্য, গ্রহনক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, মেঘ-বৃষ্টি ইত্যাদির জন্য আলাদা আলাদা ফেরেশতা নিয়োজিত রেখেছেন। মাতৃগর্ভের জন্যও ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন, যারা ভ্রূণের দেখা-শোনা করেন, আর এভাবেই, এক পর্যায়ে, তা পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতি ধারণ করে। মৃত্যু ও জীবননাশের জন্যও ফেরেশতা রয়েছেন। প্রতিটি মানুষের জন্যও ফেরেশতা রয়েছেন, যারা তাকে সংরক্ষণ করেন। বরং প্রতিটি মাখলুক, এমনকি মহাবিশ্বের প্রতিটি ঘটনা ও বিষয়-আশয়ের জন্যও ফেরেশতা রয়েছেন। [ইগাছাতুল লুহফান:২/১২০; শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়্যাহ: পৃ:২৩৫]

মহাবিশ্বে যেসব নীতি ও কার্যকারণ রয়েছে, যার একটি অন্যটির সঙ্গে, সাধারণত, সংযুক্ত। এ বিষয়টির সঙ্গে উল্লিখিত বিশ্বাসের কোনো সংঘর্ষ নেই; কেননা মহাবিশ্বে স্থাপিত নীতি ও কার্যকারণ আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি তথা মাখলুক। অতএব এ সবার দায়িত্বেও ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন, যারা এ সব নীতি ও কার্যকারণের দেখাশোনা করেন, ঠিক একইরূপে যেভাবে তারা অন্য মাখলুকদের দেখাশোনা করেন। মহাবিশ্বে স্থাপিত কার্যকারণ ও নীতিমালা সংরক্ষণ করার ইচ্ছা যদি আল্লাহ তাআলার না-থাকত এবং যদি তা সংরক্ষণের জন্য ফেরেশতা নিয়োজিত না-রাখতেন, তাহলে সুসংহত ও সুবিন্যস্তভাবে লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে মহাবিশ্বের চলমান থাকা কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না।

আর মানুষ তো তার প্রকৃতিগত জীবন নিয়ে সেই সামগ্রিক যন্ত্রের আওতাধীন থাকে, যার জন্য আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা নিয়োজিত করে রেখেছেন; কেননা মানুষ হলো আললাহর সৃষ্টির মধ্যে একটি সৃষ্টি। বরং সে এমন সৃষ্টি, যার জন্য আল্লাহ তাআলা মহাবিশ্বের সব-কিছুই নিয়োজিত করে রেখেছেন। ইরশাদ হয়েছে ,

الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي أَمْ لَكُمْ سَخَّرَ اللَّهُ أَنْ تَرَوْا أَلَمْ

‘তোমরা কি দেখ না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন আসমানসমূহ ও জমিনে যা-কিছু আছে’ - (সূরা লুকমান , ২০)।

অতএব ফেরেশতাদের আসমান ও জমিন এবং দুয়ের মধ্যে যা-কিছু আছে তা সংরক্ষণ ও দেখাশোনা করা, প্রকৃত পক্ষে মানুষকে সহায়তা করা যাতে তারা পৃথিবীতে খেলাফতের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথার্থরূপে পালন করতে পারে।

উপরন্তু মানুষের ইচ্ছাজাত জীবনসংক্রান্ত নানা কর্মেও- যেভাবে আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই- ফেরেশতারা সংযুক্ত রয়েছেন। যেমন মানুষকে হিদায়েতের পথ দেখানো, তাদের সৌভাগ্যবান বানানো। আল্লাহ তাআলার ইবাদত আদায়ের ক্ষেত্রে তাদের সাহায্য করা। হিদায়েত ও কল্যাণের পথ অবলম্বনের ক্ষেত্রে তাদের সহায়তা দেয়া। অকল্যাণ, দুষ্কর্ম ও গোমরাহি থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে তাদের সহায়তা দেয়া। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকেই, সম্মানিত রাসূলগণের মাধ্যমে, পৃথিবীতে হিদায়েত পৌঁছে দেয়ার জন্য বেছে নিয়েছেন। আর এ দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মধ্যে যাকে বেছে নিয়েছেন, তিনি হলেন জিবরীল আলাইহিস সালাম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

الْمُنْذِرِينَ مَنْ لِيَكُونَ قَلْبُكَ عَلَى . مِّنْ الْأَرْوَاحِ بِهِ نَزَلَ . الْعَالَمِينَ رَبِّ لَتَنْزِيلُ وَإِنَّهُ

‘আর নিশ্চয় এ কোরান সৃষ্টিকুলের রবেরই নাযিলকৃত। বিশ্বস্ত আত্মা এটা নিয়ে অবতরণ করেছে। তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও’ - (সূরা আশ-শুয়ারা , ১৯২-১৯৪)

ফেরেশতারা মানুষের জীবনব্যাপী সঙ্গ দেন। তাঁদের এ সঙ্গদানের উদ্দেশ্য মানুষকে সৌভাগ্যবান করা, তাদের হিদায়েতের পথ দেখানো। ফেরেশতারা মানুষের অন্তরে সত্য ও ন্যায়ের অনুভূতি জাগ্রত করেন এবং তা আঁকড়ে ধরতে মানুষকে উৎসাহ দেন। হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘নিশ্চয় আদম সন্তানের শয়তান কর্তৃক জাগ্রত একটি হৃদয়ানুভূতি রয়েছে এবং ফেরেশতা কর্তৃক জাগ্রত একটি হৃদয়ানুভূতিও রয়েছে। শয়তান কর্তৃক জাগ্রত হৃদয়ানুভূতি হলো দুষ্কর্ম করা ও সত্যকে অস্বীকার করার অনুভূতি। আর ফেরেশতা কর্তৃক জাগ্রত হৃদয়ানুভূতি হলো ভালো কাজ ও সত্যকে স্বীকার করার অনুভূতি। অতএব, যদি কেউ এরূপ অনুভূতি আঁচ করে, তবে তাকে বুঝতে হবে যে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি এর বিপরীতটি অনুভব করে তাহলে সে যেন শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ,

عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ وَفَضْلًا مِنْهُ مَغْفِرَةٌ يَعِدُكُمْ وَاللَّهُ بِالْفَحْشَاءِ وَيَأْمُرُكُمْ الْفَقْرَ يَعِدُكُمْ الشَّيْطَانُ

‘শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বস্ত’ - (সূরা আল বাকারা , ৩৬৮)। [হাদিসটি তিরমিযি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, তা হাসান গারীব; নাসায়ী ও ইবনে হিব্বানও হাদিসটি ইবনে মাসউদ রাযি. এর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। [দেখুন: ফয়জুল কাদীর:১/৪৪৯]

আল্লাহ তাআলা আমাদের আরও সংবাদ দিয়েছেন যে তিনি মুমিনদের জন্য দোয়া ও ইস্তিগফার করার জন্যও ফেরেশতাদের নিয়োজিত রেখেছেন। এ মর্মে তিনি বলেছেন ,

لِذِينَ لَمْ يَسْتَغْفِرُوا بِهِ وَيُؤْمِنُونَ رَبَّهُمْ بِحَمْدٍ يُسَبِّحُونَ حَوْلَهُ وَمَنْ الْعَرْشِ يَحْمِلُونَ الَّذِينَ وَقِهِمْ سَبِيلَكَ وَاتَّبِعُوا تَابُوا لِلَّذِينَ فَارَغُوا وَعِلْمًا رَحْمَةً شَيْءٌ كُلٌّ وَسَعَتْ رَبُّنَا أَمَنُوا وَأَرْوَاهُمْ آبَائِهِمْ مِنْ صَلَاحٍ وَمَنْ وَعَدْتُهُمُ الَّتِي عَدَنَ جَنَاتٍ وَأَدْخَلَهُمْ رَبُّنَا الْجَنَّةَ عَذَابَ فَقَدْ يَوْمُئِذٍ السَّيِّئَاتِ تَقِي وَمَنْ السَّيِّئَاتِ وَقِهِمْ . الْحَكِيمُ الْعَزِيزُ أَنْتَ إِنَّكَ ذُرِّيَّتَهُمُ وَالْعَظِيمُ الْفَوْزُ هُوَ وَذَلِكَ رَحْمَتُهُ

‘যারা আরশকে ধারণ করে এবং যারা এর চারপাশে রয়েছে, তারা তাদের রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করে এবং তাঁর প্রতি ঈমান রাখে। আর মুমিনদের জন্য ক্ষমা চেয়ে বলে যে, ‘হে আমাদের রব, আপনি রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সব কিছুকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছেন। অতএব যারা তাওবা করে এবং আপনার পথ অনুসরণ করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আর জাহান্নামের আজাব থেকে আপনি তাদেরকে রক্ষা করুন’। ‘হে আমাদের রব, আর আপনি তাদেরকে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করান, যার ওয়াদা আপনি তাদের দিয়েছেন। আর তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সংকর্ম সম্পাদন করেছে তাদেরকেও। নিশ্চয় আপনি মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়।’ আর আপনি তাদের অপরাধের আজাব হতে রক্ষা করুন এবং সেদিন আপনি যাকে অপরাধের আজাব থেকে রক্ষা করবেন, অবশ্যই তাকে অনুগ্রহ করবেন। আর এটিই মহাসাফল্য’ – (সূরা গাফের , ৭-৯)।

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘প্রতিদিন সকালে দু’জন ফেরেশতা অবতরণ করে। তাদের একজন বলে, ‘হে আল্লাহ, আপনি ব্যয়কারীকে [ব্যয়কৃত সম্পদের] স্থলাভিষিক্ত সম্পদ দিন। আর অন্যজন বলে, ‘হে আল্লাহ, আপনি ব্যয়কর্তৃণের সম্পদ বিনাশ করুন।’ [মুত্তাফাকুন আলাইহি- দেখুন সহিহ বুখারি ফাতহুল বারীসহ: ৩/২৩৭]

ফেরেশতারা বান্দাদের আল্লাহর ইবাদত-আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ দেন। যিকির ও কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্যকে তাদের নিকট প্রিয় করে তোলেন। ইল্ম ও উত্তম কাজের প্রতি তাদের অনুপ্রাণিত করেন। তাদের নামাজ ও কোরান তিলাওয়াতে তাঁরা হাজির হন। উল্লিখিত সকল বিষয়েই বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত বুখারি ও মুসলিমে উল্লিখিত হাদীস, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘জামাতের সঙ্গে ব্যক্তির নামাজ, তার ঘরে নামাজের চেয়ে অধিক ছাওয়াবপূর্ণ। আর তার বাজারে নামাজ বিশ এরও অধিক মর্যাদাপূর্ণ। আর তা এভাবে যে, তোমাদের কেউ যখন ওয়ু করে এবং তা উত্তমরূপে করে। এরপর সে এমনভাবে মসজিদে আসে যে তাকে নামাজ ছাড়া অন্য কিছু তাড়িত করে না, নামাজ ছাড়া অন্য কিছু সে উদ্দেশ্য করে না, তাহলে মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত, তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে মর্যাদায় তাকে একধাপ উঁচু করে দেয়া হয় এবং তার একটি গুনাহ মার্ফ করে দেয়া হয়। এরপর সে যখন মসজিদে প্রবেশ করে, সে তখন নামাজরত বলে বিবেচিত হয় যতক্ষণ নামাজের অপেক্ষা তাকে আটকে রাখে। আর ফেরেশতারা তোমাদের জন্য দোয়া করতে থাকে যতক্ষণ সে ওই জায়গায় বসে থাকে যেখানে নামাজ আদায় করেছে। এরপর তারা বলে, ‘হে আল্লাহ, আপনি তাকে দয়া করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাকে মার্ফ করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি তার তাওবা কবুল করুন। যতক্ষণ সে তার বসার স্থলে কাউকে কষ্ট না দেবে, যতক্ষণ সে তার ওয়ু নষ্ট না করবে। [মুত্তাফাকুন আলাইহি- দেখুন ফাতহুল বারী ১/৪৪৮; সহিহ মুসলিম (নববীর ব্যাখ্যাসহ) ৫/২২৯]

আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন , ফেরেশতারা তোমাদের মাঝে পালাক্রমে আসে, রাত ও দিনে তারা তোমাদের কাছে আসে, তাদের একদল আসে এবং আরেক দল যায়। ফজর ও আসরের নামাজের সময় তাদের দু-দল একত্র হয়। অতঃপর (পালা শেষ করে) তোমাদের মাঝে রাতযাপনকারী ফেরেশতারা আকাশে উঠে যায়। তখন তাদের রব জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দাদের কি অবস্থায় দেখে এসেছ? অথচ তিনি তাদের সব কিছুই সর্বাধিক অবগত আছেন। জবাবে ফেরেশতারা বলে, আমরা তাদের নামাজরত অবস্থায় রেখে এসেছি, আর গিয়ে দেখেছিলাম তারা নামাজ পড়ছে।’ [মুত্তাফাকুন আলাইহি- দেখুন ফাতহুল বারী ৬/২৩৯]

ফেরেশতারা ইলম তলবকারীদের উৎসাহ দেন। হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘ইলম তলবের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি ঘর থেকে বের হলেই ফেরেশতারা খুশি হয়ে তার জন্য পাখা বিছিয়ে দেয়।’ [বর্ণনায় তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান ও হাকেম। তিরমিযি হাদীসটি সহিহ বলেছেন।]

তারা সৎ কাজের ওপর বান্দাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেন। বিশেষ করে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সময়। ইরশাদ হয়েছে ,

الَّذِينَ قُلُوبُ فِي سَأَلِيٍّ آمَنُوا الَّذِينَ فَتَبَّثُوا مَعَكُمْ أُنَّى الْمَلَائِكَةِ إِلَى رَبِّكَ يُوحِي إِذْ
بَنَانٍ كُلِّ مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا الْأَعْنَاقَ فَوْقَ فَاضْرِبُوا الرُّعْبَ كَفَرُوا

‘স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন যে, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তোমরা তাদেরকে অনড় রাখ’। অচিরেই আমি ভীতি ঢেলে দেব তাদের হৃদয়ে যারা কুফরি করেছে। অতএব তোমরা আঘাত কর ঘাড়ের উপরে এবং আঘাত কর তাদের প্রত্যেক আঙুলের অগ্রভাগে’ - (সূরা আল আনফাল , ১২)।

ফেরেশতাদের যেসব আমলের কথা আল্লাহ তাআলা আমাদের সংবাদ দিয়েছেন, তন্মধ্যে একটি হলো এমন মানুষের জীবনে যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী, বিশেষ করে পাপ-গুনাহ থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে। আর তা হলো বান্দাদের আমল পর্যবেক্ষণ করা ও হিসেব করার পর তা লিখে রাখা। আল্লাহ তাআলা বলেন ,

الْوَرِيدِ لِحَبِّ مِنْ إِلَيْهِ أَقْرَبُ وَتَحْنُ نَفْسُهُ بِهِ تَوَسُّوسُ مَا وَتَعْلَمُ الْإِنْسَانَ خَلَقْنَا وَلَقَدْ
لَدَيْهِ إِلَّا قَوْلٍ مِنْ يَلْفِظُ مَا . قَعِيدُ الشَّمَالِ وَعَنِ الْيَمِينِ عَنِ الْمُتَلَقِّيَانِ يَتَلَقَّى إِذْ
غَتِيدُ رَقِيبُ

‘আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমি জানি। আর আমি তার গলার ধমনী হতেও অধিক কাছে। যখন ডানে ও বামে বসা দু’জন লিপিবদ্ধকারী পরস্পর গ্রহণ করবে। সে যে কথাই উচ্চারণ করে তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষককারী রয়েছে’ - (সূরা ক্বাফ , ১৬)।

অন্য এক আয়াতে এসেছে ,

تَفْعَلُونَ مَا مُؤَنِّيَعَدَ . كَاتِبِينَ كِرَامًا . لَخَافِظِينَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ

‘আর নিশ্চয় তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ রয়েছে। সম্মানিত লেখকবৃন্দ। তারা জানে, যা তোমরা কর’ - (আল ইনফিতার , ১০-১২)।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন ,

تُبُونَكُمْ لَدَيْهِمْ وَرُسُلَنَا بَلَى وَنَجَّوَاهُمْ سِرَّهُمْ نَسْمَعُ لَا أَتَا يَحْسَبُونَ أَمْ

‘না কি তারা মনে করে, আমি তাদের গোপনীয় বিষয় ও নিভৃত সলাপরামর্শ শুনতে পাই না? অবশ্যই হ্যাঁ, আর আমার ফেরেশতাগণ তাদের কাছে থেকে লিখছে’ - (সূরা আয-যুখরুফ , ৮০)।

মানুষের সঙ্গে ফেরেশতাদের সম্পর্ক ও তাদের ইচ্ছাজাত ও অনিচ্ছাজাত আমলে এর প্রভাব বিষয়ক আলোচনার উপসংহারে ইবনুল কাইয়েম আল জাওযিয়া র. এর একটি ব্যাপক অর্থবোধক কথা উল্লেখ করতে চাই। তিনি বলেন, ‘মানুষ ভ্রূণ আকারে মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থা থেকে আরম্ভ করে মানব অস্তিত্বের সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ফেরেশতারা তার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। মাতৃগর্ভে মানুষের উন্মেষক্রিয়া, এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় উন্নীত করা, আকৃতি দান, তিন তবক আঁধারের অভ্যন্তরে তাদের সুরক্ষা দেয়া, তার রিযিক লিপিবদ্ধ করা, বয়স লিপিবদ্ধ করা, তার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা, সকল অবস্থায় তার সঙ্গদান, তার কথা ও কাজ হিসেব করা, তার জীবনকে হিফায়ত করা, মৃত্যুর সময় তার রুহ কড়া করা এবং তা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর তাআলার সামনে পেশ করা, তাকে বারযাখি জীবনপর্ব ও পরবর্তী জীবনে শাস্তি প্রদান ও নিয়ামত ভোগ করানো, নিয়ামত ও আযাবের মাধ্যমসমূহ তৈরি করা- আল্লাহর তাআলার নির্দেশে এসব কাজের দায়িত্বে ফেরেশতাই নিয়োজিত। তারা আল্লাহর অনুমতিতে মুমিন বান্দাদের সৎকাজের ওপর সুস্থির করেন, যা কিছু উপকারী তা তাদের শেখান, তারা তাদের সুরক্ষার জন্য যুদ্ধ করেন।

অতএব তারা দুনিয়া ও আখেরাতে মুমিনদের বন্ধু। মুমিনদের তারা কল্যাণের পথে ডাকেন। দুষ্কর্ম ও অকল্যাণ থেকে তাদের হঁশিয়ার করেন। অতএব ফেরেশতারা মুমিনদের বন্ধু ও তাদের সার্বিক সহযোগিতাকারী। তারা তাদের সুরক্ষা নিশ্চিতকারী ও তাদের শিক্ষক। তাদের উপদেশদাতা। তাদের জন্য দোয়া ও ক্ষমাপ্রার্থনাকারী। মুমিনদের জন্য তারা রহমত বর্ষণের দোয়া করেন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর আনুগত্যের আওতাধীন থাকে, যতক্ষণ মানুষদের জন্য যা-কিছু কল্যাণকর তা শেখায়। তারা যে আল্লাহর কাছে সম্মানিত, এ বিষয়ে তাদের স্বপ্নে, মৃত্যুকালে, পুনরুত্থানকালে সুসংবাদ প্রদান করেন। ফেরেশতারাই একজন মুমিনকে দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ করে তোলেন, আখেরাতের প্রতি তার আগ্রহকে শাণিত করেন। যখন সে কিছু ভুলে যায় ফেরেশতারাই তাকে স্মরণ করিয়ে দেন। যখন নিরুদ্যম হয়ে পড়ে তখন তাকে উদ্যমী করে তোলেন। যখন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে তাকে শান্তনা যোগান। যা তার দুনিয়া ও আখেরাতের স্বার্থসংশ্লিষ্ট তা সম্পন্ন করতে তারা সচেষ্ট হন। তারা হলেন আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর আদেশ নিষেধ বাস্তবায়নে আল্লাহর দূত। তারা আল্লাহ তাআলা ও তার বান্দাদের মাঝে আল্লাহর দূত যারা তাঁর নির্দেশ নিয়ে অবতরণ করেন মহাবিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। তারা আবার নির্দেশ মোতাবেক আল্লাহর কাছেই উঠে যান। [ইগাছাতুল লুহফান মিন মাসাইদিশ শাইতান ২/১২৫-১২৬]

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ১৩ : ফেরেশতাদের সংখ্যা

ফেরেশতাদের সংখ্যা

ফেরেশতা অনেক। তাদের সংখ্যা কত তা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। ইরশাদ হয়েছে ,

كَفَرُوا ذِينَ لَدَفِئَةً إِلَّا عِدَّتْهُمْ جَعَلْنَا وَمَا مَلَائِكَةُ إِلَّا الْبَارِ أَصْحَابَ جَعَلْنَا وَمَا
أَوْثُوا الَّذِينَ يَرْتَابَ وَلَا إِيْمَانًا آمَنُوا الَّذِينَ وَيَزْدَادَ الْكِتَابَ أَوْثُوا الَّذِينَ لِيَسْتَيْقِنَ
بِهَذَا اللَّهُ أَرَادَ مَاذَا وَالْكَافِرُونَ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ فِي الَّذِينَ وَلِيَقُولَ وَالْمُؤْمِنُونَ الْكِتَابَ
إِلَّا هِيَ وَمَا هُوَ إِلَّا رَبُّكَ جُنُودَ يَعْلَمُ وَمَا يَشَاءُ مَنْ وَيَهْدِي يَشَاءُ مَنْ اللَّهُ يُضِلُّ كَذَلِكَ مَثَلًا
لِلْبَشَرِ ذَكَرَى

‘আর আমি ফেরেশতাদেরকেই জাহান্নামের তস্বাবধায়ক বানিয়েছি। আর কাফিরদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ আমি তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করেছি। যাতে কিতাবপ্রাপ্তরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে; আর মুমিনদের ঈমান বেড়ে যায় এবং কিতাবপ্রাপ্তরা ও মুমিনরা সন্দেহ পোষণ না করে। আর যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা এবং কাফিররা যেন বলে, এরূপ উপমা দ্বারা আল্লাহ কী ইচ্ছা করেছেন? এভাবেই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন আর যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর তোমার রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া কেউ জানেন না। আর এ হচ্ছে মানুষের জন্য উপদেশমাত্র’ - (সূরা আল মুদদাছ-ছির , ৩১)।

হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ,

ساجد ملك وعليه إلى أصابع أربع موضع فيها ما تنط، أن لها وحق السماء أطلت

‘আকাশ ভারে কাতরাচ্ছে, আর সে কাতরাতেই পারে। কারণ তার প্রতি চার আঙ্গুল জায়গায় ফেরেশতারা সিজদারত রয়েছে।’ [ফাতহুল বারী ৬/২২৩] মেরাজের হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘অতঃপর আমার জন্য বায়তুল মামুর উর্ধ্বে ওঠানো হলো। আমি জিবরিলকে প্রশ্ন করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, এটা হলো বায়তুল মামুর, যাতে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা নামাজ আদায় করে। [প্রাণ্ডক্ত]

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ১৪ : ফেরেশতাদের প্রতি বিস্মিষ্ট ও অবিস্মিষ্ট ঈমান

ফেরেশতাদের প্রতি বিস্মারিত ও বিস্মারিত ঈমান

ফেরেশতাদের মধ্যে যাদের নাম কোরান-সুন্নাহয় এসেছে, তাদের প্রতি বিস্মারিত আকারে ঈমান আনতে হবে। তাঁদের মধ্যে তিনজন হলেন প্রধান, জিবরিল, মিকাইল ও ইসরাফিল। [ইগাছাতুল লুহফান ২/১২২] জিবরিল হলেন অহি বহনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা। যে অহি মানুষের অন্তরাহ্মায় জীবনীশক্তি সরবরাহ করে। জিবরিল ও মিকাইল এ দুজনের নাম পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

لِلْكَافِرِينَ غَدُوءٌ لِلَّهِ فَإِنَّ وَمِيكَالَ وَجِبْرِيلَ وَرُسُلِهِ نِكَتِهِ وَمِلًّا لِلَّهِ غَدُوءًا كَانَ مَنْ

‘বল, ‘যে জিবরিলের শত্রু হবে (সে অনুশোচনায় মরুক) কেননা নিশ্চয় জিবরিল তা আল্লাহর অনুমতিতে তোমার অন্তরে ন্যায়ল করেছে, তার সামনে থাকা কিতাবের সমর্থক, হিদায়েত ও মুমিনদের জন্য সুসংবাদরূপে’ - (সূরা আল বাকারা , ৪৩)।

আল্লাহ তাআলা আল-কোরানে ফেরেশতা জিবরিল আ. এর প্রশংসা করেছেন এবং তাকে সর্বোত্তম গুণাবলিযুক্ত করে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ,

إِنَّهُ . تَنفَسَ إِذَا حَجَّ وَالصُّبُّ . غَسَّسَ إِذَا وَاللَّيْلُ . الْكُنُسُ الْجَوَار . بِالْخُنُسِ أَقْسَمُ فَلَا أَمِينَ ثُمَّ مَطَاعٍ . مَكِينِ الْعَرْشِ ذِي عِنْدَ قُوَّةٍ ذِي . كَرِيمٍ رَسُولٍ لَقَوْلٍ

‘আমি কসম করছি পশ্চাদপসারী নক্ষত্রের। যা চলমান, অদৃশ্য। আর কসম রাতের, যখন তা বিদায় নেয়। আর কসম প্রভাতের, যখন তা আগমন করে। নিশ্চয় এ কোরান সম্মানিত রাসুলের [জিবরিল (আলাইহিস সালাম)]। আনিত বাণী। যে শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন। মান্যবর, সেখানে সে বিশ্বস্ত’ - (সূরা আত-তাকওয়ির , ১৫-১৬)।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

فَاسْتَوَى مِرَّةً ذُو . الْقُوَى شَدِيدُ عِلْمُهُ

‘তাকে শিক্ষা দিয়েছে প্রবল শক্তিদর, প্রজ্ঞার অধিকারী [জিবরিল]। অতঃপর সে স্থির হয়েছিল’ - (সূরা আন-নাজম , ৫-৬)।

আর মিকাইল হলেন পৃথিবী, উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর জীবন-বিষয়ক কার্যক্রমের দায়িত্বে নিয়োজিত। [ইগাছাতুল লুহফান ২/১২২] পক্ষান্তরে ইসরাফিল আ. শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত, যার মাধ্যমে পরকালীন জীবন শুরু হবে। [প্রাগুক্ত] আল-কোরানে উল্লিখিত আরেকজন ফেরেশতা হলেন, মালেক, যিনি দোযখের প্রহরীর দায়িত্বে নিয়োজিত। ইরশাদ হয়েছে,

مَا كَيْتُونَ إِنْكُمْ قَالَ رَبُّكَ عَلَيْنَا لِيَقْضَى مَا لَكَ يَا وَنَادُوا

‘তারা চিৎকার করে বলবে, ‘হে মালিক, তোমার রব যেন আমাদেরকে শেষ করে দেন’। সে বলবে, ‘নিশ্চয় তোমরা অবস্থানকারী’ - (সূরা আয-যুখরুফ , ৭৭)।

সহিহ হাদিসেও তাঁর কথা এসেছে। [বুখারি , আস-সহিহ (ফাতহুল বারীসহ) : ৬/৩৪২] উল্লিখিত ফেরেশতাসহ যাদের নাম সহিহ হাদীসে এসেছে, তাদের প্রতি ঈমান আনা এবং তারা যে যে দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন, তার প্রতি ঈমান আনা ফরজ। আর যাদের নাম উল্লিখিত হয়নি, তাদের প্রতি এজমালিভাবে ঈমান আনতে হবে। তাদের প্রকার ও কাজকর্মের ব্যাপারে কোরান সুন্নাহয় যা উল্লিখিত রয়েছে তার প্রতিও ঈমান

আনতে হবে। [ইমাম বুখারি একটি আলাদা অধ্যায়ে ফেরেশতাদের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি ত্রিশটিরও অধিক হাদিস এ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন- দেখুন বুখারি, আস-সহিহ (ফাতহুল বারীসহ) : ৬/৩৪২] অতএব আমরা সম্মানিত লেখক ফেরেশতাবৃন্দের প্রতি ঈমান আনব, যাদের আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর সংরক্ষক হিসেবে নিয়োজিত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

تَفْعَلُونَ مَا يَعْلَمُونَ . كَاتِبِينَ كِرَامًا . لِحَافِظِينَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ

‘আর নিশ্চয় তোমাদের ওপর সংরক্ষকগণ রয়েছে। সম্মানিত লেখকবৃন্দ। তারা জানে, যা তোমরা কর।’ - (সূরা আল ইনফিতার , ১০-১২)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

اللَّهُ أَمْرٌ مِنْ يَحْفَظُونَهُ خَلْفَهُ وَمِنْ يَدَيْهِ بَيْنَ نَمٍ مُعَقَّبَاتٍ لَهُ

‘মানুষের জন্য রয়েছে, সামনে ও পেছনে, একের পর এক আগমনকারী প্রহরী, যারা আল্লাহর নির্দেশে তাকে হেফাজত করে’ - (সূরা আর্-রা‘দ , ১১)।

يَكْتُتُونَ لَدَيْهِمْ وَرُسُلُنَا بَلَى اَهُمْ وَنَجَوْ سِرُّهُمْ نَسْمَعُ لَا اُنَّا يَحْسَبُونَ اَمْ

‘না কি তারা মনে করে, আমি তাদের গোপনীয় বিষয় ও নিভৃত সলাপরামর্শ শুনতে পাই না? অবশ্যই হ্যাঁ, আর আমার ফেরেশতাগণ তাদের কাছে থেকে লিখছে’ - (সূরা আয-যুখরুফ , ৮০)।

কোনো-কোনো তাফসিরগ্রন্থে সম্মানিত লেখক ফেরেশতাদের সংখ্যা দু’জন বলা হয়েছে। একজন থাকেন ব্যক্তির ডানে। আর-একজন বামে। যিনি ডানে থাকেন তিনি নেক-আমল লিপিবদ্ধ করেন। আর যিনি বামে থাকেন তিনি বদ-আমলম লিপিবদ্ধ করেন। এ ছাড়া আরও দু’জন ফেরেশতা আছেন যারা সংরক্ষকের দায়িত্বে নিয়োজিত। একজন থাকেন ব্যক্তির সামনে আরেকজন পেছনে। অতএব বলা যায় যে প্রতিটি ব্যক্তির সঙ্গে সার্বক্ষণিকভাবে থাকা ফেরেশতাদের সংখ্যা চারজনের মতো। [দেখুন ইবনু আবিল ইয্য, শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ: পৃ ৪৩৯]

মানুষের সঙ্গী হিসেবে-থাকা ফেরেশতা সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সঙ্গী হিসেবে একজন শয়তান ও একজন ফেরেশতা নিয়োজিত রাখা হয়নি। সাহাবীগণ বললেন, আপনার ক্ষেত্রেও কি, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, আমার ক্ষেত্রেও। তবে আল্লাহ তাআলা আমাকে ওর ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। অতঃপর সে আত্মসমর্পণ করেছে। সে আমাকে ভালো ছাড়া অন্যকিছুর নির্দেশ দেয় না।’ [সহিহ মুসলিম বি শারহনি নববী: ১৭/১৫৭]

আমরা মৃত্যুর ফেরেশতা- মালাকুল মাওত- এর ওপরও বিশ্বাস স্থাপন করি। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরানে বলেন,

ثَرْجَعُونَ رَبِّكُمْ إِلَى ثَمَّ بِكُمْ وَكُلَّ الَّذِي الْمَوْتُ مَلَكَ يَتَوَفَّاكُمْ قُلْ

‘বল, ‘তোমাদেরকে মৃত্যু দেবে মৃত্যুর ফেরেশতা, যাকে তোমাদের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। তারপর তোমাদের রবের নিকট তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে’ - (সূরা আস-সাজদা , ১১)।

মৃত্যুর ফেরেশতার নাম কী, তা পবিত্র কোরান ও সহিহ হাদীসে পাওয়া যায় না। তবে সাহাবায়ে কেরাম ((রাযি.)) থেকে বর্ণিত কিছু আছার থেকে তাঁর নাম আযরাঈল বলে জানা যায়। আল্লাহ তাআলাই এ ব্যাপারে ভালো জানেন। আমরা আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করি। আল-কোরানের আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের কথা এসেছে। ইরশাদ হয়েছে,

ثَمَانِيَّةٌ يُؤْمِنُ فَوْقَهُمْ رَبُّكَ عَرْشٌ وَيَحْمِلُ

‘সেদিন তোমার রবের আরশকে আটজন ফেরেশতা তাদের ঊর্ধ্বে বহন করবে’ - (সূরা আল হা-ক্বাহ , ১৭)।

ইসরাফিল, যিনি শিঙ্গায় ফুঁ দেবেন, তিনিও আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের মধ্যে একজন। [উসূল ঈমান:১৪] যারা জাহান্নামের আগুন দেখাশোনা করার দায়িত্বে আছেন, তাদের প্রতিও আমরা ঈমান আনি। তাঁদেরকে বলা হয় আয-যাবানিয়া। তাঁদের নেতৃত্বে আছেন উনিশজন ফেরেশতা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

الْعَذَابِ مِنْ يَوْمًا عَنَّا يُخَفَّفُ رَبُّكُمْ ادْعُوا جَهَنَّمَ لِحِزَّةِ النَّارِ فِي الَّذِينَ وَقَالَ

‘আর যারা আগুনে থাকবে তারা আগুনের দারোয়ানদের বলবে, ‘তোমাদের রবকে একটু ডাকো না! তিনি যেন একটি দিন আমাদের আজাব লাঘব করে দেন।’ - (সূরা গাফের , ৪৯)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادَ غِلَاطٍ مَلَائِكَةُ عَلَيْهَا

‘যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকুল যারা, আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, সে ব্যাপারে অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়’ - (সূরা আত-তাহরীম , ৬)।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

مَلَائِكَةُ إِلَّا النَّارِ أَصْحَابَ اجْعَلْنَ وَمَا . عَشْرَ تِسْعَةٍ عَلَيْهَا

‘তার ওপর রয়েছে উনিশজন (প্রহরী)। আর আমি ফেরেশতাদেরকেই জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছি’ - (সূরা আল-মুদাছছির , ৩০-৩১)। আমরা জান্নাতের দায়িত্বে-রত ফেরেশতাদের প্রতিও ঈমান আনি, যারা জান্নাতবাসীদের জন্য মেহমানদারি, খাদ্য-পানীয়, পোশাক ইত্যাদি প্রস্তুত করবেন, যা কেউ কোনোদিন চোখেও দেখেনি, কানেও শোনেনি এবং কারও অন্তরেও যা কল্পিত হয়নি।

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ১৫ : মানবজীবনে ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানের প্রভাব

মানবজীবনে ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানের প্রভাব

ইতোপূর্বে এ ব্যাপারে আলোচনা গিয়েছে, যে আল্লাহ তাআলা আমাদের যেসব অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন তাতে রয়েছে আল্লাহ তাআলার প্রভূত নিয়ামত, আমাদের প্রতি এটা তাঁর করুণা যে তিনি আমাদের এই সম্মানিত মাখলুকদের পরিচিতি দিয়েছেন। ঈদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হলো গায়েবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, যা মুতাক্কিদের একটি বৈশিষ্ট্য। ইরশাদ হয়েছে ,

وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ يُؤْمِنُونَ بِالَّذِينَ . نَلْمُتُّقِيْد هُدًى فِيهِ رَيْبٌ لَا الْكِتَابُ ذَلِكَ . الْم
يُنْفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا الصَّلَاةُ

‘আলিফ-লাএ মীম। এটি (আল্লাহর) কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই, মুতাক্কীদের জন্য হিদায়েত। যারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কয়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে’ - (সূরা আল বাকারা , ১-৩)।

একজন মুমিনের জীবনে ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার সুদূরপ্রসারি প্রভাব রয়েছে। যেমন,

১. আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে অনেক কুসংস্কার ও অলীকধারণা থেকে আমাদের বাঁচিয়েছেন যেগুলিতে গায়েবের প্রতি অবিশ্বাসীরা এবং যারা আল্লাহ-প্রদত্ত ওহী থেকে জ্ঞান আহরণ করে না, তারা নিপতিত হয়।
২. আল্লাহর নির্দেশের ওপর অটল থাকা; কেননা একজন মুমিন অন্তর থেকে বিশ্বাস করে যে আল্লাহর সৈনিক ফেরেশতাদের অস্তিত্ব রয়েছে। সে বিশ্বাস করে যে, ফেরেশতাগণ তার সকল কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করছেন। তার সকল কথা পর্যবেক্ষণ করছেন। সে যা বলে বা করে সে-সবের প্রতি ফেরেশতাগণ সাক্ষ্য দেবেন। যে ব্যক্তির অন্তরে এরূপ বিশ্বাস রয়েছে, সে নিশ্চয় আল্লাহকে লজ্জা করবে, তাঁর সৈন্যদের লজ্জা করবে, অতঃপর সে আল্লাহর বিরুদ্ধে যাবে না, আল্লাহর কোনো নির্দেশ অমান্য করবে না, না প্রকাশ্যে, না গোপনে; কারণ, সে কিভাবে তা করতে পারে, যখন সে জানে যে প্রতিটি বিষয়ই হিসেব করা হচ্ছে, প্রতিটি বিষয়ই লেখা হচ্ছে, প্রতিটি ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া হবে।
৩. ধৈর্য ও আল্লাহর রাস্তায় সর্বোচ্চ চেষ্টা-সাধনা, জান-মাল ব্যয় করে যাওয়া, এবং এ ক্ষেত্রে কখনো নিরাশ না হওয়া, বরং হৃদয় শান্ত রাখা। এ বিষয়গুলো ফেরেশতা এবং তাদের কার্যক্রমের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের একটি দাবি। অতএব মুসলিম উম্মাহ যখন সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয় এবং সমাজে জাহিলিয়াত ছেয়ে যায়, মুমিন যখন আপন ভূমিতে, নিজ পরিবারে, নিজ গোত্রে অপরিচিত হয়ে যায়, যখন সবাই মুমিন ব্যক্তিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের পাত্র বানায়, আল্লাহর আনুগত্য থেকে তাকে সরিয়ে আনার পায়তারা করে, সরল পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা চালায়, মুমিন তখন ফেরেশতাদের তার সঙ্গী হিসেবে পায়, যারা তাকে সাহায্য দেন, সহমর্মিতা দেখান, ধৈর্যধারণ করতে বলেন, তার হৃদয়কে স্থির করেন, হিদায়েতের পথে চলার জন্য তাকে উৎসাহ দেন। ঈরা হলেন আল্লাহর সৈন্য, যারা আল্লাহর ইবাদত করেন যেভাবে মুমিন ইবাদত করে। যারা আল্লাহর দিকে ধাবিত হন যেভাবে মুমিন ধাবিত হয়। ঈরা মুমিনের প্রতিটি পদক্ষেপকে মূবারকবাদ জানান, তাকে শক্তি-সাহস জোগান, রব তাআলার কাছে তার প্রশংসা করেন। অতএব মুমিন যখন আল্লাহর পথে চলে তখন সে একা চলে না। বরং সে বিশাল এক বাহিনীর সঙ্গে চলে, মহাবিশ্বে থাকা আল্লাহর অধিকাংশ মাখলুকের সঙ্গে চলে- অর্থাৎ সম্মানিত ফেরেশতা, আশ্বিয়ায়ে কেরাম (আ.), আসমান ও জমিন ইত্যাদির সঙ্গে চলে।

অতএব সেই হলো অধিক সঙ্গী-সাথিবিশিষ্ট পথিক। সমর্থকের সংখ্যার বিচারে সেই হলো অধিক শক্তিশালী। এই সত্য-অনুভূতিগুলো একজন মুমিনকে ধৈর্যশীল বানায়, শান্ত করে। মানুষের বাধানিষেধ দীনের জন্য তার ত্যাগ-তিতিক্ষা আরও শানিত করে, আরও বাড়িয়ে দেয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ফেরেশতা সৃষ্টি করে আল্লাহ তাআলা আমাদের কত নিয়ামতেই না ভূষিত করেছেন। ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিয়ে কত বড় সওগাতেই না তিনি আমাদের ভূষিত করেছেন; কেননা আমাদের অন্তরাহ্বায়, আমলে এবং সামগ্রিক জীবনযাত্রায় এ ঈমানের প্রভাব সুদূরপ্রসারী, বর্ণনাভীত। আর ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান হলো আল্লাহ কিতাব আল কোরানকে সত্য বলে জানা, আল্লাহর রাসূলকে সত্য বলে জানার একটি নিদর্শন।

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ১৬ : নবি-রাসুলগণের (আ.) প্রতি ঈমান

নবি-রাসুলগণের (আ.) প্রতি ঈমান

ঈমানের একটি রোকন হলো নবি-রাসুলগণের (আ.) প্রতি ঈমান। নবি-রাসুলগণের (আ.) প্রতি ঈমানের অর্থ- আল্লাহ তাআলা নবি-রাসুলগণের (আ.) মধ্যে যাদের নাম আল-কোরানে উল্লেখ করেছেন, তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আল-কোরানে যাদের নাম এসেছে, তাঁরা ছাড়াও আল্লাহ তাআলা আরও নবি-রাসুল (আ.) পাঠিয়েছেন, যাদের নাম ও সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না, এ কথার প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করা। ইরশাদ হয়েছে,

مِنْهُمْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلًا أَرْسَلْنَا ذَوَلَقَ
'عَلَيْكَ نَقْصُصُ لَمْ مَنْ وَمِنْهُمْ عَلَيْكَ قَمَصْنَا مَنْ

আর আমি তোমার পূর্বে অনেক রাসুল পাঠিয়েছি। তাদের মধ্যে কারো কারো কাহিনী আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি আর কারো কারো কাহিনী তোমার কাছে বর্ণনা করিনি' - (সূরা গাফের , ৭৮)।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

نَذِيرٌ فِيهَا خَلَا إِلَّا أُمَّةٍ مِنْ وَإِنْ
আর এমন কোনো জাতি নেই যার কাছে

সতর্ককারী আসেনি' - (সূরা ফাতির , ২৪)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, رَسُولٌ أُمَّةٍ وَلِكُلِّ

প্রত্যেক জাতির জন্যই রাসুল রয়েছে' -

(সূরা ইউনুস , ৪৭)।

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ১৭ : আল-কোরানে উল্লিখিত নবি-রাসূলগণ (আ.)

আল-কোরানে উল্লিখিত নবি-রাসূলগণ

[নবি হলেন, যার প্রতি আল্লাহ তাআলা অহি পাঠিয়েছেন, অন্যদের কাছে অহিলক্ব জ্ঞান পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব অর্পিত হোক বা না হোক। যদি অন্যদের কাছে অহিলক্ব জ্ঞান পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব অর্পিত না হয়ে থাকে, তবে তাঁকে নবি বলা হয়। আর যদি এ দায়িত্বও অর্পিত হয় তবে তাকে নবি ও রাসূল উভয়টাই বলা হয়। অতএব প্রত্যেক রাসূলই নবি, কিন্তু প্রত্যেক নবি রাসূল নন।- দেখুন: আল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ: পৃ: ১৬৭; শারহ মুল্লা আলী কারী আলাল ফিকহিল আকবার: পৃ :৬০]

আল-কোরানের উল্লিখিত নবি-রাসূলগণের (আ.) সংখ্যা হলো পঁচিশ। তাঁরা হলেন- আদম, নূহ, ইদ্রীস, সালেহ, ইবরাহীম, হূদ, লূত, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, আইউব, শূয়াইব, মূসা, হারুন, আল য়াসা', যুল কিফল, দাউদ, যাকারিয়া, সুলায়মান, ইলয়াস, ইয়াহয়া, ঈসা ও মুহাম্মাদ (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম)। তাঁদের মধ্যে আঠারো জনের উল্লেখ নিম্নবর্তী আয়াতসমূহে পাওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে,

إِنْ نَشَاءُ مَنْ دَرَجَاتٍ نَرْفَعُ قَوْمِهِ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ أَتَيْنَاهَا حُجَّتَنَا وَتِلْكَ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا كُلًّا وَيَعْقُوبَ إِسْحَاقَ لَهُ وَوَهْبْنَا. عَلِيمٌ حَكِيمٌ رَبُّكَ وَهَارُونَ وَمُوسَىٰ وَيُوسُفَ وَأَيُّوبَ وَأَيُّوبَ وَسُلَيْمَانَ دَاوُودَ ذُرِّيَّتِهِ وَمِنْ قَبْلُ مِنْ كُلِّ وَالْيَاسَ وَعِيسَىٰ وَيَحْيَىٰ وَزَكَرِيَّا. الْمُحْسِنِينَ نَجْزِي وَكَذَلِكَ عَلَىٰ فَضْلِنَا وَكُلًّا وَلُوطًا وَيُونُسَ وَالْيَسَعَ وَإِسْمَاعِيلَ. الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْعَالَمِينَ .

আর এ হচ্ছে আমার দলীল, আমি তা ইবরাহীমকে তার কওমের উপর দান করেছি। আমি যাকে চাই, তাকে মর্যাদায় উঁচু করি। নিশ্চয় তোমার রব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। আর আমি তাকে দান করেছি ইসহাক ও ইয়াকুবকে। প্রত্যেককে আমি হিদায়েত দিয়েছি এবং নূহকে পূর্বে হিদায়েত দিয়েছি। আর তার সন্তানদের মধ্য থেকে দাউদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে। আর আমি এভাবেই সংকর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিই। আর যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলয়াসকে। প্রত্যেকেই নেককারদের অন্তর্ভুক্ত। আর ইসমাইল, আল ইয়াসা', ইউনুস ও লূতকে। প্রত্যেককে আমি সৃষ্টিকুলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি' - (সূরা আল আন-আম , ৮৬-৮৩)।

বাকিদের উল্লেখ অন্যান্য আয়াতে এসেছে। যেমন

হূদ (আ.)। ইরশাদ হয়েছে, هُوَذَا أَخَاهُمْ غَادٍ وَإِلَىٰ (প্রেরণ করেছিলাম) তাদের ভাই হূদকে' - (সূরা হূদ , ৫০)।

সালেহ (আ.) - ইরশাদ হয়েছে, صَالِحًا أَخَاهُمْ ثَمُودَ وَإِلَىٰ (প্রেরণ করেছি) তাদের ভাই সালিহকে' - (সূরা আল আরাফ , ৭৩)।

শুআইব (আ.) - ইরশাদ হয়েছে, شُعَيْبًا أَخَاهُمْ مَدْيَنَ وَإِلَىٰ (প্রেরণ করেছিলাম) তাদের ভাই শু'আইবকে' - (সূরা আল আরাফ , ৮৫)।

আদম (আ.) ও নূহ (আ.)। ইরশাদ হয়েছে, وَأَلَّ وَنُوحًا آدَمَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ إِنَّ (নিশ্চয় আল্লাহ আদম, নূহ ও ইব্রাহীমের পরিবারকে এবং ইমরানের পরিবারকে সৃষ্টিজগতের উপর মনোনীত করেছেন' - (আলে ইমরান , ৩৩)।

ইসমাইল (আ.), ইদ্রীস (আ.) এবং যুল কিফল (আ.) - ইরশাদ হয়েছে, وَإِسْمَاعِيلَ الصَّابِرِينَ مِنْ كُلِّ الْكُفْلِ وَذَا وَإِذْ رِيسَ (আর স্মরণ কর ইসমাইল, ইদ্রীস ও যুল কিফল এর কথা, তাদের প্রত্যেকেই ধৈর্যশীল ছিল' - (সূরা আল আশ্বিয়া , ৮৫)।

مَعَهُ وَالَّذِينَ اللَّهُ رَسُولٌ مُحَمَّدٌ إِيَّاهُ سَلَامٌ- ইরশাদ হয়েছে, 'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সঙ্গে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়' - (সূরা আল ফাতহ , ২৯)।

উল্লিখিত নবি-রাসূলগণের (আ.) প্রতি বিস্তারিতভাবে ঈমান আনতে হবে। অর্থাৎ উল্লিখিত নামসমূহের কোনো একটি নাম যদি কারও সামনে উপস্থাপন করা হয়, তবে তিনি যে নবি তা অস্বীকার করা যাবে না। আর যদি তিনি রাসূল হয়ে থাকেন, তবে তাঁর রিসালতকেও অস্বীকার করা যাবে না; কেননা যদি কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত নবিদের (আ.) কারও নবুওতকে অস্বীকার করে, অথবা রাসূল হলে তাঁর রিসালতকে অস্বীকার করে, তবে সে নিশ্চিতরূপে কাফের হয়ে যাবে। [তবে কোনো মূর্থ ব্যক্তিকে ততক্ষণ পর্যন্ত কাফের বলা হবে না, যতক্ষণ না তাকে শেখানো হবে। শেখার পর যদি সে অস্বীকার করে তবে সে কাফের হয়ে যাবে।- দেখুন: শারহুল বাইজুরি আলাল কাফিয়া: পৃ ৪৭]

নবি-রাসূলগণের (আ.) মধ্যে যার নাম আল-কোরানে আসেনি, তাদের প্রতি এজমালিভাবে ঈমান আনতে হবে। অর্থাৎ বলতে হবে, আল্লাহ তাআলা যত নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন, তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম; কেননা সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির ওপর ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করা যাবে না যতক্ষণ না আল কোরান এবং সহিহ হাদিস দ্বারা তা প্রমাণিত হয় যে তিনি নবি বা রাসূল ছিলেন।

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ১৮ : রাসূলগণের (আ.) মধ্যে যারা উলুল আজম

রাসূলগণের (আ.) মধ্যে যারা উলুল আযম তথা সুদূত সংকল্পের অধিকারী ছিলেন
নোট : আল আজম বলা হয়, কোনো কাজ ঐকান্তিকতা ও সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করে সম্পন্ন
করা। যারা উলুল আযম তাদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ধৈর্য ও তাকওয়া। এ দিকে ইঙ্গিত
করে আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

‘الْمُؤْمِرِ عَزْمٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ وَتَّقُوا تَصِيرُوا وَإِنْ
আর যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয় তা হবে দূত
সংকল্পের কাজ’ - (আলে ইমরান:১৮৬)।

অন্য এক আয়াতে এসেছে: ‘الرُّسُلِ مِنَ الْعَزْمِ أُولُو صَبْرٍ كَمَا فَاصِيرُ
অতএব তুমি ধৈর্যধারণ করো যেভাবে ধৈর্যধারণ করেছে সুদূত সংকল্পের অধিকারী রাসূলগণ’
- (সূরা আল আহকাফ:৩৫)।

আলেমদের অনেকেরই মতানুযায়ী, সুদূত সংকল্পের অধিকারী রাসূলগণের (আ.) সংখ্যা হলো
পাঁচজন। তাঁরা হলেন- মুহাম্মদ, ইবরাহীম, মূসা, নূহ ও ঈসা (তাঁদের সবার ওপর
সর্বোত্তম সালাত ও সালাম বর্ষিত হউক)।

আল-কোরানের একটি আয়াতে তাঁদের উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতটি হলো ,
‘سَيُؤْمَرُ وَإِبْرَاهِيمَ نُوحٍ وَمِنْ وَمِنْكَ مِيثَاقَهُمُ النَّبِيِّينَ مِنْ أَخَذْنَا وَإِذْ
‘غَلِيظًا مِيثَاقًا مِنْهُمْ وَأَخَذْنَا مَرْيَمَ ابْنِ وَعِيسَى
আর স্মরণ কর, যখন আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম নবীদের থেকে এবং তোমার
থেকে, নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মারয়াম পুত্র ঈসা থেকে। আর আমি তাদের কাছ থেকে
দূত অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম’ - (সূরা আল আহযাব , ৭)।

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ১৯ : রিসালতের বিষয়বস্তু

priyo.Islam

০১ মার্চ ২০১৪, সময় - ০৪:১৭

রিসালতের বিষয়বস্তু

রাসুলগণের (আ.) প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমাদের এ ব্যাপারেও বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁদের পাঠিয়েছেন তাবশীর ও ইনযারের উদ্দেশে। তাবশীর অর্থ সুসংবাদ প্রদান। আর ইনযার অর্থ হুঁশিয়ার করা। অর্থাৎ যারা আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসুলগণের (আ.) প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করবে, তাঁদের জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, ছাওয়াব ও জান্নাত- তাঁরা এ বিষয়ে সুসংবাদ দিয়েছেন। আর যারা অস্বীকার করবে এবং অবাধ্য হবে আল্লাহর রাগরোষ ও আজাব সম্পর্কে তাদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

خَوْفٌ فَلَا أَصْلَحَ أَمَّنَ فَمَنْ وَمُنْذِرِينَ مُبَشِّرِينَ إِلَّا الْمُرْسَلِينَ نُرْسِلُ وَمَا
بِمَا الْعَذَابُ يَمَسُّهُمْ أَتَيْنَايَا كَذَّبُوا وَالَّذِينَ يَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ
يَفْسُقُونَ كَانُوا

‘আমি রাসুলদেরকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করি। অতএব যারা ঈমান এনেছে ও শুধরে নিয়েছে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না। আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তাদেরকে স্পর্শ করবে আজাব, এ কারণে যে, তারা নাফরমানী করত’ - (সূরা আল আন-আম , ৪৮-৪৯)।

আমাদের আরও বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল রাসুলকেই (আ.) তাঁর ইবাদত প্রচার, দ্বীন দাঁড় করানো, তাওহিদে উলুহিয়াত ও রুবুবিয়ত, তাওহিদে আসমা ওয়াস্মিফাত ইত্যাদি যথার্থরূপে চর্চা ও প্রচারের উদ্দেশে প্রেরণ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَصَيْنَا وَمَا إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا وَالَّذِي نُوحَا بِهِ وَصَّى مَا الدِّينَ مِنْ لَكُمْ شَرَعَ
فِيهِ تَتَفَرَّقُوا وَلَا الدِّينَ أَقِيمُوا أَنْ وَعِيسَى وَمُوسَى إِبْرَاهِيمَ بِهِ
তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি নূহকে নির্দেশ
দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে
নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হলো তোমরা দ্বীন কায়ম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না’ - (সূরা
আশ্-শূরা , ১৩)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে , اللَّهُ أَعْبُدُوا أَنْ رَسُولًا أُمَّةٍ كُلِّ فِي بَعَثْنَا قَدْ وَكَّ
الطَّاغُوتِ وَاجْتَنِبُوا

আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসুল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং পরিহার কর তাগুতকে’ - (সূরা আন-নাহল , ৪০)।

୦୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୮, ସମୟ - ୧୨:୫୪

রাসূলগণের (আ.) ব্যাপারে আবশ্যিক বিশ্বাস

রাসূলগণের (আ.) ব্যাপারে যেসব বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, তার মধ্যে একটি হলো সকল নবি-রাসূলের (আ.) ওপর সমানভাবে বিশ্বাস করা, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য না করা। অতএব যদি কেউ পার্থক্য করে এবং তাঁদের মধ্যে কারও প্রতি বিশ্বাস করে আর কাউকে অস্বীকার করে তবে সে কাকের বলে গণ্য হবে। ইরশাদ হয়েছে,

وَرُسُلِهِ ٱللَّهُ بَيْنَ يَفِرَّقُوا أَن ذُون وَيُرِي وَرُسُلِهِ بِٱللَّهُ يَكْفُرُونَ ٱلَّذِينَ إِن سَبِيلًا ذَلِك بَيْنَ يَتَّخِذُوا أَن وَيُرِيدُونَ بِيَعُض وَتَكْفُرُ بِيَعُضُ تُؤْمِنُ وَيَقُولُونَ ١ مُّهِينًا عَذَابًا لِّلْكَافِرِينَ وَأَعْتَدْنَا حَقًّا ٱلْكَافِرُونَ هُمْ أَوْلَئِكَ .

নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলদের সঙ্গে কুফরি করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি আর কতকের সঙ্গে কুফরি করি' এবং তারা এর মাঝামাঝি একটি পথ গ্রহণ করতে চায়, তারাই প্রকৃত কাফির এবং আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি অপমানকর আজাব' - (সূরা আন-নিসা, ১৫০-১৫১)।

ইমাম তাবারি (র.) 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি আর কতকের সঙ্গে কুফরি করি' এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'অর্থাৎ তারা বলে যে আমরা অমুককে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করি। আর অমুককে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করি না, যেমন ইহুদিরা ঈসা এবং মুহাম্মাদ (আলাইহিসালাম) এর ব্যাপারে বলেছে। তারা মূসা (আ.) এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবিদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এর আরেকটি উদাহরণ নাসারা সম্প্রদায়, তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করেছে আর ঈসা (আ.) ও তাঁর পূর্ববর্তী নবিদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে।' [তাকসিরে তাবারী: ৯/৩৫২]

রাসুলগণের (আ.) ব্যাপারে আমাদের এও বিশ্বাস করতে হবে যে, প্রত্যেক রাসুল তাঁর ওপর অর্পিত আমানত যথার্থরূপে পৌঁছে দিয়েছেন। রিসালাতকে পূর্ণাঙ্গরূপে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং যারপরনাই স্পষ্টাকারে তা বয়ান করে দিয়েছেন। রাসুলগণের (আ.) আনুগত্য করা এবং তাঁদের বিরুদ্ধে না যাওয়াও আমাদের ওপর ফরজ; কেননা রাসুলগণের (আ.) আনুগত্যের অর্থ প্রকারান্তরে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য। ইরশাদ হয়েছে ,

‘اللَّهُ أَطَاعَ فَقَدْ الرُّسُولَ يُطِيعُ مَنْ
করল’ - (সূরা আলে ইমরান , ৮০)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ,

‘اللَّهُ بِإِذْنٍ لِّيُطَاعَ إِلَّا رَسُولٌ مِّنْ أَرْسَلْنَا وَمَا
আর আমি যে কোনো রাসূল প্রেরণ করেছি তা কেবল এজন্য, যেন আল্লাহর অনুমতিক্রমে
তাদের আনুগত্য করা হয়’ - (সূরা আন-নিসা , ৪৬)।

আমাদের এটাও বিশ্বাস করতে হবে যে, ইল্লা ও আমলের বিচারে রাসূলগণ সমগ্র মনুষ্যকুলের মধ্যে সর্বশীর্ষে এবং পূর্ণাঙ্গতম। তাঁরা ছিলেন সর্বোচ্চ সত্যবাদী এবং পূর্ণাঙ্গতম চরিত্রের অধিকারী। আল্লাহ তাআলা তাঁদের বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, যা অন্যকোনো মানুষ স্পর্শ করতে পারে না। আল্লাহ তাঁদের মিথ্যা, খিয়ানত, তাবলীগে দ্বীনের ক্ষেত্রে কোনো কিছু গোপন করা বা দায়েই অবহেলা করা এবং ছোট-বড় সকল গুনাহ থেকে

সুরক্ষিত-মাসুম ও পবিত্র রেখেছেন। [দেখুন মুল্লা আলী ক্বারী র. এর ব্যাখ্যাসংবলিত আল
ফেকহুল আকবার: পৃ ৫৬]

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ২১ : রাসূলগণ মাসুম ছিলেন, ছিলেন মানুষ ও পুরুষ

রাসূলগণ গুনাহ থেকে মাসুম

আল্লাহর কাছে তাদের যে সুউচ্চ মাকাম, তার বিবেচনায়, যদি তারা কখনো কোথাও ইজতেহাদি ভুলবশত সামান্য হোঁচট খেতেন, তাহলে আল্লাহ তাদের অবস্থা শুধরিয়ে দিতেন এবং তাদের তাওবার তাওফিক দান করতেন, যেমনটি ঘটেছিল, ভুলে-যাওয়ার কারণে আদম আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে।

সকল রাসূলই মানুষ ও পুরুষ ছিলেন

রাসূলগণের ব্যাপারে আমাদের এও বিশ্বাস করতে হবে যে, সকল রাসূলই ছিলেন পুরুষ-মানুষ। তাদের কেউই ফেরেশতা ছিলেন না, এবং তাদের কেউ নারীও ছিলেন না। ইরশাদ হয়েছে,

إِلَيْهِمْ نُوحِي رَجَالًا إِلَّا قَبْلِكَ مِنْ أَرْسَلْنَا وَمَا
পুরুষই পাঠিয়েছিলাম, যাদের প্রতি আমি ওহী পাঠাতাম' - (সূরা আল আশ্বিয়া , ৭)।

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ২২ : সকল রাসুলই ছিলেন মানব-প্রকৃতিবিশিষ্ট

সকল রাসুলই ছিলেন মানব-প্রকৃতিবিশিষ্ট

রাসুলগণের ব্যাপারে আমরা এও বিশ্বাস করব যে, আল্লাহ তাআলা তাঁদের মানব-প্রকৃতি ছাড়া অন্যকোনো প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্টি করেননি। তাঁরা ছিলেন মানব-পুরুষ, যারা খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করতেন, বাজারে চলাফেরা করতেন, ঘুমাতে, উঠতে-বসতে, তাদের ছিল স্ত্রী ও সন্তান। তাঁরা কষ্ট-যাতনার মুখোমুখি হতেন, জালেমদের হাত তাঁদের প্রতি প্রলম্বিত হত। তাঁরা নির্যাতনের শিকার হতেন। মৃত্যুবরণ করতেন। এমনকি অন্যায়ভাবে তাঁরা নিহতও হতেন। তাঁরা দুঃখ-কষ্ট অনুভব করতেন। অসুস্থ হতেন। অর্থাৎ একজন মানুষ যেসব বিষয়ে আক্রান্ত হয় অনুরূপ তাঁরাও হতেন। তবে এতে, সমগ্র মানুষের তুলনায় তাদের যে-সুউচ্চ মর্যাদা, তা বিন্দুমাত্রও হ্রাস পেত না। আল-কোরানের বেশ কিছু আয়াতে এর স্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে ,

قُلْ أَوْ مَاتَ أَفَانُ الرُّسُلِ قَبْلِهِ مِنْ خَلْتِ قَدْ رَسُولٌ إِلَّا مُحَمَّدٌ وَمَا شَيْئًا اللَّهُ يَضُرُّ فَلَنْ عَقَبِيهِ عَلَى يَنْقَلِبُ وَمَنْ أَغَابَكُمْ عَلَى انْقَلَابِ الشَّاكِرِينَ اللَّهُ وَسَيَجْزِي

আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসুল। তার পূর্বে নিশ্চয় অনেক রাসুল বিগত হয়েছে। যদি সে মারা যায় অথবা তাকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে ? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনো অল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতগুণদের প্রতিদান দেবেন’ - (সূরা আলে ইমরান , ১৪৪)।

অন্যত্র এসেছে, لَيَأْكُلُونَ إِنْهُمْ إِلَّا الْمُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِكَ أَرْسَلْنَا وَمَا الْأَسْوَاقُ فِي وَيَمْشُونَ الطَّعَامُ

আর তোমার পূর্বে যত নবি আমি পাঠিয়েছি, তারা সবাই আহার করত এবং হাট-বাজারে চলাফেরা করত’ - (সূরা আল ফুরকান , ২০)।

لَهُمْ وَجَعَلْنَا قَبْلِكَ مِنْ رُسُلًا أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ وَذُرِّيَّةً أَزْوَاجًا

আর অবশ্যই তোমার পূর্বে আমি রাসুলদের প্রেরণ করেছি এবং তাদের দিয়েছি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি’ - (সূরা আর্-রাদ , ৩৮)।

الرُّسُلِ قَبْلِهِ مِنْ خَلْتِ قَدْ رَسُولٌ إِلَّا مَرْيَمَ ابْنُ مَرْيَمَ الْمَرْيَمُ يَأْكُلَانِ كَانَا صَدِيقَةً وَأُمُّهُ

অন্যত্র এসেছে , ‘মার্যাম পুত্র মসীহ কেবল একজন রাসুল। তার পূর্বে অনেক রাসুল বিগত হয়েছে এবং তার মা ছিল অতি সত্যবাদী। তারা উভয়ে খাবার খেত’ - (সূরা আল মায়েদা , ৭৫)।

হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তবে আমি রোজা রাখি ও রোজা ভঙ্গ করি, নামাজ পড়ি ও নিদ্রায় যাই এবং আমি নারীদের বিবাহও করি।’

[বুখারি , কিতাবুন নিকাহ]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ হতেন, কষ্ট অনুভব করতেন, শীত ও গরম তাঁকে স্পর্শ করত। ক্ষুধা, পিপাসা, রাগ, বিরক্তি, ক্লান্তি ইত্যাদি তাঁকে স্পর্শ করত। তবে এসবের অর্থ এটা ছিল না যে, তাঁর মর্যাদা কোনো অংশে কমে গেছে। [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত অধ্যয়ন থেকে আমরা এ বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে জানতে পারি। উদাহরণত দেখুন ইমাম তিরমিযির ‘আশ-শামাইলুন নাবুবিয়া’ এবং ইবনুল জাওযির ‘আল ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুস্তাফা’।]

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ২৩ : রাসূলগণ উলুহিয়াতের কোনো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন না

priyo.Islam

০১ মার্চ ২০১৪, সময় - ১৩:০১

রাসূলগণ উলুহিয়াতের কোনো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন না

রাসূলগণের ব্যাপারে আমরা এও বিশ্বাস করব যে, তাঁরা উলুহিয়াতের কোনো বৈশিষ্ট্যেরই মালিক ছিলেন না। অতএব তাঁরা মহাজাগতিক কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখতেন না। তাঁরা অতিপ্রাকৃতিক উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখতেন না। তাঁরা আল্লাহর ইচ্ছাকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাও রাখতেন না। তাঁরা গায়েব জানতেন না। তবে যদি আল্লাহ তাঁদের কোনো কিছু জানান, তার কথা আলাদা।

ইরশাদ হয়েছে, كُنْتُ وَلِيُّ اللَّهِ شَاءَ مَا إِلَّا ضَرًّا وَلَا نَفْعًا لِنَفْسِي أَمْلِكُ لَا قُلْ نَذِيرٌ إِلَّا أَنَا إِنَّ السُّوءَ مُسْنِي وَمَا الْخَيْرُ مِن لَّاسْتَكْثَرْتُ الْغَيْبِ أَعْلَمُ يُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ وَبَشِيرٌ

বল, 'আমি আমার নিজের কোনো উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান। আর আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে অধিক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোন ক্ষতি স্পর্শ করত না। আমি তো একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা এমন কওমের জন্য, যারা বিশ্বাস করে' - (আল আরাফ , ১৮৮)।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন, إِلَّا . أَحَدًا غَيْبِهِ عَلَى يُظْهِرُ فَلَا الْغَيْبِ عَالِمٌ رَّصَدًا خَلْفَهُ وَمِنْ يَدَيْهِ بَيْنَ مَنْ يَسْأَلُكَ فَإِنَّهُ رَسُولٌ مِنْ ارْتَضَى مَنْ تِلْكَ اذْشَهِرُ الْجَانِي، آوَر تِلْكَ اذْشَهِرُ الْجَانِي كَارُو كَاخْهُ طْرَكَش كَرَرَن نَا। تَوَ تَاঁর মনোনীত রাসূল ছাড়া। আর তিনি তখন তার সামনে ও তার পিছনে প্রহরী নিযুক্ত করবেন' - (সূরা আল-জিন , ২৬-২৭)।

বস্তুত আল্লাহ তাআলা তাঁদের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, এমন আখলাক ও চরিত্রের অধিকারী করেছেন, যার ফলে তাঁরা ওহী ধারণ করা ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা অর্জন করেছেন এবং মানুষের জন্য আদর্শ হতে পেরেছেন দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে যাদের অনুসরণ করা হবে। অতএব আমাদের এ বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে, রাসূলগণ দ্বীনের ক্ষেত্রে, আল্লাহর আনুগত্য ও রিসালত পৌঁছানোর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সকল ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে মাসুম তথা সুরক্ষিত ছিলেন।

ইরশাদ হয়েছে, فَإِنَّ وَالنُّبُوَّةَ وَالْحُكْمَ الْكِتَابَ آتَيْنَاهُمْ الَّذِينَ أُولَئِكَ . يَكْفُرِينَ بِهَا لَيْسُوا قَوْمًا بِهَا وَكَلْنَا فَقَدْ هَؤُلَاءِ بِهَا يَكْفُرُونَ أَقْنَدِهِ فَيَهْدَاهُمْ اللَّهُ هَذَى الَّذِينَ

এরাই তারা, যাদেরকে আমি দান করেছি কিতাব, হুকুম ও নবুওত। অতএব যদি তারা এর সঙ্গে কুফরি করে, তবে আমি এগুলোর তস্বাবধায়ক এমন কওমকে করেছি, যারা এর ব্যাপারে কাফির নয়। এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ হিদায়েত করেছেন। অতএব তাদের হিদায়েত তুমি অনুসরণ কর' - (সূরা আল আনআম , ৮৯-৯০)।

অতএব রাসূলগণকে আল্লাহ তাআলা আমানতদারী, সত্যবাদিতা, বিচার-বুদ্ধি, তাবলীগে দ্বীন ও অন্যান্য গুণ-বৈশিষ্ট্য পূর্ণাঙ্গভাবে দিয়েছেন, যা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন হবে। রাসূলগণের সত্যবাদিতার পক্ষে আল্লাহ তাআলা নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন। উদাহরণত তিনি ইব্রাহীম (আ.) সম্পর্কে বলেছেন,

‘আর স্মরণ কর এই কিতাবে ইব্রাহীমকে। নিশ্চয় সে ছিল পরম সত্যবাদী, নবি’ - (সূরা মারয়াম , ৪১)।

অন্যান্য আয়াতেও আল্লাহ তাআলা রাসূলগণের সত্যবাদিতা ও হিদায়েতের ওপর প্রতিষ্ঠিত
থাকার কথা ব্যক্ত করেছেন।

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ২৪ : নবি-রাসূলগণের মর্যাদাগত পার্থক্য ও মুজিয়া দ্বারা সাহায্যকৃত হওয়া

priyo.Islam

০১ মার্চ ২০১৪, সময় - ১৩:০৬

নবি-রাসূলগণের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য

উল্লিখিত গুণবৈশিষ্ট্যে রাসূল হিসেবে আল্লাহ তাআলা যাদের মনোনীত করেছেন তাঁরা সকলেই সমান। রাসূলগণের গুণবৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এই সাম্যের পাশাপাশি আমরা আরেকটি ব্যাপারে বিশ্বাস করি। আর তা হলো- আল্লাহ তাআলা রাসূলগণের কতককে কতকের ওপর অধিক মর্যাদা দিয়েছেন।

ইরশাদ হয়েছে, وَرَفَعُ اللَّهُ لِمَنْ مِّنْهُمْ بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ فَضَّلْنَا الرُّسُلَ تِلْكَ الْقُدُسِ بِزُوحٍ وَأَيُّدِنَاهُ الْبَيِّنَاتِ مَرْيَمَ ابْنَ عِيسَى وَآتَيْنَا دَرَجَاتٍ بَعْضُهُمْ

ঐ রাসূলগণ, আমি তাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, তাদের মধ্যে কারো সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং কারো-কারো মর্যাদা উঁচু করেছেন। আর আমি ঈসা ইবনে মারয়ামকে দিয়েছি সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এবং আমি তাকে শক্তিশালী করেছি রুহুল কুদুস এর মাধ্যমে’ - (সূরা আল বাকারা , ২৫৩)।

আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে, নবি-রাসূলগণের মধ্যে, বরং তাবৎ সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সালাফদের কেউ-কেউ ‘ وَرَفَعُ اللَّهُ لِمَنْ مِّنْهُمْ بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ فَضَّلْنَا الرُّسُلَ تِلْكَ الْقُدُسِ بِزُوحٍ وَأَيُّدِنَاهُ الْبَيِّنَاتِ مَرْيَمَ ابْنَ عِيسَى وَآتَيْنَا دَرَجَاتٍ بَعْضُهُمْ - ‘এবং কারো কারো মর্যাদা উঁচু করেছেন’ এ আয়াতাত্মক ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে তিনি হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এ ব্যাপারে বেশ কয়টি সহিহ হাদিসও রয়েছে। যেমন, আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আমি কিয়ামতের ময়দানে আদম সন্তানের নেতা, কবর বিদীর্ণ করে যারা উত্থিত হবে তাদের মধ্যে আমি সর্বপ্রথম, আমিই সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং আমিই প্রথম যাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে।’

[মুসলিম আস-সহিহ (নববীর ব্যাখ্যাসহ) : ১৫/৩৭-৩৮]

অন্য এক হাদিসে এসেছে, ‘নিশ্চয় আল্লাহ ইসমাইল আ. এর সন্তানদের মধ্য থেকে কিনানাকে মনোনীত করেছেন। আর কিনানা থেকে মনোনীত করেছেন কুরাইশকে। আর কুরাইশদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন বনু হাশেমকে। আর বনু হাশেম থেকে তিনি মনোনীত করেছেন আমাকে।’ [মুসলিম ও তিরমিযি। ইমাম তিরমিযি হাদিসটি হাসান-সহিহ বলেছেন। দেখুন মুসলিম [নববীর ব্যাখ্যাসহ: ১৫/৩৭-৩৮; তিরমিযি (আল আরাবী আল মালেকী’র ব্যাখ্যাসহ) ১৩/ ১০২-১-৩] এ হাদিসগুলি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে যে, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। [বুখারি ও মুসলিমে উল্লিখিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, - موسى على تفضلوني لا - ‘আমাকে মূসার ওপর প্রাধান্য দেয়া না’। এ হাদীসের অর্থ হলো গর্ব-বড়াইবশত, অথবা যার ওপর প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে তাকে খাঁটো করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রাধান্য দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে; কেননা উল্লিখিত হাদিস ব্যক্ত করার একটা কারণ রয়েছে, যা এ অর্থকে নির্দেশ করে। কারণটি হলো- জনৈক ইহুদি জনৈক মুসলিম ব্যক্তির সামনে বলল: না, ওই সত্তার কসম যিনি মূসাকে সমগ্র মানুষের ওপর মনোনীত করেছেন।’ এ কথা শুনে মুসলিম ব্যক্তি তাকে চপেটাঘাত করল এবং বলল, ‘তুমি এটা বলছ, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখনো আমাদের মাঝেই আছেন?। এরপর ইহুদি লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে বিচার নিয়ে গেল। ঘটনা শুনে তিনি উত্ত

হাদিসটি বর্ণনা করলেন। ʾ لا ٱللّٰه ٱنبياء بين تفضلوا - আল্লাহর নবিদের মধ্যে পস্পরকে পরস্পরের ওপর প্রাধান্য দিয়ে না।' এ হাদিসটিও উক্ত অর্থে নিতে হবে। - দেখুন মুসলিম, আস-সহিহ (নববীর ব্যাখ্যাসহ) : ১৫/৩৭, ১২০; শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়্যাহ পৃ.১৭১; মুল্লা আলী কারী: শারহুল ফিকহিল আকবার পৃ.৫৯-৬১]

রাসূলগণ মুজিয়া দ্বারা সাহায্যকৃত

রাসূলগণের ব্যাপারে আমরা এও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রকাশ্য মুজিয়া দিয়ে সাহায্য করেছেন, যা তাঁদের সত্যবাদী হওয়ার পক্ষে প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করেছে। মুজিয়া হলো নবি-রাসূলগণের হাত দিয়ে আল্লাহ তাআলা যেসব অস্বাভাবিক ঘটনার প্রকাশ ঘটিয়েছে, যার মাধ্যমে তাঁরা মানুষদের চ্যালেঞ্জ করেছেন। [দেখুন ইমামুল হারামাইন, লুমাউল আদিল্লা পৃ. ১১০] অতএব আল কোরান ও সহিহ হাদীসে যেসব মুজিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা বাধ্যতামূলক। মূল : ড. মুহাম্মাদ নাঈম ইয়াসিন বাংলা অনুবাদ : ড. মাওলানা শামসুল হক সিদ্দিক

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ২৫ : হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রতি ঈমান

priyo.Islam

০২ মার্চ ২০১৪, সময় - ০২:৪৩

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ঈমান

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে আমাদের যে বিশ্বাস পোষণ করতে হবে, তা হলো এই যে, তিনি হলেন আল্লাহ তাআলার নবি ও রাসূল। তিনি আল্লাহর বান্দা ও মনোনীত পুরুষ। তিনি কখনো মূর্তি পূজা করেননি। এক পলকের জন্যও কখনো শিরক করেননি। তিনি কখনো পাপ-গুনাহ করেননি। তিনি [মুহাম্মদ সা.] সর্বশেষ নবি আমরা এ ব্যাপারেও বিশ্বাসও করব যে তিনি ছিলেন সর্বশেষ নবি; কেননা তাঁর শেষ নবি হওয়ার বিষয়টি কোরান-সুন্নাহ দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। আল-কোরানে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَخَاتَمَ اللَّهُ رَسُولَ وَلَكِنْ

النَّبِيِّينَ

তবে আল্লাহর রাসূল ও

সর্বশেষ নবি' (সূরা আল আহযাব , ৪০)।

হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার উদাহরণ ও অন্যান্য নবিদের উদাহরণ ওই ব্যক্তির মতো যে একটি বিল্ডিং নির্মাণ করল। সে এটিকে সুন্দর করল ও শোভিত করল। তবে কোনো এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিল। অতঃপর মানুষ ঘুরে-ঘুরে বিল্ডিংটি দেখতে এবং বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগল। আর বলতে লাগল, ইটটি যদি এখানে বসিয়ে দেওয়া হত! তিনি বললেন, 'আমি হলাম সেই ইট এবং সর্বশেষ নবি।' [বুখারি ও মুসলিম] তিনি অন্য এক হাদিসে বলেছেন, 'আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি বিলোপসাধনকারী, যার দ্বারা কুফরিকে বিলুপ্ত করা হবে, আমি একত্রকারী, আমার নবুওত-যুগেই [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু সর্বশেষ নবি, তাই তাঁর নবুওতযুগ কিয়ামত অবধি প্রলম্বিত।] মানুষদের হাশরের ময়দানের একত্র করা হবে। আমি আকেব- আকেব হলো যার পর অন্যকোনো নবি নেই।' [বুখারি ও মুসলিম]

অতএব আমরা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আর কোনো নবুওত নেই, আর কোনো নবি নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী আসবে। এদের প্রত্যেকেই ধারণা করবে যে সে নবি। অথচ আমিই সর্বশেষ নবি। আমার পরে কোনো নবি নেই। [মুসলিম] তিনি [মুহাম্মদ সা.] মুত্তাকীদের ইমাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে আমাদের এ বিশ্বাসও রাখতে হবে যে, তিনি মুত্তাকীদের ইমাম। যার অনুকরণে-অনুসরণে সকল কল্যাণমূলক কাজ সম্পন্ন করা অত্যাবশ্যক। ইরশাদ হয়েছে,

تُحِبُّونَ كُنْتُمْ إِنْ قُلْ رَحِيمٌ غَفُورٌ وَاللَّهُ ذُؤَبَكُم لَكُمْ وَيَغْفِرُ اللَّهُ يُحِبُّكُمْ فَاتَّبِعُونِي اللَّهُ

বল, 'যদি তোমরা

আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' - (সূরা আলে ইমরান , ৩১)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

لَا وَرَبِّكَ فَلَا حَرْجًا أَنْفُسِهِمْ فِي يَجِدُوا لَا تُمْ بَيْنَهُمْ شَجَرَ فِيمَا يُحْكَمُوكَ حَتَّى يُؤْمِنُوا تَسْلِيمًا وَيُسَلِّمُوا قَضَيْتَ مِمَّا

অতএব তোমার রবের

কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে-ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়' - (সূরা আন-নিসা , ৬৫)।

তিনি [মুহাম্মদ সা.] আল্লাহর বন্ধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার বন্ধু এ বিষয়ে ঈমান আনাও আমাদের ওপর ফরজ। আল্লাহর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব সর্বশীর্ষ পর্যায়ের বন্ধুত্ব, যাকে আরবিতে 'আল খুল্লাহ' বলা হয়। হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি যদি কাউকে পরম বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকে গ্রহণ করতাম। কিন্তু সে আমার ভাই ও সাথী। আর আল্লাহ তাআলা তোমাদের সাথীকে পরম বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। [মুসলিম] তিনি [মুহাম্মদ সা.] সমগ্র জিন ও মানব জাতির প্রতি প্রেরিত আমাদের এ বিশ্বাসও রাখতে হবে যে, তিনি সমগ্র জিন ও মানব জাতির প্রতি প্রেরিত। আল্লাহ তাআলা আল-কোরানে জিনদের কথা উদ্ধৃত করে বলেছেন,

أَجِيبُوا قَوْمَنَا يَا
أَلَيْمٍ عَذَابٍ مِنْ وَيُجِرْكُمْ مَذْنُوبِكُمْ مِنْ لَكُمْ يَغْفِرُ بِهِ وَأَمِنُوا اللَّهَ ذَا عِي
হে আমাদের কওম,

আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি ঈমান আন, আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আজাব থেকে রক্ষা করবেন' - (সূরা আল আহকাফ , ৩১)।

আর সমগ্র মানব জাতির প্রতি প্রেরিত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا
وَنَذِيرًا بَشِيرًا لِلنَّاسِ كَافَّةً

আর আমি তো কেবল তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি' - (সূরা সাবা , ২৮)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

أَيُّهَا يَا قُل
جَمِيعًا إِلَيْكُمْ اللَّهُ رَسُولٌ إِنِّي النَّاسُ
বল, 'হে মানুষ,

আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল' - (সূরা আল আরাফ , ১৫৮)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

الَّذِي تَبَارَكَ
يُرَائِدُ لِلْعَالَمِينَ لِيَكُونَ عَبْدِهِ عَلَى الْفُرْقَانِ نَزَلَ

তিনি বরকতময় যিনি তাঁর বান্দার ওপর ফুরকান নাজিল করেছেন যেন সে জগতবাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারে' - (সূরা আল ফুরকান , ১)।

হাদিসে এসেছে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমাকে নবিদের ওপর ছয় বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে- আমাকে জাওয়ামিউল কালিম [জাওয়ামিউল কালিম হলো ব্যাপক অর্থকে সংক্ষিপ্ত ভাষায় স্পষ্টাকারে প্রকাশ করা। (অনুবাদক)] দেয়া হয়েছে। ভীতি [ভীতি বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে কাছে যেতে ভয় করা। অর্থাৎ মানুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যেতে ভয় পেত, কিন্তু যখন কাছে যেত তখন তাকে ভালোবেসে ফেলত। (অনুবাদক)] দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। আমার জন্য গনীমতের সম্পদ হালাল করা হয়েছে। জমিন আমার জন্য পবিত্র ও হালাল করা হয়েছে।

আমাকে সমগ্র সৃষ্টির ওপর রাসূল করে প্রেরণ করা হয়েছে। আমার দ্বারা নবুওত সমাপ্ত করা হয়েছে।’ [বুখারিতে ও মুসলিম] আকীদা আত-তাহাবিয়াহর ব্যাখ্যাকার বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র মানুষের প্রতি প্রেরিত’ এ বিষয়টি দ্বীনের প্রকাশ্যতম বিষয়ের একটি।’ [শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ পৃ. ১৭৮]

তঁাকে [মুহাম্মদ সা.] সবার উর্ধ্ব ভালোবাসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আমাদের আরেকটি আবশ্যিক করণীয় হলো- তঁাকে নিজ পিতা পুত্র এমনকি নিজ নফস থেকেও অধিক মহববত করা। [আল ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুস্তাফা পৃ. ১/৩৮২]

আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে, তার পিতা, তার সন্তান ও সমস্ত মানুষ থেকে প্রিয় হব।’ [বুখারি ও মুসলিম] আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমরা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। আর তিনি উমর (রাযি.) এর হাত-ধরা অবস্থায় ছিলেন। উমর (রাযি.) তঁাকে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমার কাছে সকল জিনিসের চেয়ে অধিক মহববতের পাত্র। তবে আমার নিজ নফস ব্যতীত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘না, যার হাতে আমার আত্মা তার কসম, যতক্ষণ না আমি তোমার কাছে তোমার নিজের চেয়েও মহববতের পাত্র হব।’ উমর (রাযি.) বললেন, ‘তাহলে, আল্লাহ কসম খেয়ে বলছি, আপনি আমার কাছে এখন আমার নিজ নফসের চেয়েও অধিক প্রিয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘এখন হয়েছে হে উমর।’ [বুখারি]

মুজিয়া দ্বারা আল্লাহ তাআলা তঁাকে [মুহাম্মদ সা.] সাহায্য করেছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আমাদের এটাও বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা তঁাকে মুজিয়া দ্বারা সাহায্য করেছেন, যা নিশ্চিতভাবে তাঁর সত্যতাকে প্রমাণ করে, তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার সত্যতাকে প্রমাণ করে। আর মহাগ্রন্থ আল কোরান হলো তাঁর উদ্ভাসিত মুজিয়া, যার মাধ্যমে তিনি সমগ্র পৃথিবীবাসীকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। তারা কুরআনের মতো গ্রন্থ প্রণয়নে, অথবা এর অংশবিশেষের মতো কোনো কিছু প্রণয়নে ব্যর্থ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مِثْلِهِ مِنْ يَسُورَةٍ فَأُثُوا عِبْدَنَا عَلَى نَزْلِنَا مِمَّا رَيْبُ فِي نَفْسِكُمْ وَإِنْ وَلَنْ تَفْعَلُوا لَمْ فَبَانَ . صَادِقِينَ كُنْتُمْ إِنْ لَلَّهِ دُونَ مِنْ شَهْدَاءَكُمْ وَادْعُوا أَعِدَّتْهُ وَالْحِجَارَ النَّاسُ وَقُودُهَا النَّارُ فَاتَّقُوا تَفْعَلُوا لِلْكَافِرِينَ

‘আর আমি আমার বান্দার উপর যা নাজিল করেছি, যদি তোমাদের সে সম্পর্কে সন্দেহ থাক, তবে তোমরা তার মতো একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীসমূহকে ডাক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও’ - (সূরা আল বাকারা , ২৩-২৪)।

অতএব আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলা তঁাকে অনুভূতিগ্রাহ্য মুজিয়া দ্বারা সাহায্য করেছেন, যা বিভিন্ন সহিহ হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়া। পাথর তঁাকে ছালাম দেয়া। তাঁর জন্যে খেজুর-কাঠের আকুলতা। তাঁর আগুলের মাঝখান থেকে পানি বের হওয়া। সামান্য খাবার দিয়ে অনেক মানুষকে পরিতৃপ্ত করা। তাঁর সামনে ভাজা বকরীর সাক্ষ্য প্রদান। নবুওতের পূর্বে মেঘ তঁাকে ছায়া দেওয়া। আবু জেহেল ও তার পাথরের মাঝে যা ঘটেছিল যখন সে পাথর দিয়ে রাসূলের মাথায় আঘাত করতে চেয়েছিল, সে ঘটনা। উম্মে মা‘বাদের বকরীর যা ঘটেছিল যখন তিনি তাঁর মূবারক হাত ওই বকরীর স্তনে স্পর্শ করান, সে ঘটনা। মুশরিকদের চেহারা মাটি নিষ্ক্ষেপ করা এবং তাতে মুশরিকরা আক্রান্ত হওয়া। এমন-কিছু অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেয়া, যা ঠিক সেভাবেই

ঘটেছে যেভাবে তিনি সংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তাঁর দোয়া কবুল করা। নিহত হওয়া থেকে তাঁকে রক্ষা করা। আরও এ জাতীয় মুজিয়া যার ব্যাপারে বড় বড় গ্রন্থ রচিত হয়েছে। [উল্লিখিত মুজিয়া ও এজাতীয় আরও অন্যান্য মুজিয়া, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওতের প্রমাণ বহন করে- অনেক সীরাতে ও হাদিস গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইমাম বুখারি র. এ ব্যাপারে আলাদা একটি অধ্যায় রচনা করেছেন ‘নবুওতের আলামত অধ্যায়’ শিরোনামে। অনুরূপভাবে মুসলিম ইবনুল হাসান আল কুশাইরী র. একটি অধ্যায় কায়ম করেছেন ‘রাসূলের মুজিয়া’ শিরোনামে। আলেমদের কেউ কেউ এ বিষয়ে আলাদা গ্রন্থও প্রণয়ন করেছেন। যেমন ‘হিলয়াতুল আওলিয়া’র লেখক আবু নুআইম আল ইসপাহানীর ‘দালাইলুন নবুওয়াহ’ ; আবুল হাসান আল মাওয়ারদীর ‘ইলামুন নবুওয়াহ’ ; বায়হাকীর ‘দালাইলুন নবুওয়াহ’ ; ইবনুল জাওয়ীর ‘আল ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুস্তাফা’ ইত্যাদি।] অনুভূতিগ্রাহ্য মুজিয়া বিষয়ে বহু হাদিস এসেছে। এসবের কিছু হলো মূতাওয়াতির। আর কিছু মশহুর। তবে সামগ্রিক বিবেচনায়, এক দিকে তা মুজিয়া সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞানের উৎস। অন্যদিকে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যবাদী হওয়ার প্রমাণবহ। [আর ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুস্তাফা]

তিনি [মুহাম্মদ সা.] ছিলেন, পরিপক্ব যুক্তি ও প্রকাশ্য প্রমাণাদি দ্বারা সাহায্যকৃত আমরা এ ব্যাপারেও বিশ্বাস স্থাপন করি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন পরিপক্ব যুক্তি ও প্রকাশ্য প্রমাণাদি দ্বারা সাহায্যকৃত, যা তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও আখলাক-চরিত্রে ছিল উদভাসিত। অতএব আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাঁকে সর্বোত্তম দেহকান্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যা দেখেই নিরীক্ষক-দৃষ্টিধারী ব্যক্তি বলে দিতে পারত যে তিনি একজন নবি। তিনি [মুহাম্মদ সা.] ছিলেন কোরানি আখলাকের চলন্তরূপ আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে আল-কোরানের সকল আখলাকে ভূষিত করেছেন, যা তাঁর সত্যবাদী হওয়া এবং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়াকে প্রমাণ করে- তাঁকে কেউ কখনো মিথ্যা বলতে শোনেনি, হোক তা দ্বীনের ব্যাপারে অথবা দুনিয়ার ব্যাপারে, হোক তা নবুওতের পূর্বে বা পরে; কেননা যদি কখনো এরূপ ঘটনা ঘটত, তবে তাঁর শত্রুরা তা লুফে নিত এবং তা প্রকাশ করতে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে যেত। তিনি কখনো কোনো দুষ্কর্ম অথবা ঘৃণিত কাজ করেননি, হোক তা নবুওতের পূর্বে কি পরে। তিনি জেহাদের ময়দানে কখনো তাঁর শত্রুদের থেকে পালিয়ে যাননি, অবস্থা যতই সঙ্গিন থাক-না-কেন। এর উদাহরণ ওহদ ও খন্দকের যুদ্ধ। তিনি তাঁর উম্মতের প্রতি সীমাহীন দয়ার্দ্র ছিলেন। এমনকি উম্মতের জন্য উৎকণ্ঠার অস্বাভাবিকতা কমাতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে খেতাব করে বলেন,

‘يَصْنَعُونَ بِمَا عَلِيمٌ اللَّهُ إِنَّ حَسْرَاتٍ عَلَيْهِمْ نَفْسُكَ تَذْهَبُ فَلَا

অতএব তাদের জন্য আফসোস করে নিজে ধ্বংস হয়ো না। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন’ - (সূরা ফাতির , ৮)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ,

عَلَيْكُمْ حَرِيمٌ عَنِتُّمْ مَا عَلَيْهِ عَزِيزٌ فُسْكُمْ أَنْ مِنْ رَسُولٍ جَاءَكُمْ لَقَدْ رَحِيمٌ رُءُوفٌ بِالْمُؤْمِنِينَ

নিশ্চয় তোমাদের নিজদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তা তার জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু’ - (সূরা আত্-তাওবা , ১২৮)।

তিনি ছিলেন বদ্যান্যতা ও দানশীলতার শীর্ষে। দুনিয়ার প্রতি বিমুখ। অল্পে তুষ্ট, যিনি কোনো সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখেননি। তিনি ছিলেন সমধিক বিশুদ্ধভাষী। তাঁকে দেয়া হয়েছে জাওয়ামিউল কালিম তথা ব্যাপক অর্থ ও ভাবকে সংক্ষিপ্ত শব্দমালায় প্রকাশ করার যোগ্যতা। তিনি ছিলেন সহিষ্ণু ও অতি ক্ষমাশীল। তিনি কেবল আল্লাহর খাতিরেই রাগ করতেন। তিনি মুমিনদের জন্য ছিলেন বিনম্র। তিনি ছিলেন আল্লাহর দাসস্বকারী। আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে আল্লাহ পথে জিহাদকারী। তিনি তাঁর গুণমাধুরী ও রববানী আখলাক জীনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধরে রেখেছেন। এ ক্ষেত্রে কখনো কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। আল্লাহ তাআলার বানীতে এদিকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ইরশাদ হয়েছে,

‘ الْمُتَكَلِّفِينَ مِنْ نَأٍ وَمَا

আর আমি ভানকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই’ - (সূরা সাদ , ৮৬)।

যারা ভানকারী তাদের গুণমাধুরী স্থায়িত্ব পায় না। তাদের আখলাক চরিত্র হয় লোকদেখানো জাত ও ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণমাধুরী ছিল জীবনব্যাপী। এর পাশাপাশি তা ছিল পূর্ণতার বিচারে শীর্ষতম। এ ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে অন্যকোনো মানুষের তুলনা হয় না। তবে আল্লাহ তাআলা যাদের মাসুম বানিয়েছেন তারা ছাড়া, অর্থাৎ নবি-রাসূলগণ (আ.) ছাড়া। অতএব এ সব উত্তম গুণ ও চরিত্রমাধুরী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওতের পক্ষে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। [দেখুন ইছারুল হাক্ক আলাল খালক পৃ. ৮০]

এ কারণেই, অনেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আখলাক-চরিত্র, সত্যবাদিতা, শোভিত সীরত দেখেই তাঁকে সত্যবাদী বলে ফয়সালা দিয়েছেন। উদাহরণত, খাদীজা (রাযি.) যেহেতু জানতেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আস-সাদেকুল আমীন (সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত), তাই সর্বপ্রথম ওহীর সাক্ষাতের পর তাঁর যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল তা ব্যক্ত করে খাদীজা (রাযি.) কে যখন বললেন, ‘আমি ভয় পেয়েছি যে আমার জীবন চলে যাবে’ তখন খাদীজা (রাযি.) বললেন, ‘কখনো না, আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না। নিশ্চয় আপনি আত্মীয়তা-বন্ধন রক্ষা করে চলেন। আপনি অক্ষম ব্যক্তির বোঝা বহন করেন। রিক্ত-নিরলসকে দান করেন। আপনি মেহমানদের আপ্যায়ন করেন। দুর্ঘটনা-কবলিতকে সাহায্য করেন। [মুসলিম]

অনুরূপভাবে রোমক-সম্রাট হিরাকল, নবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি পাঠালেন, তিনি তার দেশে থাকা আরবদের তার দরবারে আহবান করলেন। তখন আবু সূফ্যান কুরাইশদের একটি ব্যবসায়ী দলে সিরিয়ায় ছিলেন। হিরাকল তাদের ডেকে পাঠালেন। হিরাকলের পাশে সম্রাজ্যের গণ্যমান্য লোকেরা বসা ছিল। হিরাকল অনুবাদককে ডেকে আনলেন। এরপর নবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন। জবাব শুনে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, আমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অবস্থা, গুণমাধুরী ও জীবনবৃত্তান্ত যা শুনলাম, তা প্রমাণ করছে যে তিনি সত্যবাদী, তিনি একজন প্রেরিত নবি। ঘটনাটি যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ অতএব হিরাকল ও আবু সূফ্যানের মধ্যে সংঘটিত কথোপকথনের পুরোটাই সহিহ বুখারি থেকে এখানে তুলি দিচ্ছি; কেননা এতে অনেক

উপদেশ, শিক্ষণীয় বিষয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চরিত্রমাধুরীর মাধ্যমে যে তাঁর নবুওতের পক্ষে শক্ত দলিল বহন করেছেন তার প্রমাণ রয়েছে—

ইমাম বুখারি র. বলেন— ‘আবু সুফয়ান ইবনে হারব আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাযি.) কে বলেছেন যে, হিরাকল তার কাছে কুরাইশদের একটি দল পাঠালেন যারা আবু সুফয়ান ও কুরাইশ নেতাদেরকে—দেয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শান্তিচুক্তির সময়সীমায় শাম দেশে ব্যবসায়িক হিসেবে অবস্থান করছিল। আবু সুফয়ান তার দল নিয়ে আইলা এলাকায় থাকাকালে এরা তার কাছে আসেন। হিরাকল তাদের তার দরবারে উপস্থিত হওয়ার আহবান জানান। হিরাকলের পাশে ছিলেন রোমের মহান ব্যক্তির। তিনি তাদের ডাকলেন এবং তার অনুবাদককে হাজির হতে বললেন। এরপর বললেন : যিনি নিজেকে নবি হিসেবে ধারণা করছেন তোমাদের মধ্যে বংশগতভাবে তার সবচেয়ে কাছের মানুষ কে? আবু সুফয়ান বললেন : তাদের মধ্যে আমি সবচেয়ে কাছের মানুষ। হিরাকল বললেন : তুমি আমার কাছে এসো। হিরাকল তার সঙ্গীদেরও নিকটে নিয়ে এলেন এবং তার পেছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এরপর অনুবাদককে বললেন, তুমি এদের বলো, যে আমি একে ও—ই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব। যদি সে আমার সঙ্গে মিথ্যা বলে তবে তোমরা বলিও যে সে মিথ্যা বলেছে— আল্লাহর কসম, মানুষ আমার জীবনে মিথ্যার সন্ধান পাবে এ লজ্জা যদি না থাকত, তাহলে আমি সেদিন তাঁর সম্পর্কে অবশ্যই মিথ্যা বলতাম। এরপর তাঁর সম্পর্কে প্রথম প্রশ্নটি ছিল— বললেন : তোমাদের মাঝে তাঁর বংশ মর্যাদা কেমন? বললাম : তিনি বংশমর্যাদাসম্পন্ন। বললেন : তিনি যা বলেন, তোমাদের কেউ কি ইতোপূর্বে এরূপ বলেছে। বললাম : না। বললেন : তার পিতৃপুরুষদের মধ্যে কি কেউ রাজা ছিলেন? বললাম : না। বললেন : মান্যগণ্য ব্যক্তির। কি তার অনুসরণ করে না দুর্বলরা? বললাম : দুর্বলরা। বললেন : অনুসারীদের সংখ্যা কি বাড়ছে না কমছে? বললাম : বাড়ছে। বললেন : তাদের মধ্যে কি কেউ তার দ্বীনে প্রবেশ করার পর বিতৃষ্ণ হয়ে পূর্বের ধর্মে ফিরে যায়? বললাম : না। বললেন : তিনি যা বলছেন, তা বলার পূর্বে তোমরা কি তাকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করতে? বললাম : না। বললেন : সে কি গাদ্দারি করে? বললাম : না, তবে আমরা বর্তমানে তার সঙ্গে শান্তিচুক্তির সময়পূর্বে আছি। জানি না, তিনি এ ব্যাপারে কি করেন? আবু সুফয়ান বললেন, আমি এইটুকু বাক্য ছাড়া অন্যকিছু প্রবেশ করাতে পারিনি। হিরাকল বললেন : তোমরা কি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ। বললাম : হ্যাঁ। বললেন : তার বিরুদ্ধে তোমাদের যুদ্ধ কেমন ছিল? বললাম : জয়-পরাজয়ের মাঝেই আমাদের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। কখনো তিনি জয়ী হন, কখনো আমরা জয়ী হই। বললেন : তিনি তোমাদের কিসের নির্দেশ দেন? বললাম : তিনি বলেন যে, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না। আর তোমাদের পিতারা যা বলে তা বর্জন করো। তিনি আমাদের নামাজ পড়তে বলেন, সত্যবাদিতা, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, আল্লায়তা-বন্ধন রক্ষা ইত্যাদির নির্দেশ দেন। অতঃপর হিরাকল অনুবাদকে বললেন, তাকে বল— আমি তোমাকে তার বংশ মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, তুমি উল্লেখ করেছে যে তিনি তোমাদের মধ্যে বংশমর্যাদাসম্পন্ন। রাসূলগণ এরূপই হয়ে থাকেন যে তারা নিজ কাওমে মর্যাদাসম্পন্ন বংশে প্রেরিত হয়ে থাকেন। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি , তিনি যা বলেন, তোমাদের কেউ কি ইতোপূর্বে এরূপ বলেছে? তুমি বলেছ যে, না। যদি তোমাদের মধ্যে ইতোপূর্বে কেউ এরূপ কথা বলে থাকত, তবে বলতাম— লোকটি তার পূর্বের বলা কথারই পুনরাবৃত্তি করেছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে, তার পিতৃপুরুষদের মধ্যে কেউ রাজা ছিলেন কি না? তুমি বলেছ, না। আমি বলব যে, তার পিতৃপুরুষের মধ্যে কেউ রাজা থাকলে মনে করতাম যে তিনি তার পিতার রাজত্ব কামনা করতেন। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে, তিনি যা বলছেন, তা বলার পূর্বে তোমরা কি তাকে

মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করতে? তুমি বলেছ, না। আর আমি এটা জানি যে, মানুষের ওপর মিথ্যা বলা বর্জন করে আল্লাহর ওপর মিথ্যা বলবে, তা হতে পারে না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে, গণ্যমান্য লোকেরা তার অনুসরণ করছে না দুর্বলরা? তুমি বলেছ, দুর্বলরা। এরাই হলেন রাসূলগণের অনুসারী। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি , তারা কি সংখ্যায় বাড়ছে না কমছে? তুমি বলেছ, বাড়ছে। ঈমানের বিষয়টি এরকমই। তা বেড়ে-বেড়ে এক সময় পূর্ণতা লাভ করে। আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছি যে, তাদের মধ্যে কি কেউ তার দ্বীনে প্রবেশ করার পর বিতৃষ্ণ হয়ে পূর্বের ধর্মে ফিরে যায়? তুমি বলেছ, না। ঈমান এরকমই যখন তা অন্তরের প্রফুল্লতার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যায়। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে তিনি কি বিশ্বাসঘাতকতা করেন? তুমি বলেছ, না। রাসূলগণ এ রকমই হন। তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেন না। আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে, তিনি তোমাদের কিসের নির্দেশ দেন? তুমি বলেছ, ‘তিনি আমাদের নামাজ পড়তে বলেন, সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক নিষ্কলুষতা অবলম্বন করতে বলেন।’ তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি আমার এ দুপায়ের নিচে যে জায়গা রয়েছে, তারও মালিক হবেন। আমি নিশ্চয়ই জানতাম তিনি প্রকাশ পাবেন। তবে এটা ভাবতাম না যে তিনি তোমাদের মধ্য থেকে প্রকাশ পাবেন। আমি যদি জানতাম যে আমি তার কাছে পৌঁছতে পারব, তা হলে তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সকল কষ্ট সহ্য করতাম। আর আমি যদি তার নিকটে থাকতাম তবে আমি নিজে তার পা ধুয়ে দিতাম...। [বুখারি, আস-সহিহ (ফাতহুল বারীসহ) ১/২৬-৩১]

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ২৬ : আল্লাহ তাআলার কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

আল্লাহ তাআলার কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

ঈমানের রোকন সমূহের একটি হলো আল্লাহ তাআলা তাঁর নবি-রাসূলগণের ওপর যেসব কিতাব নাজিল করেছেন, সেগুলোর প্রতি ঈমান আনা। অর্থাৎ সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর আল কোরান নাজিল করার মতো তাঁর পূর্বে অতিবাহিত হওয়া অন্যান্য রাসূলগণের ওপরও আল্লাহ তাআলা কিতাব নাজিল করেছেন। এ সব কিতাবের মধ্যে কিছু আছে এমন যেগুলোর নাম আল-কোরানে উল্লেখ রয়েছে। আবার কিছু আছে এমন যেগুলোর নাম আল-কোরানে উল্লেখ করা হয়নি। যেসব কিতাবের নাম আল্লাহ তাআলা আমাদের জানিয়েছেন তা হলো , তাওরাত : যা মুসা আলাইহিস সালামের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّا
أَسْلَمُوا الَّذِينَ النَّبِيُّونَ هَآئِ يَحْكُمُ وَتُورُ هُذَى فِيهَا التَّوْرَةَ أَنْزَلْنَا
لِلَّذِينَ اسْتَحْفِظُوا بِمَا وَالْأَخْبَارُ وَالرَّبَّانِيُّونَ هَآذُوا لِلَّذِينَ
شُهِدَاءُ عَلَيْهِ وَكَانُوا

নিশ্চয় আমি

তাওরাত নাজিল করেছি, তাতে ছিল হিদায়েত ও আলো, এর মাধ্যমে ইহুদিদের জন্য ফয়সালা প্রদান করত অনুগত নবিগণ এবং রব্বানী ও ধর্মবিদগণ। কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের

রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল এর ওপর সাক্ষী' - (সূরা আল মায়েদা , ৪৪)।

ইনজিল : যা ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর নাজিল হয়েছিল। ইরশাদ হয়েছে ,

وَقَفَّيْنَا
التَّوْرَةَ مِنْ يَدَيْهِ بَيْنَ لِمَا مُصَدِّقًا مَرِّمَ ابْنِ بَعِيسَى أَثَارِهِمْ عَلَى
التَّوْرَةَ مِنْ يَدَيْهِ بَيْنَ لِمَا وَمُصَدِّقًا وَرُودُ هُذَى فِيهِ الْإِنْجِيلَ وَأَتَيْنَاهُ
لِلْمُتَّقِينَ وَمَوْعِظَةً وَهُدًى

আর আমি

তাদের পেছনে মারয়াম পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্মুখে বিদ্যমান তাওরাতের সত্যায়নকারীরূপে এবং তাকে দিয়েছিলাম ইনজীল, এতে রয়েছে হিদায়েত ও আলো এবং (তা ছিল) তার

সম্মুখে অবশিষ্ট তাওরাতের সত্যায়নকারী, হিদায়েত ও মুতাকীদের জন্য উপদেশস্বরূপ' - (সূরা আল মায়েদা , ৪৬)।

জাবুর : যা দাউদ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাজিল হয়েছিল। ইরশাদ হয়েছে ,

وَأَتَيْنَا
رَبُّوْرًا دَاوُودَ

এবং আমি

দাউদকে যাবুর দিয়েছি' - (সূরা আল ইসরা , ১৬৩)।

সহিফা : তথা পুস্তিকা, যা ইবরাহিম ও মুসা আলাইহিমাস সালামের ওপর নাজিল হয়েছিল। ইরশাদ হয়েছে ,

يُنَبِّأُ لَمْ أَمْ
أَخْرَى وَزَرَ وَازَرَهُ تَزَرُ أَلَا . وَفَى الَّذِي وَإِبْرَاهِيمَ . مُوسَى صُخْفٍ فِي بِمَا
يُجْزَاهُ ثُمَّ . يُرَى سَوْفَ سَعِيَهُ وَأَنَّ . سَعَى مَا إِلَّا لِلنَّسَانِ لَيْسَ وَأَنَّ .
الْمُنْتَهَى رَبِّكَ إِلَى وَأَنَّ . الْأَوْفَى الْجَزَاءُ

নাকি মুসার

কিতাবে যা আছে, সে সম্পর্কে তাকে অবহিত করা হয়নি ? আর ইব্রাহীমের কিতাবে, যে (নির্দেশ) পূর্ণ করেছিল। তা এই যে, কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। আর এই যে,

মানুষ যা চেষ্টা করে, তাই সে পায়। আর এই যে, তার প্রচেষ্টার ফল শীঘ্রই তাকে দেখানো হবে। তারপর তাকে পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করা হবে। আর নিশ্চয় তোমার রবের নিকটই হলো শেষ গন্তব্য' - (সূরা আন-নাজম , ৩৭-৪২)।

অন্যত্র এসেছে ,

مَنْ لَحَ أَفْ قَدْ
وَالْآخِرَةُ . الدُّنْيَا الْحَيَاةُ تُؤْتِرُونَ بَلْ . فَصَلَّى رَبِّهِ اسْمَ وَذَكَرَ . تَزَكَّى
' . وَمُوسَى إِبْرَاهِيمَ صُحُفٍ . الْأُولَى الصُّحُفِ لَفِي هَذَا إِنَّ . وَأَبْقَى خَيْرُ
অবশ্যই সাফল্য

লাভ করবে যে আত্মশুদ্ধি করবে, আর তার রবের নাম স্মরণ করবে, অতঃপর সালাত আদায় করবে। বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ। অথচ আখিরাত সর্বোত্তম ও স্থায়ী। নিশ্চয় এটা

আছে পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে। ইব্রাহীম ও মুসার সহীফাসমূহে' - (সূরা আল আ'লা , ১৪-১৯)।

অষ্টাতনামা কিতাবসমূহ : উল্লিখিত কিতাবগুলো ছাড়া অন্যান্য রাসুলগণের ওপর যেসব কিতাব নাজিল হয়েছিল যেগুলোর নাম আল্লাহ তাআলা আমাদের জানাননি, তবে তিনি কেবল এতটুকু বলেছেন যে, প্রত্যেক রাসুলকেই তাঁর নিজের ভাষায় রিসালত দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ,

النَّاسُ كَانَ
الْكِتَابَ مَعَهُمْ وَأَنْزَلَ وَمُنْذِرِينَ مُبَشِّرِينَ النَّبِيِّينَ اللَّهُ فَبَعَثَ وَاحِدَةً أُمَّةً
' فِيهِ اخْتَلَفُوا فِيمَا النَّاسُ بَيْنَ لِيَحْكُمَ بِالْحَقِّ
মানুষ ছিল এক

উম্মত। অতঃপর আল্লাহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে নবিদের প্রেরণ করলেন এবং সত্যসহ তাদের সঙ্গে কিতাব নাজিল করলেন, যাতে মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যে বিষয়ে তারা

মতবিরোধ করত' - (আল বাকারা , ২১৩)।

এ সব অষ্টাতনামা কিতাব বিষয়ে আমাদের যা করণীয়, তা হলো সেগুলোর ওপর এজমালিভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং যে কিতাবকে আল্লাহ তাআলা তাঁর নাজিলকৃত বলে সংবাদ দেননি, তা আল্লাহর কিতাব বলে দাবি না করা। আল্লাহ তাআলার কিতাবসূহের ব্যাপারে আমাদের এও বিশ্বাস করতে হবে যে, তা নাজিল হয়েছে সত্য, আলো ও হিদায়েত নিয়ে, রুবুবিয়াত, উলুহিয়াত, নাম ও সিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার তাওহিদ তথা অদ্বিতীয় হওয়ার বার্তা নিয়ে। আর যদি সত্য, আলো ও হিদায়েত ছাড়া অন্য কিছু তাতে মিশ্রিত থাকে, তাহলে তা হবে মানব-প্রবিশ্ট বিকৃতি ও কারসাজি। ইরশাদ হয়েছে,

أَنْزَلْنَا إِنْ
' وَثُورٌ هُدًى فِيهَا التُّورَةُ

নিশ্চয় আমি

তাওরাত নাজিল করেছি, যাতে ছিল হিতায়েত ও আলো' - (সূরা আল মায়েদা , ৪৩)।

عَلَى وَقَفَيْنَا
وَأَتَيْنَاهُ التُّورَةَ مِنْ يَدَيْهِ بَيْنَ لِمَا مُصَدِّقًا مَرِيَمَ ابْنِ بَعِيسَى آثَارِهِمْ
وَهُدًى التُّورَةَ مِنْ يَدَيْهِ بَيْنَ لِمَا وَمُصَدِّقًا وَثُورٌ هُدًى فِيهِ الْإِنْجِيلُ
' لِمُتَّقِينَ وَمَوْعِظَةٌ

আর আমি তাদের

পেছনে মারয়াম পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্মুখে বিদ্যমান তাওরাতের
সত্যায়নকারীরূপে এবং তাকে দিয়েছিলাম ইনজীল, এতে রয়েছে হিদায়েত ও আলো এবং
(তা ছিল) তার
সম্মুখে অবশিষ্ট তাওরাতের সত্যায়নকারী, হিদায়েত ও মুতাকীদের জন্য উপদেশস্বরূপ' – (সূরা
আল মায়েদা , ৪৬)।

আল-কোরানের অনন্য বৈশিষ্ট্য

কিতাব সংক্রান্ত বিশ্বাসের আওতায় গুরুত্বপূর্ণ একটি বিশ্বাস হলো আল কোরান সম্পর্কে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল-হওয়া সর্বশেষ কিতাব, যার অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ অন্যসব কিতাবে অনুপস্থিত। যেমন :

এক. এ কিতাব হলো সকল ঐশী নির্দেশনার খোলাসা। আল্লাহর একত্ববাদ, একমাত্র তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে যেসব শিক্ষা ছিল, আল কোরান তার সত্যায়নকারী ও সমর্থক। অন্যান্য কিতাবে আখলাক-চরিত্র ও ভালো কাজ-বিষয়ক যেসব নির্দেশনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, আল কোরান তা একত্রকারী। আল কোরান অন্যান্য কিতাবের ওপর আধিপত্যকারী ও পর্যবেক্ষক। সেগুলোতে যেসব সত্য ছিল আল কোরান সেগুলো স্বীকার করে নেয় এবং তাতে যেসব বিকৃতি ও পরিবর্তন স্পর্শ করেছে, আল কোরান তা উন্মুক্তকারী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

الْكِتَابِ مِنْ يَدَيْهِ بَيْنَ لِمَا مُصَدِّقًا بِالْحَقِّ الْكِتَابَ إِلَيْكَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِ وَمُهِمِّنَا

আর আমি তোমার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি যথাযথভাবে, এর পূর্বের কিতাবের সত্যায়নকারী ও এর ওপর তদারককারীরূপে’ - (সূরা আল মায়েদা , ৪৮)।

উপরন্তু আল কোরান এমন এক ব্যাপক শরীয়ত নিয়ে এসেছে, যাতে আছে মানুষের ইহ-পরকালীন সৌভাগ্যের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই। এ কোরান দ্বারা পূর্বের জাতিসমূহের জন্য বিশিষ্ট প্রায়োগিক শরীয়ত বাতিল করে দেয়া হয়েছে এবং সে-সবে, স্থান-কাল-পাত্রের সীমানামুক্ত যেসব শাস্ত্র বিধানমালা ছিল, তা এতে রেখে দেয়া হয়েছে। দুই. আল কোরান হলো একমাত্র রব্বানী গ্রন্থ যা সংরক্ষিত আকারে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে নিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে ,

لَخَافِظُونَ لَهُ وَإِنَّا الذِّكْرَ نَزَّلْنَا نَحْنُ إِنَّ

নিশ্চয় আমি কোরান নাজিল করেছি, আর আমিই তার হেফাজতকারী’ - (সূরা আল হিজর , ৯)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ,

خَلْفِهِ مِنْ وَلَا يَدِيهِ بَيْنَ مِنَ الْبَاطِلُ يَأْتِيهِ لَا . غَزِيرٌ لِكِتَابٍ وَإِنَّهُ . حَمِيدٌ حَكِيمٌ مِنْ تَنْزِيلٍ

আর এটি নিশ্চয় এক সম্মানিত গ্রন্থ। বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, না সামনে থেকে, না পিছন থেকে। এটি প্রজ্ঞাময়, সপ্রশংসিতের পক্ষ থেকে নাজিলকৃত’ - (সূরা ফুসিসলাত , ৪১-৪২)।

আল কোরান যেহেতু সুনির্দিষ্ট কোনো জাতির জন্য নয় বরং সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের জন্য অবতীর্ণ একটি গ্রন্থ, তাই এটিকে বিকৃতি ও মানুষের হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষিত রাখা অত্যাবশ্যক ছিল; যাতে তা কিয়ামত পর্যন্তের জন্য মানুষের ওপর আল্লাহর প্রমাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। পক্ষান্তরে অন্যান্য কিতাবের বাণীগুলো, যে জাতির উদ্দেশে কিতাব নাজিল হয়েছিল, শুধু তাদেরকেই খেতাব করেছে, অন্যান্য জাতিকে খেতাব করেনি, যদিও

দ্বীনের মৌলিক নীতি-আদর্শগুলো সব কিতাবেই ছিল অভিন্ন। তবে তাতে যে শরীয়া ও হুকুএ আহকাম নাজিল হয়েছিল, তা ছিল বিশেষ কাল ও পাত্রের জন্য সুনির্ধারিত। নিম্নবর্তী আয়াত এ বিষয়টিকেই নির্দেশ করছে। ইরশাদ হয়েছে ,

‘ وَمِنْهَا جَا شِرْعَةً مِنْكُمْ جَعَلْنَا لِكُلِّ

তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরীয়ত ও স্পষ্ট পন্থা’ - (সূরা আল মায়েদা , ৪৮)।

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা আল-কোরানের মতো সেগুলোকে সকলযুগের জন্য সংরক্ষিত করে রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেননি। এর বিপরীতে আল্লাহ তাআলা বরং তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থে, পূর্বের কিতাবগুলোতে তাহরীফ-বিকৃতি সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন। এ সব বিকৃতির মধ্যে ইহুদিদের কর্তৃক তাওরাতে বিকৃতিসাধন একটি। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন ,

ثُمَّ اللَّهُ كَلَّمَ يَسْمَعُونَ مِنْهُمْ فَرِيقٌ كَانَ وَقَدْ لَكُمْ يُؤْمِنُوا أَنْ أَفْتَطْمَعُونَ يَغْلُمُونَ وَهُمْ عَقْلُوهُ مَا بَعْدَ مِنْ يُحَرِّفُونَهُ

তোমরা কি এই আশা করছ যে, তারা তোমাদের প্রতি ঈমান আনবে? অথচ তাদের একটি দল ছিল যারা আল্লাহর বাণী শুনত অতঃপর তা বুঝে নেয়ার পর তা তারা বিকৃত করত, জেনে বুঝে’ - (সূরা আল বাকারা , ৭৫)।

তিনি আরও বলেন ,

مَوَاضِعِهِ عَنِ الْكَلِمِ يُحَرِّفُونَ هَادُوا الَّذِينَ مِنَ

ইহুদিদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা কালামসমূহকে তার স্থান থেকে পরিবর্তন করে ফেলে’ - (সূরা আন-নিসা , ৪৬)।

আর নাসারা সম্প্রদায় ইনজিলে যে বিকৃতি ঘটিয়েছে সে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন ,

مِمَّا خَطَا فَتَسُوا مِيثَاقَهُمْ أَخَذْنَا نَصَارَى إِنَّا قَالُوا الَّذِينَ وَمِنْ الْقِيَامَةِ يَوْمَ إِلَى وَالْبَعْضَاءِ الْعَدَاوَةِ بَيْنَهُمْ فَأَعَزَّيْنَا بِهِ ذُكْرُوا جَاءَكُمْ قَدْ الْكِتَابِ أَهْلٌ يَا يَصْنَعُونَ كَانُوا بِمَاءِ اللَّهِ يُنَبِّئُهُمْ وَسَوْفَ عَنْ وَيَعْفُو الْكِتَابِ مِنْ خَفَوْنَ كُنْتُمْ مِمَّا كَثِيرًا لَكُمْ يُبَيِّنُ رَسُولُنَا مُبَيِّنٌ وَكِتَابٌ نُورٌ اللَّهُ مِنْ جَاءَكُمْ قَدْ كَثِيرٌ

আর যারা বলে ‘আমরা নাসারা’ , আমি তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম।

অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তার একটি অংশ ভুলে গিয়েছে। ফলে আমি তাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত শত্রুতা ও ঘৃণা উসকে দিয়েছি এবং তারা যা করত সে সম্পর্কে অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে অবহিত করবেন। হে কিতাবীরা, তোমাদের নিকট আমার রাসুল এসেছে, কিতাব থেকে যা তোমরা গোপন করত, তার অনেক কিছু তোমাদের নিকট সে প্রকাশ করেছে এবং অনেক কিছু ছেড়ে দিয়েছে। অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে’ - (সূরা আল মায়েদা , ১৪-১৫)। ইহুদি ও নাসারা সম্প্রদায় তাদের ধর্মে যেসব বিকৃতিসাধন করেছে, তন্মধ্যে একটি হলো ইহুদিদের এ ধারণা যে, উযাইর -আলাইহিস সালাম- আল্লাহর পুত্র এবং নাসারাদের এ ধারণা যে খ্রীশু আল্লাহর পুত্র। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন ,

ذَلِكَ اللَّهُ ابْنُ الْمَسِيحِ النَّصَارَى وَقَالَتِ اللَّهُ ابْنُ غَزِيرٍ الْيَهُودُ وَقَالَتِ أَنَّى اللَّهُ قَاتِلَهُمْ قَبْلُ مِنْ كَفَرُوا الَّذِينَ قَوْلُ يُضَاهِيُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ قَوْلُهُمْ فَكُونَ يُؤْ

‘আর ইহুদিরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে, মসীহ আল্লাহর

পুত্র। এটা তাদের মুখের কথা, তারা সে সব লোকের কথার অনুরূপ বলছে যারা ইতোপূর্বে কুফরি করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন, কোথায় ফেরানো হচ্ছে এদেরকে?’ – (সূরা আত-তাওবা , ৩০)। তাদের এ উদ্ভাবিত বিকৃতি আল কোরান অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা যে সন্তানগ্রহণ থেকে পবিত্র, তা স্পষ্টরূপে বলে দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ,

كُفُّوا لَهُ يَكُنْ وَلَمْ . يُولَدْ وَلَمْ يَلِدْ لَمْ . الصَّمَدُ اللَّهُ . أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ
'বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাঁর কোনো সমকক্ষও নেই' – (সূরা আল ইখলাস , ১-৪)। পাশাপাশি আল কোরান এ সত্যটিকেও অত্যুজ্জলভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে যে, সকল রাসুলই মানুষ ছিলেন, যাদের আল্লাহ তাআলা ওহী দিয়ে বিশিষ্ট করেছেন এবং তাদের এমন সব যোগ্যতা দিয়েছেন, যা ওহী ও মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের সাহায্য করবে। আল্লাহ তাঁর রাসুলকে খেতাব করে বলেন ,

وَاحِدٌ إِلَهُ إِلَهُكُمْ مَا أَنَا إِلَهِي يُوحَىٰ مِثْلُكُمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّمَا قُلْ
'আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ' – (সূরা আল কাহাফ , ১১০)।

নাসারা সম্প্রদায়ের অনুপ্রবিষ্ট যেসব বিকৃতির কথা আল্লাহ তাআলা আল-কোরানে উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে একটি হলো নবুওতের হাকীকত ও স্বরূপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিকৃতি। অর্থাৎ তাদের একদল ঈসা ইবনে মারযাম আলাইহিস সালামকে ইলাহ বলেছে। অন্যদল ত্রিষ্ববাদে বিশ্বাস করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন ,

مَرْيَمَ ابْنُ الْمَرْيَمِ هُوَ اللَّهُ إِنَّ قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَقَدْ
তারা, যারা বলে, নিশ্চয় মারযাম পুত্র মসীহ-ই হলো আল্লাহ' – (সূরা আল মায়েদা , ৭৩)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ,

وَاحِدٌ إِلَهُ إِلَّا إِلَهُ مِنْ وَمَا ثَلَاثَةٌ ثَالِثُ اللَّهُ إِنَّ قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَقَدْ

নিশ্চয় কাফের হয়েছে তারা, যারা বলেছে, নিশ্চয় আল্লাহ তিনজনের মধ্যে একজন। অথচ এক আল্লাহ ছাড়া অন্যকোনো ইলাহ নেই' – (সূরা আল মায়েদা , ৭৫)।

অতঃপর আল কোরান এসে তাদের এ বিকৃতি তুলে ধরে ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর মায়েদার ব্যাপারে বিশুদ্ধ আকীদা কি তা বলে দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ,

صَدِيقُهُ وَأُمُّهُ الرُّسُلُ قَبْلَهُ مِنْ خَلَتْ قَدْ رَسُولُ إِلَّا رَيْمَ ابْنُ الْمَرْيَمِ مَا
أَنَّى أَنْظَرُ ثُمَّ الْآيَاتِ لَهُمْ نُبَيِّنُ كَيْفَ أَنْظَرُ الطَّعَامَ يَأْكُلَانِ كَانَا
'يُؤْفَكُونَ

মারযাম পুত্র ঈসা কেবল একজন রাসুল। তার পূর্বে অনেক রাসুল বিগত হয়েছে। আর তার মা ছিলো অতি সত্যবাদী। তারা উভয়ে খাবার খেত। দেখ, কীভাবে আমি তাদের জন্য আয়াতসমূহ বর্ণনা করছি। অতঃপর দেখ কীভাবে তাদেরকে সত্যবিমুখ করা হচ্ছে।' – (সূরা আল মায়েদা , ৭৫)।

উপরন্তু যে সত্যটির ব্যাপারে কোনো সত্যনিষ্ঠ ও ইনসারূপ মানুস বিতন্ডা করতে পারে না, তা হলো – আল কোরান ছাড়া বর্তমানবিশ্বে এমন কোনো গ্রন্থ নেই, যা আল্লাহর গ্রন্থ বলে দাবি করার উপযোগী; কেননা, সে সব গ্রন্থ আল-কোরানে বর্ণিত বিকৃতিগুলো ধারণ

করার পাশাপাশি, বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার মানদণ্ডেও তা বিকৃত এবং ঐশীউৎস-রহিত। নিম্নে এ জাতীয় কয়েকটি দলিল পেশ করা হলো- ক. যেসব গ্রন্থ আল-কোরানের পূর্বে নাজিল করা হয়েছিল, তার আসল কপি হারিয়ে গিয়েছে। মানুষের হাতে যা রয়েছে তা হলো কেবল অনুবাদ। পক্ষান্তরে মহাগ্রন্থ আল-কোরানের প্রতিটি আয়াত, সূরা, শব্দ-বাক্য, যের-যবর-পেশ ঠিক সেভাবেই আছে, যেভাবে জিবরীল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য তিলাওয়াত করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের ((রাযি.)) তিলাওয়াত করে শুনিয়েছিলেন।

খ.এ সব গ্রন্থে, আল্লাহর কথা মানুষের কথার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছে। যেমন- ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, ইতিহাস, নবি ও তাঁর শিষ্যদের জীবনী, ফকীহদের উদ্ভাবন ইত্যাদি। অতএব তাতে আল্লাহর কথা কোনটি এবং মানুষের কথা কোনটি, তা নির্ণয় করা দুষ্কর। এর বিপরীতে আল-কোরানের পুরোটাই আল্লাহ তাআলার বাণী। এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস, সাহাবীদের ((রাযি.)) কথা অথবা অন্যকারও কথা মিশ্রিত হয়নি। আবুল ওয়াফা আলী ইবনে আকীল বলেন, ‘আপনি যদি জানতে চান যে, আল কোরান রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী নয়, বরং তা তাঁর ওপর অবতীর্ণ এক গ্রন্থ। তাহলে তাঁর বাণীগুলো নিরীক্ষা করে দেখুন। আপনি অবশ্যই দেখতে পাবেন, তা কোরান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আপনি আল-কোরানের বাণী ও হাদীসের বাণীর মাঝে স্টাইলগত পার্থক্য স্পষ্টরূপেই ধরতে পারবেন। বস্তুত মানুষের কথা পরস্পর সদৃশ। আর আল কোরান সাদৃশ্যরহিত। রাসূলের কথা আল-কোরানের কথার মতো নয়। [দেখুন আল ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুস্তাফা পৃ.১/২৭০]

তিনি আরও বলেছেন, ‘আল-কোরানের একটি অলৌকিকতা এই যে-তাতে এমন কোনো আয়াত নেই, যার অর্থ পূর্ববর্তী কোনো বাণী থেকে নেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে মানুষ পরস্পর পরস্পর থেকে ধার করে। যেমন বলা হয় যে, প্রসিদ্ধ আরবী কবি মৃতানাববী বৃহতারী থেকে ধার করেছে। [প্রাগুক্ত] গ. অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে এমন একটি গ্রন্থও নেই, যা ওই রসূলের সঙ্গে সংযুক্ত করে উল্লেখ করা যায়, যার ওপর তা নাজিল হয়েছিল; কেননা তা ঐতিহাসিক বিশ্বস্তা-রহিত। যাকে পুরাতন সুসমাচার বলা হয়-তাওরাত নামেও যাকে ডাকা হয়- এর সকল অধ্যায় মূসা আলাইহিস সালামের বেশ কয়েক শতাব্দী পর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। লারোস বিশ্বকোষের উদ্ধৃতি দিয়ে মুহাম্মাদ ফরীদ ওয়াজদী বলেন, ‘আধুনিক বিজ্ঞান, বিশেষ করে জার্মান-কেন্দ্রিক সমালোচনা সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ও ভাষাবিজ্ঞান-কেন্দ্রিক পরিচালিত বিস্তারিত গবেষণার ফলাফল হলো এই যে, বর্তমান তাওরাত মূসা আলাইহিস সালামের লিখিত গ্রন্থ নয়। তা বরং ইহুদি আলেমদের লেখা যারা তাদের নাম অনুল্লিখিত রেখেছেন। তারা পর্যায়ক্রমে তা তৈরি করেছেন। তারা তা প্রস্তুতের সময়, ব্যবিলনের বন্দিজীবনের পূর্বে, মানুষের মুখে যেসব বর্ণনা শুনেছিলেন তার আলোকেই তৈরি করেছেন। বরং আলেমদের কেউ কেউ বলেছেন যে, এই পাঁচ অধ্যায়েও ইসরাইলি বর্ণনার পুরোটা আসেনি, বরং তা কেবল কিছু ইশারা-ইঙ্গিত ও কাহিনীকে শামিল করেছে। [দেখুন সাইয়েদ সাবেক, আল আকায়েদ আল ইসলামীয়াহ পৃ.১৬৮ - সাইয়েদ সাবেক বলেন, প্রচলিত ইনজীলসমূহ বিকৃত হওয়ার পক্ষে সংক্ষিপ্ত দলিল হলো- এ ইনজীলগুলোর সাংখ্যিক হালো চার, যা চল্লিশটি ইনজীল থেকে বাছাই করে নেয়া হয়েছে। এ ইনজীলগুলো ঈসা আলাইহিস সালামের জীবনিতিহাসকে শামিল করেছে। এগুলোর লেখক কে, তাও সবার জানা। প্রতিটি ইনজীলের সঙ্গে লেখকের নাম সংযুক্ত রয়েছে। খ্রিষ্টধর্ম গবেষণাগার নিজেরাই স্বীকার করেন যে, ইনজীলে থাকা বিশ্বাসগুলো মূলত পোলস এর অভিমত, অন্যান্য হওয়ারি অথবা ঈসা

আরাইহিস সালামের অতি নিকটবর্তী কোনো ব্যক্তির লেখা নয়। প্যারিসের জনৈক আমীর ব্যক্তির লাইব্রেরীতে ইনজীলে বারনাবাসের একটি কপি পাওয়া যায়। আল মানার লাইব্রেরী তা আরবিতে অনুবাদ করে ছাপিয়েছে। বারনাবাসের ইনজীল অন্যান্য ইনজীল থেকে বহু বিষয়ে ভিন্ন।]

এর বিপরীতে মহাগ্রন্থ আল কোরান হলো একমাত্র কিতাব, যে রাসুলের ওপর তা নাজিল হয়েছে তার দিকে এর নিসবত-সম্পৃক্ততা অকাট্যভাবে প্রমাণিত-প্রতিষ্ঠিত। আর তিনি হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এ কিতাবটি তার সকল সূরা, আয়াত, বিন্যাস এবং তিলাওয়াত পদ্ধতি নাজিল হওয়ার সময় থেকে পরবর্তী সকল যুগেই বহুসংখ্যক মানুষের বর্ণনায় হস্তান্তরিত হয়েছে, যা সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশও বাকি রাখে না যে, বর্তমানে আমাদের তিলাওয়াতকৃত কোরানই হলো হুবহু সে কোরান যা আল্লাহর রাসুলের ওপর নাজিল হয়েছিল।

আর সে সব কিতাবে বিকৃতি সংঘটিত হওয়ার অকাট্য দলিলসমূহের একটি হলো, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর সম্মানিত রাসুলগণ সম্পর্কে তাতে থাকা বিকৃত-বিশ্বাস ও বাতিল ধ্যান-ধারণাগুলো। আপনি এ সব কিতাবে পাবেন যে তাতে সৃষ্টিকর্তাকে মানুষের সদৃশ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। নবি রাসুলগণের ব্যাপারে এমনসব উক্তি তাতে রয়েছে, যা তাদের মর্যাদা ও চরিত্রে চরমভাবে আঘাত হানে। [যেমন প্রচলিত তাওরাতের জেনোসাইজ অধ্যায়ে (৩/২২) এসেছে: (প্রভু বললেন, এই তো সে মানুষ যে আমাদের মতো হয়ে গেছে, যে ভালো ও মন্দকে জানে); (প্রভু চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তার অন্তরে তিনি আফসোস করলেন)। নবিদের (আ.) চরিত্রে আঘাতকর উক্তি হিসেবে বেশ কিছু উক্তি প্রণিধানযোগ্য, তন্মধ্যে কয়েকটি হলো এই – ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এসেছে যে, তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন। লূত আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এসেছে যে, তিনি তাঁর দুই মেয়ের সঙ্গে যিনা করেছেন। হারুন আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এসেছে যে তিনি বনী ইসরাঈলকে বাছুর পূজার জন্য আহবান করেছেন। দাউদ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এসেছে যে, তিনি যিনা করেছেন। সুলাইমান আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এসেছে যে, তিনি তাঁর স্ত্রীর সন্তুষ্টি জন্য মূর্তিপূজা করেছেন। বিকৃতি সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে এর থেকে অধিক শক্তিশালী অন্যকোনো দলিলের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না (সাইয়েদ সাবেক এর আল আকায়েদ আল ইসলামীয়া থেকে উদ্ধৃত পৃ. ১৬৭)।]

যেহেতু পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এ ধরনের তাহরীফ-বিকৃতি-পরিবর্তন অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, তাই সে-সবের প্রতি ঈমানের পদ্ধতি হবে এই যে, তা মূলে আল্লাহর তাআলার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত। তিনি তাঁর রাসুলগণের ওপর তা নাজিল করেছিলেন অভিন্ন উদ্দেশ্যে, যে উদ্দেশ্যে আল কোরান নাজিল করেছেন। এর পাশাপাশি এ সব গ্রন্থের অন্তরভুক্তিসমূহের ব্যাপারে আমরা বিশ্বাস করব না যে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, তবে কেবল সেগুলোতে যার সত্যায়ন আল-কোরানে খুঁজে পাওয়া যায়। অতএব আমাদের ওপর এ বিশ্বাস পোষণ করা ফরজ যে, একমাত্র আল কোরানই হলো আললাহ তাআলা নিরেট বাণীসম্ভার। সত্যগ্রন্থ। যার প্রতিটি শব্দ সুসংরক্ষিত। এর নির্দেশমালা মেনে চলা ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকা অত্যাবশ্যক। এর সকল সংবাদে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং যা এর বিপক্ষে তা অমান্য করা ফরজ।

পরকালের প্রতি ঈমান

সংক্ষিপ্তাকারে এ ঈমানের মর্ম হলো- পরকাল সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আল-কোরানে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সুন্নাহয় যা যা বলেছেন, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন- কবরের ফিতনা। কবরের আজাব ও নিয়ামত। পুনরুত্থান। হাশর-নশর। আমলনামা। হিসাব। মীযান। হাউজে কাউছার। পুল সিরাত। শাফা'আত। জাল্লাত-জাহান্নাম এবং আল্লাহ তাআলা এ উভয়ের অধিবাসীদের জন্য যা তৈরি রেখেছেন তার প্রতি বিশ্বাস করা। পরকালের প্রতি আল-কোরানের গুরুত্বারোপ ও তার হিকমত পরকালের উল্লেখে আল কোরান ভরপুর। প্রতি ক্ষেত্রেই আল কোরান পরকালের প্রতি বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সকল উপলক্ষে এ বিশ্বাসটির প্রতি ইঙ্গিত করেছে। আরবী ভাষার নানাবিধ ব্যবহারে, পরকাল সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি তাগিদ করেছে। পরকালের প্রতি আল-কোরানের গুরুত্বারোপ নানা আঙ্গিকে প্রকাশ পেয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো- আল্লাহ তাআলা বহু জায়গায় পরকালের প্রতি ঈমানকে তাঁর প্রতি ঈমানের সঙ্গে সংযুক্ত করে উল্লেখ করেছেন। যেমন,

يَا اللَّهُ أَمَنْ مَنْ الْبَرُّ وَلَكِنَّ

الْآخِرِ وَالْيَوْمِ

বরং ভালো কাজ হল যে ঈমান

আনে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি...'- (সূরা আল বাকারা , ১৭৭)।

অন্যত্র এসেছে , وَعَمِلَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ يَا اللَّهُ أَمَنْ مَنْ يَخْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ فَخْوٌ وَلَا رَبَّهُمْ عِنْدَ أَجْرِهِمْ فَلَهُمْ صَالِحًا

যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ ও

আখিরাতের দিনের প্রতি এবং নেক কাজ করেছে - তবে তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট তাদের প্রতিদান । আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না'- (সূরা আল বাকারা , ৬২)।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন , يَا اللَّهُ يُؤْمِنُ مِنْكُمْ كَانِ مَنْ بِهِ يُوعَظُ ذَلِكَ , الْآخِرِ وَالْيَوْمِ

এটা উপদেশ তাকে দেয়া

হচ্ছে, যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে' (সূরা আল বাকারা , ২৩২)।

অন্যত্র বলেছেন , الْآخِرِ بِالْيَوْمِ وَلَا يَا اللَّهُ يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ قَاتِلُوا ,

তোমরা লড়াই কর সে সব লোকের সঙ্গে যারা আল্লাহ

ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না '- (সূরা আত তাওবা , ২৯)।

তিনি আরও বলেন , الْأَرْضِ فِي تَعْتُوا وَلَا الْآخِرِ الْيَوْمِ وَارْجُوا اللَّهَ الْعَبْدُو , مُفْسِدِينَ

তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, শেষ দিবসের আশা

কর এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না'- (সূরা আল কাবুত , ৩৬)।

আল-কোরানে এ জাতীয় আয়াত প্রচুর। পরকালের প্রতি আল-কোরানের গুরুত্বারোপের আরেকটি দিক হলো- অধিক পরিমাণে শেষ দিবসের কথা উল্লেখ করা। এমনকি আল-কোরানের এমন কোনো পৃষ্ঠা খোঁজে পাওয়া হয়ত দুষ্টর হবে, যেখানে শেষ দিবসের উল্লেখ নেই অথবা শেষ দিবসে যা ঘটবে, নানা পদ্ধতিতে তার উল্লেখ নেই। উপরন্তু আল কোরান পরকালের অবস্থা এমন বিশিষ্ট আকারে উপস্থাপন করে যে অন্যকোনো গায়েবি বিষয় এত বিশদ আকারে উপস্থাপন করে না। অন্য আরেকটি দিক হলো- শেষ দিবসকে বহু নামে উপস্থাপন করা। এ সব নামের প্রত্যেকটি শেষদিবসে ঘটিতব্য এক-একটি ভয়ঙ্কর বিষয়কে

নির্দেশ করে। যেমন , আল কিয়ামাহ, আস-সা'আহ, আল আখেরাহ, ইয়াউমুদ্দীন, যাউমুল হিসাব, যাউমুল ফাতহ, যাউমুতলাক, যাউমুল জামই, যাউমুতাগাবুন, যাউমুল খুলুদ, যাউমুল খুরুজ, যাউমুল হাসরাহ, যাউমুতানাদ, আল আযেফাহ, আতান্নাহ, আন্সাম্মাহ, আল হাক্বাহ, আল গাশিয়া, আল ওয়াকিয়াহ ইত্যাদি। ঈমানের এই রোকনের প্রতি আল-কোরানের এই গুরুত্বারোপের হিকমত হলো, মানবজীবনে শেষ দিবসের প্রতি ঈমানের সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। শেষ দিবস এবং তাতে থাকা জান্নাত-জাহান্নাম, হিসাব-শাস্তি-ছাওয়াব ইত্যাদির বিশ্বাস মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করা, তাকে সুশৃঙ্খল করা, তাকে তাকওয়া ও সংকাজ আঁকড়ে ধরে থাকতে উৎসাহদান ইত্যাদির ক্ষেত্রে সীমাহীন প্রভাব ফেলে। যে ব্যক্তি পরকালে বিশ্বাস করে না, মনে করে না যে কথা ও কর্মের হিসাব দিতে হবে- এরূপ ব্যক্তিকে কেবল তার পার্থিব স্বার্থই পরিচালিত করে। এ ব্যক্তির মাঝে এবং যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, মানুষকে একদিন অতিশয় ইনসাফগার স্রষ্টার সামনে সকল কাজ ও কথার হিসাব দিতে হবে, যার পর তাকে ভালো কাজের উত্তম প্রতিদান এবং মন্দ কাজের শাস্তি প্রদান করা হবে- এই দু-ব্যক্তির মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। প্রথম ব্যক্তির নিজের খেয়াল-খুশি ও খায়েশ ছাড়া অন্যকোনো নিয়ন্ত্রক থাকে না। তার উদ্দেশ্য থাকে আমিছ-কেন্দ্রিক উদ্দেশ্য, যা হাসিলের জন্য যে-কোনো মাধ্যম, চরিত্র ও কাজকে অবলম্বন করা বৈধ বলে ভেবে নেয়, তার ক্ষতি যাই হোক না কেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি সত্য ও কল্যাণের সীমানায় নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। আল্লাহর কাছে সেদিন এ সব বিষয়ের ওজন ও মূল্য রয়েছে। যেমন---

فَأُولَٰئِكَ مَوَازِيئُهُ ثَقُلَتْ فَمَنْ الْحَقُّ يَوْمَئِذٍ وَالْوِزْنُ ,
بِمَا أَنْفُسُهُمْ خَسِرُوا الَّذِينَ فَأُولَٰئِكَ مَوَازِيئُهُ خَفَّتْ وَمَنْ . الْمُفْلِحُونَ هُمْ
يُظْلِمُونَ بِآيَاتِنَا كَانُوا

আর সেদিন পরিমাপ হবে যথাযথ। সুতরাং যাদের পাল্লা ভারি হবে তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই হবে সেই সব লোক, যারা নিজদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কারণ তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি (অস্বীকার করার মাধ্যমে) জুলুম করত' - (সূরা আল আরাফ , ৮০৯)।

বহু জায়গায় শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস ও সং কাজের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টির কুরআনিক এ পদ্ধতির উদাহরণ খোঁজে পাওয়া যায়। যেমন

. بِالَّذِينَ يُكَذِّبُ الَّذِي أَرَأَيْتَ ,
مِسْكِينَ أَلْ طَّعَامِ عَلَى يَحْضُ وَلَا . الْيَتِيمَ يَدْعُ الَّذِي فَذَلِكَ

তুমি কি তাকে দেখেছ, যে হিসাব-প্রতিদানকে অস্বীকার করে? সে-ই ইয়াতীমকে কঠোরভাবে তাড়িয়ে দেয়, আর মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না' - (সূরা আল-মাউন , ১-৩)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ,

يَا اللَّهُ أَمِنْ مَنْ اللَّهُ مَسَاجِدَ يَعْمُرُ إِنَّمَا
الْآخِرِ وَالْيَوْمِ

একমাত্র তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে' - (সূরা আত-তাওবা , ১৮)।

يَا اللَّهُ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُكَ لَا
بِالْمُتَّقِينَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَأَنْفُسِهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ يُجَاهِدُوا أَنْ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ
فُلُوبُهُمْ وَارْتَابَتْ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ يَا اللَّهُ يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُكَ إِنَّمَا
يَتَرَدَّدُونَ رِيهِمْ يَفِ قَهُمْ

যারা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসে ঈমান রাখে, তারা তোমার কাছে তাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকার অনুমতি চায় না, আর আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত। একমাত্র সে সব লোক অনুমতি

চায় যারা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসে ঈমান রাখে না, আর তাদের অন্তরসমূহ সংশয়গ্রস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং তারা তাদের সংশয়েই ঘুরপাক খেতে থাকে’ – (সূরা আত-তাওবা , ৪৪-৪৫)।

যেহেতু মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হলো নিজের স্বার্থ ও কল্যাণ অনুসন্ধান করা এবং ক্ষতিকারক বিষয় থেকে দূরে অবস্থান করা, তাই বলা বাহুল্য যে পরকালের প্রতি বিশ্বাস তার এ প্রবৃত্তিকে শানিতকারী এক বিশ্বাস, যা মানুষকে কল্যাণে উৎসাহী এবং অকল্যাণে নিরুৎসাহী করে তোলে। এ কারণেই আল কোরান পরকালকে অতিমাত্রায় উল্লেখ করেছে এবং নানাভাবে তা চিত্রিত করেছে, যাতে এই মনোবৃত্তিটি মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে বসে যায় এবং এর প্রভাব প্রচন্ডতা পায়। পরকাল অতিমাত্রায় উল্লেখ করার আরেকটি হেঁকমত এটা হতে পারে যে, মানুষ পরকালকে খুব বেশি ভুলে যায়, পরকাল সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে- দুনিয়ার সঙ্গে অতি সম্পৃক্ততার কারণে, দুনিয়ার ধনরত্নের মহববত-ভালোবাসার কারণে। অতএব পরকাল এবং তাতে যে-আজাব ও নেয়ামত রয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস দুনিয়াপ্ৰীতির অতিরঞ্জনকে লাঘব করে। বান্দাদের এ কথা শেখায় যে দুনিয়ার সকল চাকচিক্য ও খাহেশাত এতটুকু শ্রম মেহনত-প্রতিযোগিতার উপযোগী নয়। বরং যার জন্য শ্রম চেষ্টা ব্যয় করতে হবে, তা হলো ওই পরকালীন জীবনে আল্লাহ তাআলা যেসব নায-নেয়ামত রেখেছেন তা অর্জনে মরিয়া হয়ে সাধনা করে যাওয়া। এ অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করেই ইরশাদ হয়েছে ,

مَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
أَرْضِيئُكَ الْأَرْضِ إِلَى اتَّقَلْتُمْ اللَّهَ سَبِيلِي فِي انْفِرُوا لَكُمْ قِيلَ إِذَا لَكُمْ
إِلَّا الْآخِرَةُ فِي الدُّنْيَا الْحَيَاةِ مَتَاعٌ فَمَا الْآخِرَةُ مِنَ الدُّنْيَا بِالْحَيَاةِ
قَلِيلٌ

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন তোমরা জমিনের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়? তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য’ (সূরা আত-তাওবা , ৩৮)।

শেষ দিবস প্রসঙ্গ বারবার উল্লেখ করার আরেকটি কারণ এটা হতে পারে যে, শেষ দিবস, অতীতের যেমন বর্তমানেও তেমনি, কাফেরদের কাছে বিস্ময়কর বস্তু হিসেবে থেকেছে ও থাকছে; কারণ তারা তাদের স্থূল দৃষ্টিতে দেখে যে মানুষ মরে গিয়ে মাটি ও হাড়িতে পরিণত হয়। আল্লাহ তাআলা এদের সম্পর্কে বলেন,

الْمَجِيدِ وَالْقُرْآنِ ق
عَجِيبٌ شَيْءٌ هَذَا الْكَافِرُونَ فَقَالَ مِنْهُمْ مُنْذِرٌ جَاءَهُمْ أَنْ عَجِبُوا بَلْ
كَافٍ; মর্যাদাপূর্ণ কুরআনের কসম।

বরং তারা বিস্মিত হয়েছে যে, তাদের মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী তাদের কাছে এসেছে। অতঃপর কাফিররা বলল, ‘এতো এক বিস্ময়কর বস্তু’! ‘আমরা যখন মারা যাব এবং মাটিতে পরিণত হব তখনো কি (আমরা পুনরুত্থিত হব)? এ ফিরে যাওয়া সুদূরপর্যন্ত’ (সূরা কাফ , ১-৩)।

পরকালের অকাট্য বাস্তবতার মোকাবিলায় কাফেরদের উল্লিখিত অনুভূতি যে একেবারেই ভিত্তিহীন তা বহু আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। এ বিষয়ক কয়েকটি আয়াত পরবর্তীতে উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ। পরকাল অস্বীকারকারীদের ধারণা অবাস্তব এ কারণে যে পুনরুত্থানের বহু উদাহরণ মানবজীবনে অতুচ্ছলভাবে পরিলক্ষিত। তাই তো বলা হয় যে, চর্মচক্ষু অন্ধ হয় না, মূলত যা অন্ধ হয় তা হলো অন্তরচক্ষু।

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ২৯ : শেষ দিবসের প্রতি ঈমানের দলিল ও
অস্বীকারকারীদের সন্দেহের জবাব

শেষ দিবসের প্রতি ঈমানের দলিল ও অস্বীকারকারীদের সন্দেহের জবাব

মহাগ্রন্থ আল কোরান এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানায়। আকল ও স্বচ্ছ মানবপ্রকৃতিও শেষ দিবসের প্রতি ঈমানের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে শেষ দিবসের প্রতি ঈমানের কথা অধিক হারে উল্লেখ করেছেন। শেষ দিবস যে আসছে, সে ব্যাপারে আল কোরান বহু দলিল পেশ করেছে। যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তাদের সংশয়-সন্দেহের যথোপযুক্ত জবাব দিয়েছে। শেষ দিবসে যা যা হবে তার বিস্তারিত বর্ণনা আল-কোরানে এমনভাবে দেয়া হয়েছে যে, পূর্বের আসমানি কিতাবসমূহের কোনোটিতেই তার তুলনা খোঁজে পাওয়া যায় না। যদিও প্রত্যেক রাসূলই তাঁর কাওমকে এ দিবস সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন ও সতর্ক করেছেন। যারা এ দিবসকে অস্বীকার করে অথবা এ দিবস সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে তাদের তারা কাকের বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

‘ فِيهِ رَيْبٌ لَا الْقِيَامَةَ مَيُّوْ إِلَى لِيَجْمَعَنَّكُمْ هُوَ إِلَّا إِلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে একত্র করবেন
কিয়ামতের দিনে। এতে কোন সন্দেহ নেই’ - (সূরা আন-নিসা , ৮৭)।
অন্যত্র এসেছে,

مَنْ الْبِرِّ وَلَكِنْ وَالْمَغْرِبِ الْمَشْرِقِ قَبْلَ وَجُوهَكُمْ ثَوَّلُوا أَنْ الْبِرِّ لَيْسَ
‘ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ آمَنْ

ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাবে; বরং
ভালো কাজ হলো যে ঈমান আনে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি..’ - (সূরা আল বাকারা
, ১৭৭)।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন ,

ضَلَالًا ضَلَّ فَقَدْ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَمَلَائِكَتِهِ بِاللَّهِ يَكْفُرُ وَمَنْ
‘ بَعِيدًا

আর যে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং শেষ দিবসকে
অস্বীকার করবে, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হবে’ - (সূরা আন-নিসা , ১৩৬)।

নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর জাতিকে যা বলেছেন, তা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

‘ إخراجًا وَيُخْرِجُكُمْ فِيهَا يُعِيدُكُمْ ثُمَّ . نَبَاتًا الْأَرْضِ مِنْ أَنْبَتَكُمْ وَاللَّهُ

আর আল্লাহ তোমাদেরকে উদগত করেছেন মাটি থেকে’। ‘তারপর তিনি তোমাদেরকে তাতে
ফিরিয়ে নেবেন এবং নিশ্চিতভাবে তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন’ - (সূরা নূহ , ১৭-
১৮)।

আর ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন,

‘ الدِّينِ يَوْمَ خَطِيئَتِي لِي يَغْفِرَ أَنْ أَطْمَعُ وَالَّذِي

আর যিনি আশা করি, বিচার দিবসে আমার ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন’ -
(আশুযারা , ৮২)।

আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামকে লক্ষ্য করে বলেন ,

يَمُذِّنُكَ فَلَا . سَعَىٰ بِمَا نَفْسٌ كُلٌّ لِّتُجْزَىٰ أَخْفِيهَا أَكَادُ آتِيَةِ السَّاعَةِ إِنَّ
فَتَرْدَىٰ هَوَاهُ وَاتَّبَعَ بِهَا يُؤْمِنُ لَا مَنْ غَنَاهَا

নিশ্চয় কিয়ামত আসবে; আমি তা গোপন রাখতে চাই যাতে প্রত্যেককে স্বীয় চেষ্টা-সাধনা অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া যায়’। অতএব যে ব্যক্তি তার প্রতি ঈমান রাখে না এবং স্বীয় প্রবৃত্তির

অনুসরণ করে সে যেন কিছুতেই তাতে ঈমান আনয়নে তোমাকে বাধা দিতে না পারে;
অন্যথায় তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে’ - (সূরা তাহা , ১৫-১৬)।

শেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি যেন তাঁর রবের নামে শপথ করে পুনরুত্থান বিষয়টি শক্তভাবে উপস্থাপন করেন। ইরশাদ হয়েছে,

لَتَنبُؤَنَّ ثُمَّ لَتُبْعَنَّ وَرَبِّي بَلَىٰ قُلْ يُبْعَثُوا لَنْ أَنْ كَفَرُوا الَّذِينَ زَعَمَ
يَسِيرُ اللَّهُ عَلَىٰ وَذَلِكَ عَمِلْتُمْ بِمَا

কাফেররা ধারণা করেছিল যে, তারা কখনোই পুনরুত্থিত হবে না। বল, ‘হ্যাঁ, আমার রবের কসম, তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা আমল করেছিলে তা অবশ্যই

তোমাদের জানানো হবে। আর এটি আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ’ - (সূরা আত-তাগাবুন , ৭)।

অতএব যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করল, তারা সকল রাসুলকেই (আ.) অস্বীকার করল। আর রাসুলগণ যা বলেছেন তা সত্য হওয়ার ব্যাপারে বুদ্ধি ও অনুভূতিগত অকাট্য প্রমাণাদি রয়েছে। ফলে রাসুলগণের কথা মিথ্যা সাব্যস্ত করার অর্থ আকল-বুদ্ধিকে অপদস্থ করা, অস্বীকার করা এবং বুদ্ধির বিপক্ষে বিদ্রোহ করা। যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে, তাদের অস্বীকৃতির পক্ষে আদৌ কোনো দলিল নেই; কেননা পুনরুত্থান হলো এক অদৃশ্য বিষয় যার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলাই রাখেন। আর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ এবং তা স্বীকার করার একমাত্র পথ হলো আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত সংবাদ। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বাণী প্রাপ্তির দাবি করছেন, তাঁর দাবি অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে এটাও নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে তিনি এ সব অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে যা বলেছেন তা অকাট্য সত্য। আর এ বিষয়টি কেবল সম্মানিত রাসুলগণের (আ.) জন্যই প্রতিষ্ঠিত; কেননা রাসুলগণ (আ.) যে সত্যবাদী, মুজিয়া প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তিনি তাদের কিছু অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন। আর, ওপরে একথা গিয়েছে যে, সকল রাসুলই (আ.) পরকাল বিষয়ক সংবাদের ব্যাপারে অভিন্ন অবস্থানে ছিলেন। যারা পুনরুত্থান অস্বীকারকারী তারা এ দিবসের অস্তিত্বের ব্যাপারে কিছু সংশয়-সন্দেহ পেশ করে থাকে। যেমন মৃত্যুর পর হাড্ডি ও মাটিতে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার পর একজন মানুষ আবার কীভাবে পুনরুত্থিত হবে, সে বিষয়ে তারা সংশয় ব্যক্ত করেছে। তারা বলেছে ,

وَكُنَّا مِثْنًا أَثْنًا

بَعِيدُ رَجْعُ ذَلِكَ ثَرَابًا

মাটিতে পরিণত হব তখনো কি (আমরা পুনরুত্থিত হব)? এ ফিরে যাওয়া সুদূরপরাহত।

আল্লাহ তাআলা তাদের কথা উল্লেখ করে আরও বলেন ,

إِلَّا هِيَ مَا وَقَالُوا
بِذَلِكَ لَهُمْ وَمَا الدُّهُرُ إِلَّا يُهْلِكُنَا وَمَا وَنَحْيَا نَمُوتُ الدُّنْيَا حَيَاتُنَا
'يَظُنُّونَ إِلَّا هُمْ إِنْ عَلِمَ مِنْ

আর তারা বলে, 'দুনিয়ার জীবনই আমাদের একমাত্র জীবন।

আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই। আর কাল-ই কেবল আমাদের ধ্বংস করে।' বস্তুত এ

বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা শুধু ধারণাই করে' - (সূরা আল জাছিয়া , ২৪)।

পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের সংশয়-সন্দেহের দলিল হলো বিষয়টিকে আশ্চর্যজনক, বিস্ময়কর ও সুদূরপরাহত মনে করা। আল্লাহ তাআলা তাদের এ সন্দেহ রদ করেছেন এবং আল-

কোরানের একাধিক জায়গায় এর অসারতা তুলে ধরেছেন। তিনি তাদের জন্য এ কথা স্পষ্ট

করেছেন যে, পুনরুত্থান এমন কোনো বিষয় নয়, যা মানববুদ্ধি অস্বীকার করতে পারে।

বরং মানববুদ্ধি তা সমর্থন করে। উপরন্তু মানবজীবনে এমন বহু ঘটনা রয়েছে যা

পুনরুত্থানের সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য বহন করে। যেমন ,

كُنَّا أَئِدًا وَقَالُوا
أَوْ حِجَارَةً كُوتُوا قُلْ . جَدِيدًا . اخْلُقْ لِمَبْعُوثُونَ أَئِدًا وَرُفَاتًا عِظَامًا
قُلْ يُعِيدُنَا مَنْ فَيَسْأَلُونَ صُدُورَكُمْ فِي يَكْبُرُ مِمَّا خَلَقْنَا أَوْ . حَدِيدًا
قُلْ هُوَ مَتَى وَيَقُولُونَ رُءُوسَهُمْ إِلَيْكَ فَسَيُفْضَلُونَ مَرَّةً أَوَّلَ فَطَرَكُمْ الَّذِي
عَسَى
لَيُثْبِتُنَّ إِنْ وَتَظُنُّونَ بِحَمْدِهِ فَتَسْتَجِيبُونَ يَدْعُوكُمْ يَوْمَ . قَرِيبًا يَكُونُ أَنْ
قَلِيلًا إِلَّا .

আর তারা বলে, 'যখন আমরা হাড়িতে পরিণত হব ও ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাব, তখন কি
আমরা নতুন সৃষ্টিক্রমে পুনর্জীবিত হব? বল, 'তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহা,
অথবা এমন কোনো সৃষ্টি,

যা তোমাদের অন্তরে বড় মনে হয়।' তবুও তারা বলবে, 'কে আমাদের পুনরায় (সৃষ্টি)

করবে?' বল, 'যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন।' অতঃপর তারা তোমার সামনে
মাথা নাড়বে এবং বলবে,

'কবে এটা?' বল, আশা করা যায় যে, তা নিকটেই হবে।' 'যেদিন তিনি তোমাদের

ডাকবেন, তখন তাঁর প্রশংসার সাথে তোমরা সাড়া দেবে। আর তোমরা ধারণা করবে,

অল্প সময়ই তোমরা অবস্থান

করেছিলে' - (সূরা আল ইসরা, ৪৯-৫২)।

পুনরুত্থান অস্বীকারকারীরা যেসব সন্দেহ উপস্থাপন করল এবং যুগযুগান্তরে যেসব সন্দেহ
উপস্থাপন করে থাকে, তার খোলাসা হলো- হাড়ি ও মাটিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পর
আল্লাহ তাআলা মানবশরীরকে নতুনভাবে কীভাবে জীবন্ত শরীরে রূপান্তরিত করবেন, যা
ফিরে পাবে অনুভব অনুভূতিসহ সব কিছুর? তারা বিষয়টিকে আল্লাহর ক্ষমতার চেয়েও বড়
মনে করে। তারা এ কারণেও শেষ দিবসকে অস্বীকার করে যে, দিবসটি কখন সংঘটিত

হবে, সে বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই। এ প্রকৃতির সংশয়-সন্দেহ জীবন-মৃত্যুর বাস্তবতা

সম্পর্কে অজ্ঞানতা, আল্লাহর কুদরত বিষয়ে উদাসীনতা, অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্বদানে আল্লাহ

তাআলার যে অফুরান ক্ষমতা রয়েছে, তা দেখেও না দেখার ভান করা থেকে উদ্ধৃত।

তাদের জ্ঞানবুদ্ধি সজীব থাকলে এটা বোঝা কষ্টকর হত না যে, তাদের প্রথম সৃষ্টি আল্লাহ

তাআলাই করেছেন, তাদের তিনি অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্ববান করেছেন। অতএব

আল্লাহ তাআলা পরকাল, হিসাবনিকাশ, আজাব ও ছাওয়াবের কথা যা বলেছেন, সে

ব্যাপারেও যে তিনি সত্যবাদী তা তাদের বিশ্বাস করা আবশ্যিক। বিষয়টি অত্যন্ত সহজ এবং

এর যুক্তিও অকাট্য; কেননা মানুষ অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে এসেছে, যা প্রমাণ করে যে, এমন একজন ব্যবস্থাপক স্রষ্টা আছেন, যিনি তাকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্ববান করেছেন। এরপর সে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। অতএব কে তার অবস্থার রূপান্তর ঘটাল? নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, যিনি তাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। আর তাই যখন সৃষ্টিকর্তা সংবাদ দেবেন যে, তিনি তার সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন তখন সৃষ্টিকর্তার এ কর্মকে অস্বীকার করা ঔদ্ধত্য বই অন্য কিছু নয়।

২- ইরশাদ হয়েছে,

ثُمَّ يُخَيِّبُكُمُ اللَّهُ قُلُ
النَّاسِ أَكْثَرُ وَلَكِنَّ فِيهِ رَيْبٌ لَا الْقِيَامَةِ يَوْمَ إِلَى يَجْمَعُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ
يَعْلَمُونَ لَا

বল, 'আল্লাহই তোমাদের

জীবন দেন তারপর তোমাদের মৃত্যু ঘটান। তারপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিনে একত্র করবেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না' - (সূরা আল জাছিয়া ,

২৭)।

مَثَلًا لَنَا وَضَرَبَ
الَّذِي يُخَيِّبُهَا قُلُ . رَمِيمٌ وَهِيَ الْعِظَامُ يُخَيِّبُ مَنْ قَالَ خَلَقَهُ وَنَسِيَ
الشَّجَرِ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي . غَلِيمٌ خَلَقَ بِكُلِّ وَهُوَ مَرَّةً أَوَّلَ أَنْشَأَهَا
السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِي أُولَئِكَ . ثَوَقِدُونَ مِنْهُ ثُمَّ أَذْ فَاذَا نَارًا الْأَخْضَرِ
عَلَى يَقَادِرِ وَالْأَرْضِ
الْعَلِيمِ الْخَلْقُ وَهُوَ بَلَى مِثْلَهُمْ يَخْلُقُ أَنْ

আর সে আমার উদ্দেশে

উপমা পেশ করে, অথচ সে তার নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, 'হাড়গুলো জরাজীর্ণ হওয়া অবস্থায় কে সেগুলো জীবিত করবে'? বল, 'যিনি প্রথমবার এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই

সেগুলো পুনরায়

জীবিত করবেন। আর তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কেই সর্বজ্ঞাত। যিনি সবুজ বৃক্ষ থেকে তোমাদের জন্য আগুন তৈরি করেছেন। ফলে তা থেকে তোমরা আগুন জ্বালাও। যিনি আসমানসমূহ ও জমিন

সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, তিনিই মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী' - (সূরা ইয়াসীন , ৭৮-৮১)।

আল আকীদা আত্-তাহাবিয়া'-র ব্যাখ্যাকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'যদি মানুষের মধ্যে সমধিক জ্ঞানী, সমধিক বিশুদ্ধভাষী ও সেরা সাহিত্যিক- সংক্ষিপ্ততা, স্পষ্টতা ও যুক্তির বিশুদ্ধতার বিচারে আল-কোরানের এই যুক্তির চেয়ে উত্তম অথবা সমপর্যায়ের কোনো যুক্তি নিয়ে আসার চেষ্টা করে, তবে সে নির্ধাত ব্যর্থ হবে; কেননা আল্লাহ তাআলার উল্লিখিত যুক্তিটি এভাবে পেশ করেছেন যে, প্রথমে তিনি নাস্তিকের একটি প্রশ্ন উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি, 'অথচ সে তার নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়' উল্লেখ করে প্রাথমিকভাবে তার অকাট্য জবাব দিয়ে দিয়েছেন। এরপর তিনি যুক্তিকে আরও সুসংহত করার জন্য বলেছেন, 'বল, 'যিনি প্রথমবার এগুলো সৃষ্টি করেছেন তিনিই সেগুলো পুনরায় জীবিত করবেন।' অর্থাৎ এখানে তিনি প্রথম সৃষ্টিকে পুনরায় সৃষ্টির দলিল হিসেবে পেশ করেছেন; কারণ, বুদ্ধি-বিবেচনা রয়েছে এমন যে কোনো ব্যক্তিই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই জানে যে, যিনি প্রথমটি সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি দ্বিতীয়টি করতেও সক্ষম হবেন। আর যদি দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে অপারগ হন, তাহলে প্রথমটির ক্ষেত্রে আরও অধিক মাত্রায় অপারগ হওয়ার কথা ছিল। আর যেহেতু সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার একটি দাবি হলো, সৃষ্টিজীবের ওপর সীমাহীন ক্ষমতা থাকা, সৃষ্টি-প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান থাকা, অতএব তিনি বলেছেন যে, 'তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কেই সর্বজ্ঞাত'। অর্থাৎ তিনি প্রথম সৃষ্টির সকল অংশ,

কাঁচামাল ও আকৃতি সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত। অতএব তাঁর জন্য পুনরায় সৃষ্টি একটি অতি সহজ ব্যাপার। উপরন্তু আল্লাহ তাআলা যেহেতু সর্বজ্ঞাতা, অফুরন্ত ক্ষমতার অধিকারী, তাই তার পক্ষে জরাজীর্ণ হাড়ি জীবিত করা কী করে অসম্ভব হতে পারে? এরপর তিনি শক্তভাবে আরেক নাস্তিকের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো এরকম যে, হাড়ি যখন জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন তা ঠান্ডা ও শুষ্ক হয়ে যায়। আর জীবনস্পন্দনের জন্য প্রয়োজন গরম ও তাজা পদার্থের। আল্লাহ তাআলা এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, ‘যিনি সবুজ বৃক্ষ থেকে তোমাদের জন্য আগুন তৈরি করেছেন। ফলে তা থেকে তোমরা আগুন জ্বালাও।’ আল্লাহ তাআলা এখানে যে বিষয়টি বলেছেন, তা হলো- তিনি একটি প্রচলিত গরম ও শুকনো আগুন এমন একটি জিনিস থেকে বের করেন যা হলো আর্দ্রতায় ভরপুর ও ঠান্ডা। অতএব যিনি কোনো জিনিস থেকে ঠিক তার বিপরীতটি বের করতে পারেন এবং যার নির্দেশ মানতে সকল সৃষ্টিই বাধ্য, তিনিই তো পুনরুত্থান ঘটাবেন, যা নাস্তিক অস্বীকার করছে। দলিলটিকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে, এই বলে যে, যিনি অতি কঠিন ও সুবিশাল কাজ করতে পারেন, তিনি অতি সহজ কাজও করতে পারেন। যে ব্যক্তি পঞ্চাশ কেজি বহন করতে পারে, সে পাঁচ কেজি অবশ্যই বহন করতে পারবে। এ দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন?’ অতএব যিনি সুবিশাল আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তিনি অবশ্যই, হাড়ি জরাজীর্ণ হয়ে গেলে, তাকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম হবেন।’ [শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ পৃ. ৪৬০-৪৬১]

৩ - আল্লাহ তাআলা বলেছেন ,

أَيُّهَا بَا
مِنْ تَمَّ ثَرَابٍ مِنْ خَلْقِنَاكُمْ فَإِنَّا الْبَعْثُ مِنْ رَبِّ فِي كُنْتُمْ إِنَّ النَّاسَ
وَنُقِرُّ لَكُمْ لِنَبِيِّنَ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ مُضَعَّةٍ مِنْ تَمَّ عِلْقَةٍ مِنْ تَمَّ نُطْقَةٍ
لِتَبْلُغُوا تَمَّ طِفْلاً نُخْرِجُكُمْ تَمَّ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَى نَشَاءٍ مَا الْأَرْحَامُ فِي
مَنْ وَمِنْكُمْ أَشَدُّكُمْ
شَيْئًا عِلْمٍ بَعْدٍ مِنْ يَعْلَمَ لِكَيْلَا الْعُمْرُ أُرْذَلِ إِلَى يُرَدُّ مَنْ وَمِنْكُمْ يُتَوَفَّى
وَأَنْبِئْتُ وَرَبَّتْ اهْتَزَّتْ الْمَاءَ عَلَيْهَا أَنْزَلْنَا فَإِذَا هَامِدَةٌ الْأَرْضُ وَتَرَى
وَأَنَّهُ الْمَوْتَى يُحْيِي وَأَنَّهُ الْحَقُّ هُوَ اللَّهُ يَأْنِ ذَلِكَ . بَهِيحَ زَوْجٍ كُلِّ مِنْ
قَدِيرٍ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى
‘ . الْقُبُورِ فِي مَنْ يَبْعَثُ اللَّهُ وَأَنْ فِيهَا رَبِّبَ لَا آتِيَةِ السَّاعَةِ وَأَنْ

হে মানুষ!

যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দেহে থাক, তবে নিশ্চয়ই জেনে রেখো, আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্র থেকে, তারপর আলাকা [علقة] মানে যুক্ত ও ঝুলন্ত বস্তু।

পূর্ববর্তী তাফসির কারকদের অনেকে এর অর্থ করেছেন রক্তপিণ্ড। তবে আধুনিক জীববিজ্ঞানীদের মতে, পুরুষের শুক্র ও নারীর ডিম্বানু মিলিত হয়ে মাতৃগর্ভে যে ভ্রূণের সৃষ্টি হয় তা পরে জরায়ু গাত্রে সংযুক্ত

হয়ে পড়ে। এ জন্য ‘আলাকা শব্দের অনুবাদ এখন করা হয়, এমন কিছু যা যুক্ত হয়ে যাবে।] থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট অথবা অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট গোশত থেকে। তোমাদের নিকট বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে

বর্ণনা করার নিমিত্তে। আর আমি যা ইচ্ছা করি, তা একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত মাতৃগর্ভে অবস্থিত রাখি। অতঃপর আমি তোমাদের শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা যৌবনে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে

কারো কারো মৃত্যু দেয়া হয় এ বয়সেই, আবার কাউকে কাউকে ফিরিয়ে নেয়া হয় হীনতম বয়সে, যাতে সে জ্ঞান লাভের পরও কিছু না জানে। তুমি জমিনকে দেখতে পাও

শুষ্কাবস্থায়, অতঃপর যখনই আমি

তাতে পানি বর্ষণ করি, তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সকল প্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ। এটি এজন্য যে, আল্লাহই সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনিই সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আর কিয়ামত আসবেই, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং যারা কবরে আছে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের পুনরুত্থিত করবেন’ - (সূরা আল হাঙ্গ , ৫-৭)।

আয়াতগুলোতে পুনরুত্থানের দলিল এবং আল্লাহ তাআলা মৃতকে জীবিত করার যে সীমাহীন ক্ষমতা রাখেন, তার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, যা এ বিষয়ক সংশয়-সন্দেহ ও প্রশ্নের জবাব সরবরাহ করে। অতএব উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে আমরা নিম্নবর্ণিত দলিল ও শিক্ষাসমূহ পাই-

ক - আয়াতগুলোর শুরুতে আমরা যে দলিলটি পাই, তা হলো মানবসৃষ্টির আরম্ভ এবং মাটি দ্বারা তার সৃষ্টির শুরু বিষয়ক দলিল। আর মাটি হলো নিজেই এক পদার্থ।
খ- মানব সৃষ্টিতে আল্লাহর ক্ষমতার একটি নিদর্শন প্রদর্শিত হয়েছে। তিনি মানুষকে এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে নিয়ে যান। এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত করেন, যা প্রথম অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি শুক্র থেকে মানুষকে আলাকায় রূপান্তরিত করেন। এরপর মাংসপিণ্ডে রূপান্তরিত করেন। এরপর তা থেকে কান ও চোখ বের করেন। অনুভূতি, শক্তি, হাড্ডি, স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদি সংযুক্ত করেন। এরপর তিনি তার সৃষ্টিকে চূড়ান্তভাবে সুসংহত করেন। পরিশেষে তিনি তাকে অতি সুন্দর আকৃতি ও অবকার্যামোয় মাতৃগর্ভের বাইরে নিয়ে আসেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন

‘تَفْوِيمٍ أَحْسَنَ فِي الْإِنْسَانِ خَلَقْنَا لَقَدْ ,
সর্বোত্তম গঠনে’ - (সূরা আত-তীন , ৪)।

যে সত্তা মানুষকে এভাবে সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তিনি তাকে পুনরায় অস্তিত্ববান করতে কীভাবে অক্ষম হতে পারেন? এটা তো কেবলই এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত করা মাত্র। অস্বীকারকারীরা তো এর উদাহরণ নিজ অস্তিত্বে ও জমিনের সকল মানুষের মাঝেই দেখতে পাচ্ছে। সাইয়েদ কুতুব রা. উপরোক্ত আয়াতগুলো ব্যাখ্যা করার পর একটি সূক্ষ্ম অর্থের প্রতি ইশারা করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘মাতৃগর্ভে মানবশিশু যে পর্যায়গুলো একের পর এক পেরিয়ে যায় এবং পরিশেষে আলোর মুখ দেখে, বিষয়টি এ দিকে ইঙ্গিত করে যে, যিনি এ সব পর্যায় পার করালেন, তিনি মানুষকে আগত পর্যায়ে পূর্ণঙ্গতম অস্তিত্ব দান করবেন; কারণ মানুষ এ পৃথিবীর জীবনে পূর্ণঙ্গ পর্যায়ে পৌঁছতে সমর্থ নয়। সে কখনো দাঁড়ায়, কখনো পেছনে ফিরে যায়। এমনকি এক পর্যায়ে সে ইতোপূর্বে জ্ঞানী থাকার পরও জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে। অতএব মানুষের প্রয়োজন অন্য একটি জগৎ যাতে তার অস্তিত্ব সর্বোচ্চ পূর্ণতা পাবে। মানব সৃষ্টির উল্লিখিত পর্যায়সমূহ দু’ভাবে পুনরুত্থানকে নির্দেশ করে। প্রথমটি হলো- যিনি মানুষকে প্রথমবার সৃষ্টি করতে ক্ষমতাবান তিনি তাকে পুনরায় সৃষ্টি করতেও সক্ষম। আর তা পুনরুত্থানকেও নির্দেশ করে। কেননা যিনি মানবসৃষ্টির ব্যবস্থাকারী, তিনি মানব অস্তিত্বকে পূর্ণঙ্গতম পর্যায়ে পৌঁছে দেবেন, এটাই স্বাভাবিক। আর এভাবেই সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির ঐশী নীতি একত্র হয়। জীবন ও পুনরুত্থানের ঐশী নীতি একত্র হয়। হিসাব ও প্রতিদানের ঐশী নীতি একত্র হয়। আর এ সবই সর্বব্যবস্থাপক সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের পক্ষে সাক্ষ্য বহন করে, যার অস্তিত্বের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন হতে পারে না। [ফী যিলালিল কুরআন ৫/৫৮৩]

মানব সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় এবং শুক্র থেকে আলাকা পর্যায় উল্লীত হওয়ার প্রক্রিয়ায় আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো- যারা পুনরুত্থান অস্বীকার করে তাদের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট করা যে, এই ঐশী কাজটির প্রমাণ হিসেবে তাদের অস্তিত্ব ও অন্যান্য সকল মানুষের অস্তিত্বই যথেষ্ট; কারণ প্রতিটি মানুষই পূর্ণ আকৃতির মানুষ হিসেবে অস্তিত্ব লাভের পূর্বে নিকৃষ্ট ও গন্ধযুক্ত ঘন পানিতে থাকা শুক্র ছিল, যা মূল্যহীন। এরপর সে আলাক ও মাংসপিণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছে, যার কোনো মানবিক আকার ছিল না। আর এ সবই হলো নিকৃষ্ট পর্যায়, যেখানে তার অস্তিত্ব ছিল, বলা যায়, মৃতের মত। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাতে জীবনীশক্তি সঞ্চার করেন। তা আকৃতিসর্বস্ব করেন। তাতে জীবনের উপকরণ-প্রকরণ রাখেন। পরিশেষে মানুষ পূর্ণাঙ্গ আকৃতি ধারণ করে এমন এক অস্তিত্ব লাভ করে, যা চিন্তা করতে পারে, অনুভব করতে পারে, কথা বলতে পারে, ঝগড়া করতে পারে। আল্লাহ তাআলার এই সৃষ্টিকর্ম, মৃতকে জীবিত করার সঙ্গে কতই না সাদৃশ্যপূর্ণ।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন , *عَلَقَهُ كَانَ ثُمَّ . يُمْنَى مَنًى مِنْ نُطْقَةٍ يَكُ أَلَمٌ , فَسَوَى فَخَلَقَ يَقَادِرُ ذَلِكَ الْيَس . وَالْأُنْثَى الذَّكَرَ الزَّوْجَيْنِ مِنْهُ عَلَفَج . فَسَوَى فَخَلَقَ* 'সে কি বীর্যের শুক্রবিন্দু ছিল না যা স্থলিত হয়? অতঃপর সে 'আলাকায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন জোড়ায় জোড়ায় পুরুষ ও নারী। তিনি কি মৃতদের জীবিত করতে সক্ষম নন?' - (সূরা আল কিয়ামা , ৩৭-৪০)।

গ - উল্লিখিত আয়াতসমূহে, পুনরুত্থান ও মৃতকে জীবিত করার আরেকটি দলিল হলো- এই বিরানভূমি, যাতে জীবনের কোনো লক্ষণ খোঁজে পাওয়া যায় না, যাতে কোনো কিছু উৎপন্ন হয় না, আল্লাহ তাআলা যখন তা বৃষ্টি দ্বারা সিক্ত করেন, তখন তাতে জীবনম্পন্দন শুরু হয়, শস্য ও রকমারি উদ্ভিদ উদ্ভূত হয়, যার একটি অন্যটি থেকে ভিন্ন। আর সেসব থেকে বের হয়ে আসে নানা আকৃতি-প্রকৃতি-স্বাদ-গন্ধযুক্ত শস্য ও ফলফলাদি। যেমন

আল্লাহ তাআলা বলেন , *شَيْءٌ كُلٌّ عَلَى إِنَّهُ الْمَوْتَى لَمْخِي أَحْيَاهَا الَّذِي إِنَّ , قَدِيرٌ* 'নিশ্চয়ই যিনি জমিনকে জীবিত করেন তিনি মৃতদেরও জীবিতকারী। নিশ্চয় তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান' - (সূরা ফুসসিলাত , ৩৯)।

ঘ - ইরশাদ হয়েছে, *لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتُمْ غَبْنَا قُنَاكُمْ خَلَدَ أَنْمَا أَفْحَسِبْتُمْ ثَرْجَعُونَ* 'তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে কেবল অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না?' - (সূরা আল মুমিনুন , ১১৫)। তিনি আরও বলেন , *سُدَى يُثْرَكَ أَنْ الْإِنْسَانَ أَيْحَسِبُ ,* 'মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে?' - (সূরা আল কিয়ামা , ৩৬)।

উল্লিখিত দুটি আয়াত এবং এ অর্থের অন্যান্য আয়াত যে বিষয়টিকে তাগিদ করে, তা হলো- পরকাল, হিসাব, প্রতিদান ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস মূলত আল্লাহ তাআলাকে তাঁর পূর্ণাঙ্গ গুণাবলি এবং আসমায়ে হুসনায় অদ্বিতীয় হিসেবে বিশ্বাস করা থেকে উদ্ভূত একটি বিশ্বাস। আর তাই, পরকালের প্রতি ঈমান-বিষয়ক রোকনটি প্রথম রোকনের একটি আবশ্যিক দাবি। অতএব যে ব্যক্তি এ রোকনটি অস্বীকার করবে, সে মুমিন থাকবে না। সে বরং আল্লাহর গুণাবলি - অর্থাৎ সৃষ্টি করার গুণ- বাতিল বলে জ্ঞান করায় আল্লাহর হেকমত ও ইনসাফের দাবি অনুযায়ী- কাফের হিসেবে পরিগণিত হবে। আর ঈমানের এ রোকনটির ক্ষেত্রে কুফরি করার একটি আবশ্যিক অনুষঙ্গ হলো মানুষ তার নিজেকে তুচ্ছ করে দেয়া; কেননা পরকাল না-মানার অর্থ- সে এক নিরর্থক সৃষ্টি। তাকে সৃষ্টির পেছনে

কোনো হেকমত অথবা উদ্দেশ্য নেই। মানব হিসেবে তার অস্তিত্বের সময়সীমা হলো কেবল ইহকালীন জীবনপর্ব, যা- কষ্ট-যাতনা, দুঃখ-বেদনা, অন্যায়-অত্যাচার, সীমালঙ্ঘন ইত্যাদিতে ভরপুর এবং মানুষকে হিসাবনিকাশ ও প্রতিদান ব্যতীতই ছেড়ে দেয়া হবে। অতএব যে জালেম, তাকে তার জুলুমের শাস্তি দেয়া হবে না। যে ন্যায়পরায়ণ, সে তার ন্যায়পরায়ণতার প্রতিদান পাবে না। যে সংস্কারক সে তার সংস্কারকর্মের প্রতিদান পাবে না। যে ফাসাদ ও দুষ্কৃতিকারী সে তার দুষ্কৃতির শাস্তি পাবে না। যে পাপী, সে তার পাপের শাস্তি পাবে না। অতএব শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাসই হলো আল্লাহ তাআলার মহিমা, ইনসাফ, হেকমতের সঙ্গে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা ও স্বচ্ছ প্রকৃতিও তাই দাবি করে। [আল ওয়াহী আল মুহাম্মাদী পৃ.১৭৯-১৭৮]

শেষ দিবসের প্রতি ঈমানের বিশ্লেষণ

যদি শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ রোকন হয়ে থাকে, তাহলে এ রোকনটি ততক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে না যতক্ষণ না দুটি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা হবে, প্রথমত, শেষ দিবসের প্রতি এজমালিভাবে ঈমান আনা। আর তা হবে এ ব্যাপারে সর্বনিম্ন ঈমান। দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুপরবর্তী জীবনে ঘটিতব্য যেসব গায়েবি বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন সে সবার প্রতি ঈমান আনা। নিচে, সহিহ হাদীসের আলোকে এ ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য বিশ্বাসগুলো তুলে ধরা হলো, কবরের পরীক্ষা ও দুই ফেরেশতার প্রশ্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের পরীক্ষা ও মানুষকে তার রব, দ্বীন ও নবি সম্পর্কে দুই ফেরেশতার প্রশ্নের ব্যাপারে আমাদের যা বলেছেন তার প্রতি ঈমান আনা ফরজ।

সহিহ হাদিস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, কবরে মানুষকে পরীক্ষা করা হয়। অতঃপর বান্দাকে বলা হয়, তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার নবি কে? এ প্রশ্নসমূহের উত্তরে মুমিন ব্যক্তি বলে, আমার রব আল্লাহ, আমার দ্বীন ইসলাম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নবি। আর যে সন্দেহকারী, সে বলে, জানি না, লোকদের কিছু বলতে শুনেছি, আর আমি তাই বলেছি। অতঃপর তাকে পেটানো হবে ও আজাব দেয়া হবে। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদিসগুলোর কয়েকটি হলো আসমা (রাযি.) থেকে বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘পূর্বে আমাকে যা কিছু দেখানো হয়নি, তা আমাকে, আমার এ জায়গায় দেখানো হয়েছে। এমনকি জান্নাত ও জাহান্নামও দেখানো হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আমার কাছে ওহী পাঠিয়েছেন যে, কবরে তোমাদের পরীক্ষায় নিপতিত করা হবে, যা হবে দাজ্জালের ফেতনার মতো অথবা তার কাছাকাছি। বলা হবে, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি জান? মুমিন অথবা একীনধারী বলবে, তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তিনি আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদি ও হিদায়েত নিয়ে এসেছেন। আমরা তাঁর আহবানে সাড়া দিয়েছি এবং তাঁর অনুসরণ করেছি। কথাটি তিনবার বলবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, তুমি ভালোভাবে ঘুমাও। আমরা জেনেছি যে তুমি দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলে। পক্ষান্তরে মুনাফেক ও সন্দেহকারী বলবে, জানি না, আমি মানুষকে কিছু বলতে শুনেছি, অতঃপর তাই বলেছি।’ [বুখারি, আস-সহিহ (ফাতহুল বারীসহ) ১/১৪৮]

আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) থেকে বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং সঙ্গীরা তাকে ছেড়ে চলে যায়, নিশ্চয় সে তখন তাদের জুতো-পতনের শব্দ শুনতে পায়। তিনি বললেন, দু’জন ফেরেশতা তার কাছে আসে, তাকে বসায় ও বলে, ‘এই ব্যক্তির ব্যাপারে তুমি কি বলতে?’ তিনি বললেন, ‘অতঃপর মুমিন ব্যক্তি বলবে’, ‘আমি সাক্ষ্য দেই যে তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।’ তিনি বললেন, ‘অতঃপর তাকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার অবস্থানের জায়গার দিকে তাকিয়ে দেখ, আল্লাহ তাআলা তা পরিবর্তন করে তোমার জন্য জান্নাতে একটি জায়গা দিয়েছেন।’ আল্লাহর নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ‘সে উভয় জায়গার দিকেই তাকিয়ে দেখবে।’ কাতাদা রা. বলেন, (আমাদের বলা হয়েছে যে, এ ব্যক্তির জন্য কবর পঞ্চাশ গজ প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং তা কিয়ামত পর্যন্তের জন্য সবুজে ভরে দেয়া হয়। অন্যদিকে কাকের-মুনাফেককে বলা হবে, তুমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বল? সে বলবে, আমি জানি না। মানুষ যা বলত, আমি তাই বলতাম।

অতঃপর তাকে বলা হবে, তুমি জাননি, জানার চেষ্টাও করনি। অতঃপর তাকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে পেটানো হবে। তাতে সে এমন চিৎকার দেবে, যা জিন ও মানুষ ছাড়া তার কাছের সবাই শুনবে।’

বুখারি ও মুসলিমে এসেছে, বারা ইবনে আযেব (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘الثَّابِتُ بِالْقَوْلِ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يُثَبِّتُ -
‘আল্লাহ অবিচল রাখেন ঈমানদারদেরকে সুদূর বাণী দ্বারা’ (তিনি বলেছেন, এ আয়াতটি কবরের আশাবের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। অতঃপর কবরবাসীকে বলা হবে, তোমার রব কে? সে বলবে, আমার রব আল্লাহ এবং আমার নবি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটাই হলো আল্লাহর কথা- ‘আল্লাহ অবিচল রাখেন ঈমানদারদেরকে সুদূর বাণী দ্বারা’ এর অর্থ। [বুখারি ও মুসলিম]

আঘাত করতে করতে তাদের জীবনাবসান ঘটাবে?’ (সূরা মুহাম্মাদ , ২৭)। এরপর তিনি বলেছেন, (যদি দাফনের পূর্বেও আজাব দেয়া হয়, তবে তাও ওই আযাবের মধ্যে শামিল হবে, যা কিয়ামতের পূর্বে দেয়া হবে। কেননা, এ জাতীয় আজাবকে কবরের সঙ্গে এ জন্য সম্পৃক্ত করা হয়েছে যে, তার অধিকাংশই সংঘটিত হবে কবরে)। [ফাতহুল বারী ৩/১৮০]

কবরের আজাব প্রমাণ করে, এমন হাদিসের সংখ্যা এত বেশি যে, সব মিলিয়ে তা মুতাওয়াতির পর্যায়ে, অর্থাৎ যার প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত। ইমাম নববী র. সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন, ‘আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মাযহাব হলো, কবরের আযাবের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস করা। কবরের আজাব সম্পর্কে কোরান সুন্নাহর বহু প্রমাণ রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, وَعَشِيًّا غَدُوًّا عَلَيْهَا يُعْرَضُونَ النَّارُ ‘তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আগুনের সামনে উপস্থিত করা হয়’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একদল সাহাবীর (রাযি.) বর্ণনায়, বিভিন্ন উপলক্ষে, এ বিষয়ক হাদিস উল্লিখিত হয়েছে। পাশাপাশি, মানুষের শরীরের কোনো অংশ একেজো হয়ে গেলে তাতে পুনরায় জীবনসম্পন্দন ফিরিয়ে দেয়ার ঘটনা মানববুদ্ধি অস্বীকার করে না। আর যা মানববুদ্ধি অস্বীকার করে না এবং শরীয়তও যা মানার ব্যাপারে তাগিদ করে, তা বিশ্বাস করা এবং মেনে নেয়া অত্যাবশ্যক। [দেখুন শারহুন নববি আলা সহীহি মুসলিম ১৭/২০০-২০১]

যাদের কবরে আজাব হচ্ছে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন ব্যক্তিদের কবরের আজাব শোনা, আহলে কুলাইব-এর সঙ্গে তাঁর কথা বলা। ‘তোমরা তাদের চেয়ে অধিক শ্রবণকারী নও’ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা বলা, মৃত ব্যক্তি নাজাতপ্রাপ্তদের মধ্যে হলে তার কবর প্রশস্ত হয়ে যাওয়া, জান্নাত ও জাহান্নামে মৃত ব্যক্তির অবস্থানের জায়গা দেখিয়ে দেয়া ইত্যাদি প্রমাণ করে সহিহ মুসলিমে বহু হাদিস এসেছে। [দেখুন মুসলিম, আস-সহিহ (নববীর ব্যাখ্যাসহ) ১৭/২০০-২০৭]

সহিহ মুসলিমে যেসব হাদিস উল্লিখিত হয়েছে, তার মধ্যে একটি হলো যামেদ ইবনে ছাবেত (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা বনী নাজ্জারের একটি বাগানে একটি গাধীর ওপর আরোহিত অবস্থায় ছিলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। গাধীটি হঠাৎ এমনভাবে পথ থেকে দূরে চলে গেল যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফেলে দেয়ার উপক্রম করল। দেখা গেল যে সেখানে ছয়জন অথবা পাঁচজন অথবা চারজনের একটি কবর রয়েছে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ কবরগুলোয় কারা শায়িত আছে, তোমরা কি কেউ চেন? এক ব্যক্তি বলল, আমি চিনি। তিনি বললেন, এরা কবে মারা গিয়েছে? লোকটি বলল, এরা মুশরিক অবস্থায় মারা গিয়েছে। তিনি বললেন, এই উস্মতকে কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। আমার যদি আশঙ্কা না হত যে, তোমরা ভয়ে মারা যাবে, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম, যাতে তিনি তোমাদের কবরের আজাব শোনান যেভাবে আমি শুনি। এরপর তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে কবরের আজাব থেকে পানাহ চাও। তারা বললেন, আমরা আল্লাহর কাছে কবরের আজাব থেকে পানাহ চাই। তিনি বললেন, তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ফেতনা থেকে পানাহ চাও। তারা বললেন, আমরা প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য ফেতনা থেকে পানাহ চাই। তিনি বললেন, দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। তারা বললেন, আমরা

দাঙ্গালের ফেতনা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। [মুসলিম, আস-সহিহ (নববীর ব্যাখ্যাসহ) ১৭/২০০-২০১]

ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুটি কবরের পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, এ কবরবাসীদের আজাব হচ্ছে। অবশ্য বড় কোনো পাপের কারণে তাদের আজাব হচ্ছে না। এরপর তিনি বললেন, হ্যাঁ, এদের একজন কথা চালাচালি করত। আর অন্যজন তার পেশাব গায়ে-কাপড়ে লেগে যাওয়া থেকে সতর্কতা অবলম্বন করত না। [বুখারি ও মুসলিম]

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন মারা যায় তখন সকাল-বিকাল তার স্থানটি দেখানো হয়। যদি সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তবে জান্নাতবাসীদের মধ্যে। আর যদি জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তবে জাহান্নামবাসীদের মধ্যে। অতঃপর তাকে বলা হয়, এটা তোমার স্থান কিয়ামত পর্যন্তের জন্য।' [বুখারি ও মুসলিম]

কবরের আজাব ও নিয়ামতের বিস্তারিত ধরন-ধারণ কী, কীভাবে মৃতব্যক্তির মধ্যে রুহ ফিরে আসে, ইত্যাদির ক্ষেত্রে সহিহ হাদিসে যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকুতে বিশ্বাস করাই হলো আমাদের কর্তব্য এবং এর ওপর অতিরিক্ত কিছু বাড়িয়ে বিশ্বাস করা বৈধ নয়। 'আল আকীদা আত-তাহাবিয়া'র ব্যাখ্যাকার বলেন, 'কবরের আজাব ও নিয়ামত- যে যেটার উপযোগী-এবং দুই ফেরেশতার প্রশ্ন ইত্যাদি প্রমাণে বহু হাদিস এসেছে। অতএব এ ব্যাপারে ঈমান আনা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। তবে তার ধরন-ধারণ কী, সে ব্যাপারে আমরা কথা বলব না; কারণ বিষয়টি মানববুদ্ধির আওতাভুক্ত নয়। এ ব্যাপারে মানববুদ্ধির আদৌ কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। আর মানববুদ্ধি যা অসম্ভব মনে করে তা নিয়ে শরীয়তও ন্যায়িত হয় না। তবে মানববুদ্ধি যে ব্যাপারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়, সে ব্যাপারে শরীয়ত আসতে পারে। মানুষের শরীরে আত্মা ফিরে আসা, দুনিয়ায় আমরা যেভাবে দেখি সেভাবে নাও হতে পারে। বরং দুনিয়ার পরিচিত পদ্ধতির বাইরে অন্যকোনো পদ্ধতিতে তার মধ্যে রুহ ফিরে আসতে পারে। আরেকটি বিষয় আমাদের জানা প্রয়োজন। আর তা হলো, কবরের আজাবই হলো বরখ-জীবনের আজাব। অতএব যে ব্যক্তি আযাবের হকদার হয়ে মারা গেল, সে আযাবের মুখোমুখি হবে, চাই তাকে কবর দেয়া হোক বা না হোক। চাই তাকে হিংস্র কোনো প্রাণী খেয়ে ফেলুক অথবা পুড়ে গিয়ে ছাই হয়ে যাক, বা বাতাসে উড়ে যাক। চাই তাকে শুলিতে চড়ানো হোক অথবা সাগরে ডুবে মৃত্যুবরণ করে থাকুক। অর্থাৎ মৃত্যুর পর সে যে অবস্থাতেই থাক না-কেন, তার শরীর ও আত্মায় আজাব পৌঁছবে, যেভাবে পৌঁছে কবরস্থ ব্যক্তির কাছে। মৃতব্যক্তিকে বসানো, তার পাজরের হাড় পরস্পরে ঢুকে যাওয়া ইত্যাদির দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অর্থ উদ্দেশ্য করেছেন, সে অর্থেই আমাদের তা নিতে হবে। এ ব্যাপারে কোনো অতিরঞ্জন অথবা বাতিলকরণ শুদ্ধ হবে না। অতএব তার কথা এমন অর্থে নেয়া যাবে না, যা তা বহন করে না। আবার তিনি তাঁর কথা দ্বারা যে হিদায়েত ও বয়ান উদ্দেশ্য করেছেন, তা থেকে কোনো কিছু বাতিল করে দেওয়াও শুদ্ধ হবে না। [শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়া পৃ. ৪৫১-৪৫২]

ইবনুল কাইয়েম র. বলেন, 'এ উম্মতের উত্তম পূর্বপুরুষ ও ইমামদের মায়হাব হলো, যখন কোনো ব্যক্তি মারা যায়, সে তখন নেয়ামত অথবা আযাবে থাকে। আর তা ব্যক্তির আত্মা ও শরীর উভয়টির জন্যই। এরপর যখন বড় কেয়ামত কায়েম হবে আত্মাকে শরীরে ফিরিয়ে দেয়া হবে। মানুষ তখন রাব্বুল আলামীনের জন্য কবর থেকে উঠে দাঁড়াবে। শরীরের এই পুনরুত্থান বিষয়ে মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিস্টান সবাই একমত।

কেয়ামতের আলামত

আমাদের এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে কেয়ামতের আগমন অনিবার্য, নিঃসন্দেহ। আর কেয়ামত কবে হবে, তা আল্লাহ ছাড়া অন্যকেউ জানে না। আল্লাহ তাআলা বিষয়টি সকল মানুষ থেকে গোপন রেখেছেন। এমনকি নবি-রাসূলগণ থেকেও। পৃথিবীর জীবন কতকাল প্রলম্বিত হবে, এ বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য জানা মানুষের সাধ্যের বাইরে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, عَلِمُهَا إِنَّمَا قُلُّ مُرْسَاَهَا أَيَّانَ السَّاعَةِ عَنِ يَسْأَلُونَكَ لَا وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ فِي ثَقُلْتُ هُوَ إِلَّا تَهَالُوقُ يُجَلِّبُهَا لَا رَبِّي عِنْدَ اللَّهِ عِنْدَ عَلِمُهَا إِنَّمَا قُلُّ عَنْهَا حَفِي كَأَنَّكَ يَسْأَلُونَكَ بَغْتَةً إِلَّا تَأْتِيكُمْ يَغْلُمُونَ لَا النَّاسُ أَكْثَرُ وَلَكِنْ

তারা তোমাকে কেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে, 'তা কখন ঘটবে'? তুমি বল, 'এর জ্ঞান তো রয়েছে আমার রবের নিকট। তিনিই এর নির্ধারিত সময়ে তা প্রকাশ করবেন। আসমানসমূহ ও জমিনের ওপর তা (কেয়ামত) কঠিন হবে। তা তোমাদের নিকট হঠাৎ এসে পড়বে। তারা তোমাকে প্রশ্ন করছে যেন তুমি এ সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত। বল, 'এ বিষয়ের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট আছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না' - (সূরা আল আরাফ , ১৮৭)।

তবে কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন, তাতে আমাদের ঈমান আনতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেয়ামতের দু'ধরনের আলামত বয়ান করেছেন। প্রথম ধরনের আলামত হলো ছোট আলামত যার অধিকাংশই শেষ জামানায় মানুষের নীতিনৈতিকতা নষ্ট হয়ে যাওয়া, নানা ধরনের ফেতনা প্রকাশ পাওয়া, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া ইত্যাদিকে ঘিরে আবর্তিত। আর দ্বিতীয় ধরনের আলামত হলো বড় আলামত। ছোট আলামতগুলো বেশ কিছু সহিহ হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন,

ক- বুখারি ও মুসলিমে এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি প্রেরিত হয়েছি এবং কেয়ামত এ দুটির মতো' এই বলে তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন। [বুখারি, মুসলিম ও তিরমিযি] এ হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরিত হওয়া- নবুওত ও রিসালতের সমাপ্তি ঘটা এবং কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। হাদিস থেকে এটাও বুঝা যাচ্ছে যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর কেয়ামত পর্যন্ত অন্যকোনো নবি আসবে না। বরং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরণের পর যা বাকি থাকবে তা হলো কেয়ামত আসা। অতএব এ হাদিসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ দিয়ে দিয়েছেন। [সাইয়েদ সাবেক, আল আকায়েদ আল ইসলামীয়াহ পৃ. ২৪৫; ফাতহুল বারী ১১/২৯৩]

খ-হাদিসে জিবরিলে রয়েছে, জিবরিল আলাইহিস সালাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন। উত্তরে তিনি বলেছেন, 'যাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো, সে প্রশ্নকারীর চেয়ে অধিক জানে না। জিবরিল আলাইহিস সালাম বললেন, 'তা হলে আমাকে তার আলামত সম্পর্কে বলুন? উত্তরে তিনি বলেছেন, 'দাসী তার প্রভুকে জন্ম দেবে। [এ কথার ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে হাজার

র. বলেছেন, 'অর্থাৎ সন্তানদের দ্বারা মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয়া বেড়ে যাবে। অতঃপর সন্তান তার মায়ের সঙ্গে - গালাগাল, তাম্বিল্য, মারধর, কাজে খাটানো ইত্যাদির ক্ষেত্রে দাসীর সঙ্গে মনিবের আচরণের ন্যায় আচরণ করবে। অথবা হাদিসে যে 'রব' শব্দটি এসেছে (أَنَّ رَبَّتَهَا الْأُمَّةُ تَلَدُ) এখানে রব শব্দটির অর্থ অভিভাবক। [অর্থাৎ মা তার সন্তানের ওপর অভিভাবকত্ব হারিয়ে ফেলবে, এর উল্টো বরং সন্তানই মায়ের অভিভাবক বনে যাবে] খোলাসা কথা হলো, সব কিছু যখন উলটপালট হয়ে যাবে- অভিভাবক পোষ্য বনে যাবে, নিচু ব্যক্তি উঁচু হয়ে যাবে, তখন মনে করতে হবে যে কেয়ামত সন্নিহিত। আর এ ব্যাখ্যাটি অন্য-একটি আলামতের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ। অর্থাৎ নগ্নপদ ব্যক্তির পৃথিবীর রাজা-বাদশা হয়ে যাবে। দেখুন: ফাতহুল বারী : ১/] আর দরিদ্র-নগ্নপদ বকরীর রাখালদের দেখবে উঁচু বিল্ডিং নির্মাণে একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। [বুখারি ও মুসলিম- এখানে বকরীর রাখালদের উঁচু উঁচু বিল্ডিং তৈরির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করার ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী বলেছেন যে, এর অর্থ হলো- অবস্থা এমনভাবে পাল্টে যাওয়া যে, মরুবাসী বেদুঈনরা নেতৃত্বে চলে আসবে। তারা জবরদস্তিমূলক বিভিন্ন দেশের কর্তা বনে যাবে। অতঃপর তাদের সম্পদ বেড়ে যাবে। আর সেসময় তাদের গুরুত্বের বিষয় হবে বিল্ডিং নির্মাণ করা এবং এ ক্ষেত্রে পরস্পরে প্রতিযোগিতা করা। আমরা আমাদের যুগেই এ অবস্থা দেখেছি।- ইমাম ইবনে হাজার ইমাম কুরতুবী থেকে এ ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছেন। দেখুন: ফাতহুল বারী ১/১০১।]

গ-সহিহ বুখারিতে আবু হুরায়রা (রাযি.) এর বর্ণনায় এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কেয়ামত ঘটবে না, যতক্ষণ না দুটি বিশাল দল পরস্পরে যুদ্ধ করবে, [এর দ্বারা উদ্দেশ্য আলী রাযি. ও তাঁর দল এবং মাআবিয়া রাযি. ও তাঁর দল। দেখুন: ফাতহুল বারী ১২/৭২] এদের মধ্যে প্রচুর হতাহত হবে তবে উভয় দলের আহবান হবে অভিন্ন; যতক্ষণ না ত্রিশের কাছাকাছি মিথ্যাবাদী দাজ্জাল প্রকাশ পাবে, যাদের প্রত্যেকেই দাবি করবে যে, সে আল্লাহর রাসূল [যেমন, সানআ এলাকার আল আসওয়াদ আল আনাসী, ইয়ামামা এলাকার মুসায়েলামাতুল কামযাব। আরও যারা নবুওত দাবি করেছিল তাদের মধ্যে হলো তুলাইহা ইবনে খুআইলিদ এবং সাজাহ। শেষোক্ত এই দু'জন তাদের দাবি থেকে ফিরে এসেছিল। আর শেষযুগের নবুওত দাবিদারদের মধ্যে হলো কাদিয়ানী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা এবং বাহাই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। [দেখুন: ফাতহুল বারী ১২/৭৩; আল আকায়েদ আল ইসলামীয়াহ পৃ.২৪৬] ; যতক্ষণ না ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে, [অর্থাৎ দ্বীনের আলেম ও দাঈদের উঠিয়ে নেয়া হবে।] অধিক হারে ভূমিকম্প হবে, কাল নিকটবর্তী হবে, [অর্থাৎ সব কিছু থেকে বরকত উঠিয়ে নেয়া হবে। এমনকি কাল ও সময়ের বরকতও উঠিয়ে নেয়া হবে। আর তখন বরকত ও উপকৃত হওয়ার বিচারে এক বছর হবে এক মাসের সমান। এক মাস হবে এক সপ্তাহের সমান। এক সপ্তাহ হবে এক দিনের সমান। এক দিন হবে এক ঘন্টার সমান। [দেখুন: ফাতহুল বারী ১৩/১২] ফেতনা প্রকাশ পাবে, হত্যা বেড়ে যাবে, তোমাদের মাঝে সম্পদ বেড়ে গিয়ে তা উপচে পড়বে, এমনকি সম্পদশালী ব্যক্তি এ নিয়ে চিন্তায় পড়ে যাবে যে, তার সদকা কে গ্রহণ করে? সে তার সদকা পেশ করবে, অতঃপর যার সামনে তা পেশ করবে, সে বলবে, এতে আমার প্রয়োজন নেই; যতক্ষণ না উঁচু বিল্ডিং তৈরির ক্ষেত্রে মানুষ প্রতিযোগিতা করবে, যতক্ষণ না একব্যক্তি অন্যব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাবে এবং বলবে, আমি যদি এই কবরবাসীর জায়গায় হতাম!; যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম আকাশ থেকে উদিত হবে। [এ আলামতটি হলো কেয়ামতের বড় আলামত। আর বাকি আলামতগুলো হলো ছোট আলামত।] আর মানুষ যখন তা দেখবে, তখন সবাই ঈমান আনবে। আর এটাই হবে সে সময় যখনকার ঈমান ব্যক্তির কোনো উপকারে আসবে না, যদি না সে ইতোপূর্বে ঈমান এনে থাকে অথবা তার ঈমানে কল্যাণ অর্জন করে থাকে। কেয়ামত অবশ্যই ঘটবে, আর তখন অবস্থা এমন হবে যে, দু'ব্যক্তি তাদের মাঝে ক্রয়-বিক্রয়ের কাপড় ছড়িয়ে

দিয়েছে, কিন্তু তারা না ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করবে, না তা ভাঁজ করে রাখবে। কেয়ামত অবশ্যই ঘটবে, আর তখন অবস্থা এমন হবে যে, একব্যক্তি দোহন করা দুধ নিয়ে আসবে, কিন্তু সে তা খাবে না। কেয়ামত অবশ্যই ঘটবে, আর তখন অবস্থা এমন হবে যে, একব্যক্তি তার পানির হাউজকে সংস্কার করছে, কিন্তু সে তা থেকে পানি পান করবে না। কেয়ামত অবশ্যই ঘটবে, আর তখন অবস্থা এমন হবে যে, এক ব্যক্তি খাবারের লোকমা তার মুখের কাছে নিয়েছে, কিন্তু সে তা খাবে না।’ [বুখারি, আস-সহিহ (ফাতহুল বারীসহ) ১৩/৭০-৭৬]

ঘ- আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘কেয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে কয়েকটি হলো এই যে, ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে, মূর্খতা প্রকাশ পাবে, ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে, মদ পান করা হবে, নারী বেড়ে যাবে, পুরুষ কমে যাবে- এমনকি একজন পুরুষ পঞ্চাশ জন নারীর অভিভাবক হবে।

ঙ - আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, কেয়ামত কবে হবে? তিনি বললেন, ‘যখন আমানত নষ্ট করা হবে, তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করো।’ লোকটি প্রশ্ন করে বলল, আমানত কীভাবে নষ্ট করা হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘যখন অযোগ্যকে দায়িত্ব দেয়া হবে তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করো।

চ - আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যতদিন না মুসলমানরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, ততদিন কেয়ামত কয়েম হবে না। মুসলমানরা তাদের হত্যা করবে। পরিশেষে ইহুদিরা পাথর ও গাছের পেছনে আত্মগোপন করবে। অতঃপর পাথর ও গাছ বলবে, হে মুসলিম, হে আল্লাহর বান্দা, এই তো ইহুদি আমার পেছনে। এসো তাকে হত্যা করো। তবে ফারকাদ গাছ ছাড়া; কেননা তা ইহুদিদের গাছ।’ [মুসলিম, আস-সহিহ (নববীর ব্যাখ্যাসহ) ১৮/৪৪] এ ছাড়াও সহিহ হাদিসে কেয়ামতের আরও অন্যান্য ছোট-ছোট আলামতের কথা উল্লেখ রয়েছে, যা কেয়ামতের পূর্বে প্রকাশ পাবে। এ বিষয়ে আরও পড়াশোনার জন্য হাদিস গ্রন্থসমূহের ফেতনা ও কেয়ামতের আলামত অধ্যায় দেখা যেতে পারে।

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৩৩ : কেয়ামতের বড় আলামত-০১ : পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্য উদিত হওয়া

কেয়ামতের বড় আলামত

কয়েকটি সহিহ হাদিসে কেয়ামতের বড় আলামতগুলো উল্লিখিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম কেয়ামতের দশটি আলামত উল্লেখ করেছেন। যেমন ---

হুযায়ফা বিন উসাইদ আল গিফারি রযি. বর্ণনা করেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আমাদের কাছে আগমন করলেন। আমরা তখন আলাপ-আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, 'তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছ?' আমরা বললাম, আমরা কেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তিনি বললেন, 'দশটি আলামত দেখার পূর্বে কেয়ামত ঘটবে না। এর মধ্যে তিনি উল্লেখ করলেন- ধোঁয়া, দাঙ্গাল, জমিনের জঙ্ক, সূর্য পশ্চিম আকাশ থেকে উদিত হওয়া, ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজ এবং তিনটি ভূমিধ্বস- একটি পূর্বে, আরেকটি পশ্চিমে, আরেকটি আরব উপদ্বীপে এবং পরিশেষে ওই আগুন যা ইয়ামেন থেকে বের হবে এবং মানুষকে ময়দানে হাশরের দিকে ধাওয়া করে নিয়ে যাবে।

নিচে আমরা এ আলামতগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আলামত, হাদিস ব্যাখ্যাকারদের ভাষ্য মূতাবেক বর্ণনা করব,

পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্য উদিত হওয়া পৃথিবীর জীবন ও মহাবিশ্বের নিয়ম শৃঙ্খলায় আল্লাহ তাআলা যে পরিবর্তন আনবেন, এটি হবে তারই শুরু, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দেবেন, কেয়ামত ঘটে আর দেরি নেই। আর কেয়ামত ঘটার সঙ্গে-সঙ্গে মহাবিশ্ব সম্পূর্ণরূপে পালটে যাবে, যার ইঙ্গিত আল-কোরানের অনেক আয়াতেই এসেছে। হাদিস অনুযায়ী প্রথম পরিবর্তনটি হলো সূর্য পশ্চিম আকাশ থেকে উদিত হওয়া। অথচ ইতোপূর্বে তা পূর্ব আকাশ থেকে উদিত হয়েছে। আর যিনি পূর্বাকাশ থেকে সূর্যোদিত করতে পেরেছেন, তিনি তার গতিপথ পরিবর্তন করে দিতেও সক্ষম। কারণ তিনিই তার স্রষ্টা ও সার্বিক ব্যবস্থাপক। সহিহ হাদিস অনুযায়ী, প্রকাশ পাওয়ার ক্ষেত্রে এ আলামতটিই হবে প্রথম

[কেয়ামতের বড় আলামতগুলো প্রকাশ পাওয়ার ক্রম কি হবে, সে ব্যাপারে ইবনে হাজার র. বলেন, 'সকল হাদিস একত্র করলে, যে বিষয়টি আমার কাছে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বলে মনে হয়, তা হলো দাঙ্গালের প্রকাশ পাওয়া ওই বড় আলামতগুলোর মধ্যে প্রথম, যা ভূপৃষ্ঠের সাধারণ অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে বলে জানান দেবে। এ আলামতটি ঈসা ইবনে মারযাম আলাইহিস সালামের পরলোকগমনের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। আর সূর্য পশ্চিমাকাশ থেকে উদিত হওয়া এমন বড় আলামতগুলোর মধ্যে প্রথম, যা ঊর্ধ্ব জগতে প্রকাশ পাবে এবং কেয়ামত ঘটে যাওয়ার মাধ্যমে তা শেষ হবে। আর জঙ্ক বের হওয়ার ঘটনা হয়ত একই দিন ঘটবে যেদিন সূর্য পশ্চিমাকাশ থেকে উদিত হবে। এর হিকমত হলো, সূর্য পশ্চিমাকাশ থেকে উদিত হয়ে তাওয়ার দরজা বন্ধ করে দেবে। এরপর জমিনের জঙ্ক বের হয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলবে এবং বুঝিয়ে দেবে, কেন তাওয়ার দরজা বন্ধ করা হলো। আর কিয়ামত শুরু হয়ে যাওয়ার প্রথম আলামত আগুন বের হওয়া, যা মানুষকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে নিয়ে যাবে।' (ফাতহুল বারী ১১/২৯৬)। ইবনে হাজার র. এর কথার খোলাসা হলো, কেয়ামতের বড় আলামতগুলো তিন প্রকার। প্রথম প্রকার হলো, যা ভূপৃষ্ঠে সাধারণ অবস্থার পরিবর্তনকে ইঙ্গিত করবে। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো, যা ঊর্ধ্বজগতে

সাধারণ অবস্থার পরিবর্তনকে বোঝাবে। আর তৃতীয় প্রকার হলো, যা কেয়ামত শুরু হয়ে যাওয়া নির্দেশ করবে।]।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল আস (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘প্রকাশ পাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আলামত হলো পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্য বের হওয়া। আর নাস্তার সময় জমিন থেকে জল বের হয়ে মানুষের কাছে আসা। যখন এ দুটির একটি প্রকাশ পাবে, তখন দ্বিতীয়টিও তার অব্যবহিত পরে প্রকাশ পেয়ে যাবে।’

[মুসলিম ও আবু দাউদ। দেখুন ফাতহুর বারি ১১/২৯৭; আবুদাউদ, কেয়ামতের আলামত অধ্যায়।]

আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে যে, মানুষ যখন পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয় হতে দেখবে, তখন তাদের সবাই ঈমান আনবে। কিন্তু সে সময়ের ঈমান তাদের কোনো উপকারে আসবে না, যদি না ইতোপূর্বে তারা ঈমান এনে থাকে। এ দিকে ইঙ্গিত করেই ইরশাদ হয়েছে,

بَعْضُ يَأْتِي يَوْمَ
فِي كَسَبَتْ أَوْ قَبْلُ مِنْ أَمَنْتَ تَكُنْ لَمْ إِيمَانُهَا نَفْسًا يَنْفَعُ لَا رَبُّكَ آيَات
خَيْرًا إِيمَانُهَا

যেদিন তোমার রবের আয়াতসমূহের কিছু প্রকাশ পাবে, সেদিন কোনো ব্যক্তিরই তার ঈমান উপকারে আসবে না, যে পূর্বে ঈমান আনেনি, কিংবা সে তার ঈমানে কোনো কল্যাণ অর্জন করেনি।’ – (সূরা আল আনআম, ১৫৮)।

মুফাসসিরদের অনেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় যা বলেছেন তার খোলাসা হলো– সূর্য পশ্চিমাকাশ থেকে উদিত হওয়ার পর কাফের ব্যক্তির ঈমান আনা, পাপী ব্যক্তির তাওবা করা আদৌ কোনো উপকারে আসবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি মুমিন হয়েও সৎকাজ করেনি, এ সময় যদি সে আমল করতে শুরু করে, তবে তাও কোনো ফায়দা পৌঁছাবে না। [দেখুন ফাতহুল বারী ১১/২৯৭]

জন্তু বের হওয়া সম্পর্কে বহু হাদিস এসেছে, যার বেশ কয়টি হাদিসই সহিহ। এর মধ্যে কয়েকটি ওপরে উল্লিখিত হয়েছে। তবে সহিহ হাদিসগুলোতে, এ জন্তুর আকার-প্রকৃতির বর্ণনা আসেনি। যেসব হাদীসে জন্তুটির আকার-প্রকৃতির বর্ণনা এসেছে, সেগুলো শুদ্ধতার বিচারে মানোত্তীর্ণ নয়। উপরন্তু উক্ত জন্তুর আকার-প্রকৃতি কী, তা জানার মধ্যে মুমিনের কোনো ফায়দা নেই। আল কোরান এবং সহিহ হাদীসের নির্ভরতায় মুমিনের জন্য তো এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, জন্তুটি কেয়ামতের আলামত হিসেবে প্রকাশ পাবে এবং যখন তাওবা উপকারে আসার সময়সীমা শেষ হয়ে যাবে, যারা তাওবা করেনি তারা এ মূহর্ত পর্যন্ত যেভাবে ছিল, সেভাবেই তাদের বিচার করা হবে, তাদের তাওবা কবুল করা হবে না। এ সময়ই আল্লাহ তাআলা জমিনের জন্তু বের করবেন, যে তাদের সঙ্গে কথা বলবে। কে মমিন, কে কাফের সে তা চিনতে পারবে। বর্তমানে যদিও মানুষ জন্তুদের কথা বুঝে না, তবে ওই জন্তুটিকে আল্লাহ বোধগম্য ভাষা দান করবেন। অতএব মানুষ তার কথা বুঝতে পারবে ও জানবে যে, তা হলো অলৌকিক, যা কেয়ামত ঘটে যাওয়া অথবা নিকটবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। অথচ তারা ইতোপূর্বে আল্লাহ তাআলার নিদর্শনমালায় বিশ্বাস রাখত না, কেয়ামত-দিবস সত্য বলে জানত না। মূল : ড. মুহাম্মাদ নাঈম ইয়াসিন বাংলা অনূবাদ : ড. মাওলানা শামসুল হক সিদ্দিক

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৩৫ : কেয়ামতের বড় আলামত-০৩ : দাজ্জাল প্রকাশ
পাওয়া

priyo.Islam

০৩ মার্চ ২০১৪, সময় - ০৮:১৯

দাজ্জাল প্রকাশ পাওয়া

দাজ্জাল হলো সীমাহীন মিথ্যাবাদী। ‘দাজ্জল’ ধাতু থেকে দাজ্জাল। অর্থ হলো ঢেকে দেয়া।

মিথ্যাবাদীকে দাজ্জাল এ জন্য বলা হয় যে, সে সত্যকে মিথ্যা দ্বারা ঢেকে দেয়। আর কেয়ামতের বড় আলামতের মধ্যে একটি হলো এমন এক ব্যক্তির প্রকাশ পাওয়া, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে দাজ্জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ সে

অতিমাত্রায় মিথ্যাবাদী হবে, এমনকি সে উলুহিয়াত দাবি করে বসবে। সে আল্লাহ তাআলার অনুমতিতে অস্বাভাবিক ও বিশ্বয়কর ঘটনা ঘটিয়ে মানুষকে দ্বীনচ্যুত করার চেষ্টা করবে।

বহু মানুষ তার ফেতনায় ফেঁসে যাবে। অবশ্য যারা মুমিন, আল্লাহ তাআলা তাদের স্থির ও অনড় রাখবেন। তারা দাজ্জালের ধোঁকায়-প্রণোদনায় বিভ্রান্ত হবে না। এরপর আল্লাহ তাআলা দাজ্জালের ফেতনা পরিসমাপ্তির নির্দেশ দেবেন। এ সময় ঈসা আলাইহিস সালাম নেমে

আসবেন। তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন। ইমাম নববী র. সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন, ‘ইমাম মুলিম র. ও অন্যান্য মুহাদিসগণ দাজ্জালের কাহিনীর ক্ষেত্রে যা যা বলেছেন, তা দাজ্জালের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা যে শুদ্ধ, এ ব্যাপারে হকপন্থীদের দলিল। অর্থাৎ দাজ্জাল একজন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করবেন।

দাজ্জালকে তিনি বিশেষ ক্ষমতাও দেবেন। যেমন-নিহত-ব্যক্তিকে জীবিত করা। তার প্রকাশের সঙ্গে দুনিয়ার চাকচিক্য ও উর্বরতা বেড়ে যাওয়া। তার নিজস্ব জালাত ও জাহান্নাম থাকা। দুটি নদী থাকা। দুনিয়ার ধনদৌলত তার নির্দেশের অধীন থাকা। এমনকি সে যদি আকাশকে বৃষ্টি বর্ষাতে নির্দেশ দেয়, তাহলে আকাশ বৃষ্টি বর্ষাবে। যদি জমিনকে উদ্ভিদ উদ্ভত করতে নির্দেশ দেয়, তবে তা উদ্ভিদ উদ্ভত করবে। এ সবই ঘটবে আল্লাহ তাআলার কুদরত ও ক্ষমতায়। এরপর আল্লাহ তাআলা তাকে অক্ষম করে দেবেন। তার সকল চমক বাতিল হয়ে যাবে এবং ঈসা আলাইহিস সালাম তাকে হত্যা করবেন। আর যারা মুমিন তাদের তিনি স্থির রাখবেন। এটাই হলো আহলে সুননত, মুহাদিসীন ও ফকীহদের মতামত।’

অবশ্য খাওয়ারেজ সম্প্রদায়, জুহমিয়া সম্প্রদায় ও মুতাজেলা সম্প্রদায়ের কেউ কেউ বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী দাজ্জাল আসবে বলে যারা বিশ্বাস করে তারা কেবলই ধারণা ও কল্পকাহিনিজাত বিশ্বাসে নিজেদের সঁপে দেয়। তারা মনে করে যে, দাজ্জালের অস্তিত্ব সত্য হলে নবি-রাসূলগণের মুজিয়ায় মানুষ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। এটি একটি নির্ঘাত ভুল কথা; কেননা দাজ্জাল নবুওত দাবি করবে না। অতএব সে যা দেখাবে, তা নবুওত দাবির সত্যতা প্রমাণের জন্য দেখাবে না। সে বরং উলুহিয়াত দাবি করবে। আর সে তার অবস্থার মাধ্যমে নিজের দাবি মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ বহন করে বেড়াবে। সে যে উলুহিয়াত দাবিতে মিথ্যাবাদী তার প্রমাণ তার মধ্যে সৃষ্টিজীবের বৈশিষ্ট্য থাকা, তার আকৃতি খুঁতবিশিষ্ট থাকা অর্থাৎ তার এক চোখ কানা হওয়া এবং তা দূর করতে অক্ষম হওয়া। তার দুই চোখের মাঝ বরাবর কাকের হওয়ার সাক্ষী হিসেবে যে লেখাটি থাকবে, তা দূর করতে অক্ষম হওয়া। এ সব দলিল ও অন্যান্য দলিলের কারণে মুর্খ ও ছল্লছাড়া লোকেরা তার ধোঁকায় পড়বে, তাদের প্রয়োজন পূরণের আশায়, পেটপূর্তী ও দারিদ্র্য থেকে বিমুক্তির আশায়। অথবা তার ভয়-ভীতি ও নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায়; কেননা তার ফেতনা হবে প্রকট, মানুষের বিবেক-বুদ্ধি দিশেহারাকারী। সে এত দ্রুত তার বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করে যাবে যে, দুর্বলচেতা মানুষ তার অবস্থা নিরীক্ষা করার ফুরসত

পাবে না। সে যে সৃষ্টিজীব এবং অসম্পূর্ণ তা ভাববার তারা সময় পাবে না। অতএব তারা তাকে বিশ্বাস করবে, তারা এ অবস্থাতেই তাকে বিশ্বাস করে ফেলবে। এ কারনেই নবিগণ (আ.) দাজ্জালের ফেতনা থেকে সবাইকে হুঁশিয়ার করেছেন, দাজ্জালের অপূর্ণতার দিক কি কি, এবং কি কি দলিলের ভিত্তিতে তার দাবি বাতিল বলে গণ্য হবে, তা বলে দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ যাদের তাওফীক দেবেন, তারা দাজ্জালের ধোঁকায় পড়বে না। দাজ্জাল যা দেখাবে, তাতে তারা প্রভাবিত হবে না; কেননা দাজ্জালের মিথ্যাবাদী হওয়ার দলিল তাদের কাছে থাকবে- যেমন ওপরে বর্ণিত হয়েছে- পাশাপাশি দাজ্জালের বিষয়ে পূর্ব থেকেই তাদের কাছে জ্ঞান থাকবে। নিচে দাজ্জাল বিষয়ে কয়েকটি সহিহ হাদিস উল্লেখ করা হলো,

এক. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মাঝে দাঁড়ালেন। তিনি যথার্থরূপে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করলেন। এরপর দাজ্জালের কথা উল্লেখ করে বললেন, ‘আমি দাজ্জাল থেকে তোমাদের হুঁশিয়ার করছি। কেননা এমন কোনো নবি গত হননি, যিনি তাঁর জাতিকে দাজ্জাল থেকে হুঁশিয়ার করেননি। তবে আমি তার ব্যাপারে এমন একটি কথা বলব, যা আমার পূর্বের কোনো নবি বলেননি, আর তা হলো এই যে, দাজ্জাল হবে কানা। আর আল্লাহ তাআলা কানা নন। [বুখারি, আস-সহিহ (ফাতহুল বারীসহ) ১৩/৮০; মুসলিম আস-সহিহ (নববীর ব্যাখ্যাসহ) ১৮/৫৯]

দুই. হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সালআহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘দাজ্জালের সঙ্গে যা আছে, সে ব্যাপারে আমি দাজ্জাল থেকেও উত্তম জ্ঞানী- তার সঙ্গে চলমান দুটি নদী থাকবে। একটি আপাত-দৃষ্টিতে সাদা পানি। অপরটি আপাত-দৃষ্টিতে জ্বলন্ত আগুন। অতএব যদি কাউকে দাজ্জালে ধরে বসে, সে যেন ওই নদীতে আসে যা সে আগুন হিসেবে দেখে। সে যেন তার চোখ বন্ধ করে নেয়। অতঃপর মাথা নুইয়ে তা থেকে যেন পান করে; কেননা তা হলো ঠান্ডা পানি। আর দাজ্জাল হবে কানা। তার চোখ একটি মোটা চামড়া দ্বারা ঢাকা থাকবে। তার দুই চোখের মাঝ বরাবর লেখা থাকবে ‘কাফের’, যা প্রত্যেক মুমিনই পড়তে পারবে, হোক সে অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন অথবা নিরক্ষর।’ [মুসলিম আস-সহিহ (নববীর ব্যাখ্যাসহ) ১৮/৯১]

তিন. নাওয়াস বিন সামআন (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সকালে দাজ্জালের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি দাজ্জালকে তুচ্ছ করে উল্লেখ করলেন আবার তার ফেতনাকে বড় করে উল্লেখ করলেন। এমনকী আমরা মনে করলাম যে সে মদীনার খেজুরের বাগানের কাছেই রয়েছে। আমরা যখন সেখানে গেলাম তিনি আমাদের আগ্রহ বিষয়ে জানতে পারলেন। তিনি বললেন, ‘কী ব্যাপার, তোমাদের কি হয়েছে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সকালে দাজ্জালের কথা উল্লেখ করেছেন। তাকে তুচ্ছ করেও উল্লেখ করেছেন আবার বড় করেও উল্লেখ করেছেন। এক পর্যায়ে আমরা মনে করেছি যে নিকটবর্তী খেজুরের বাগানেই সে রয়েছে। তিনি বললেন, দাজ্জাল ছাড়াও তোমাদের ব্যাপারে আমার আরও অধিক আশঙ্কার কারণ রয়েছে। সে যদি এমতাবস্থায় বের হয় যে আমি তোমাদের মধ্যেই আছি- আর আমি তো তোমাদের মধ্যেই আছি- তবে আমি তোমাদের পক্ষ হয়ে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াব, আর যদি আমি না থাকা অবস্থায় সে বের হয়, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকেই তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। আর আল্লাহ প্রতিটি মুসলমানের ওপর আমার খলীফা-স্থলাভিষিক্ত। দাজ্জাল হলো অধিক কুকড়ো চুল বিশিষ্ট এক যুবক। তার এক চোখ কানা।

আমি হয়ত তাকে আবদুল উজ্জা বিন কাতান এর সঙ্গে তুলনা করব। যে তার সাক্ষাৎ পাবে সে যেন তার সম্মুখে সূরা আল কাহাফের শুরুর আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে। সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী একটা পথে প্রকাশ পাবে। সে ডানে ও বামে ফাসাদ ছড়াবে। হে আল্লাহর বান্দারা তোমরা সুদূত হয়ে থেকো! আমরা বললাম হে আল্লাহর রাসূল, সে পৃথিবীতে কতদিন থাকবে? তিনি বললেন, চল্লিশ দিন। এক দিন এক বছরের ন্যায়, এক দিন এক মাসের ন্যায়, এক দিন এক সপ্তাহের ন্যায়, আর তার বাকী দিনগুলো হবে তোমাদের সাধারণ দিনের মতোই। আমরা বললাম, যে দিনটি এক বছরের ন্যায়, সে দিনে কি একদিনের নামাজ পড়লে আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, না। তোমরা বরং সময় হিসাব করে পরিমাণ নির্ধারণ করবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, জমিনে তার দ্রুততা কি ধরনের হবে? তিনি বললেন, ওই মেঘের মতো বাতাস যাকে পেছন থেকে ধাওয়া করেছে। সে একদল মানুষের কাছে যাবে, তাদের আহবান করবে, অতঃপর তারা তার প্রতি ঈমান আনবে, তার আহবানে সাড়া দেবে। সে আকাশকে নির্দেশ দেবে আকাশ বৃষ্টি বর্ষাবে, জমিন থেকে লতাগুল্ল উৎপন্ন হবে, তাদের পশুগুলো সেখানে খাদ্য আহরণ করে সন্ধ্যায় ফিরে আসবে। তাদের কুঁজগুলো হবে অতি দীর্ঘ ও সুউচ্চ। তাদের স্তনগুলো হবে দুধে ভরপুর, তাদের নিতম্বগুলো হবে অতি প্রশস্ত। এরপর সে অন্য কিছু লোকের কাছে যাবে, তাদের সে আহবান করবে, কিন্তু তারা তার আহবান প্রত্যাখ্যান করবে। অতঃপর সে তাদের ছেড়ে চলে যাবে। তারা পরদিন সকালে নিজেদের ছল্লছাড়া পাবে। তাদের হাতে কোনো সম্পদ থাকবে না। সে একটি বিরান ভূমির পাশ দিয়ে যাবে এবং বলবে, তোমার ভেতরে যেসব ধনদৌলত আছে তা বের করে দাও, অতঃপর ওই ভূমির ধনদৌলত বের হয়ে তার পেছনে পেছনে যাবে, ঠিক মৌমাছির ঝাঁকের মতো। এরপর সে একজন সূঠামদেহী যুবককে ডেকে এনে তাকে তরবারীর আঘাতে দীখন্ডিত করে ফেলবে, তীর নিষ্ক্ষেপকারী তার উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করে যতটুকু দূরুত্রে তীর নিষ্ক্ষেপ করে ততটুকু দূরুত্রে তার দুই খন্ডকে ফেলে দেবে। এরপর সে তাকে আবারও ডাকবে। অতঃপর সে আনন্দে চিক-চিক করা চেহারা নিয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসবে। সে এরূপ করতে থাকবে, পরিশেষে আল্লাহ তাআলা মারযাম পুত্র মাসীহকে পাঠাবেন। তিনি দামেস্কের পূর্বাংশে শুভ্র মিনারের কাছে নামবেন। তার গায়ে থাকবে রঙিন দুটি কাপড়। তিনি তার দুই হাত দুই ফেরেশতার পাখার ওপর রাখবেন। তিনি যখন তার মাথা নিচু করবেন তার মাথা থেকে বিন্দু-বিন্দু ঘাম ঝরে পড়বে, আর যখন মাথা উঁচু করবেন মতির মালার ন্যায় তা বেয়ে পড়বে। তার শরীরের ঘ্রান পাওয়া মাত্রই কাফের ব্যক্তি মৃত্যুবরণ না করে পারবে না। আর তার নিশ্বাস ঠিক ওই পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে যে পর্যন্ত তার দৃষ্টি যায়। অতঃপর তিনি দাজ্জালকে অনুসরণ করবেন এবং তাকে বাবে লুদ এর এখানে পেয়ে যাবেন। অতঃপর তিনি তাকে হত্যা করবেন। ' [মুসলিম, আস-সাহীহ, ইমাম নববীর ব্যাখ্যাসহ]

ওপরে বর্ণিত হাদিসসমূহ এবং দাজ্জাল-বিষয়ক অন্যান্য হাদিস দাজ্জাল প্রকাশ পাওয়ার পক্ষে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের প্রমাণ, যা তাদের আবশ্যিক বিশ্বাস হিসেবে গণ্য। অর্থাৎ তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনা মূতাবেক এবং তিনি দাজ্জালের বৈশিষ্ট্য, পরিণতি, দাজ্জালের কিয়ামতের একটি বড় আলামত হওয়া ইত্যাদির ব্যাপারে যা এসেছে, তা বিশ্বাস করা ওয়াজিব।

যদি প্রশ্ন করা হয়- আল্লাহ তাআলা দাজ্জালের হাতে এ বিস্ময়কর নিদর্শনগুলো কীভাবে প্রকাশ করাবেন, মুজিয়া তো কেবল নবিগণের জন্যই সুনির্ধারিত? ইমাম খাতাবী এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, 'এটি করা হবে বান্দাদের পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে; কারণ তাদের কাছে এমন প্রমাণাদি আছে, যা দাজ্জালের বাতুলতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য যথেষ্ট। আর তা হলো দাজ্জালের

কানা হওয়া। তার কপালে কাফের লেখা-থাকা, যা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিই পড়তে পারবে। অতএব কুফরের চি" বহন করে, অসম্পর্ক সত্তার অধিকারী হয়ে সে যে তার দাবিতে মিথ্যাবাদি সে এ কথারই প্রমাণ পেশ করবে। কেননা সে যদি ইলাহ হতো, তা হলে তার চেহারা থেকে সে এসব চি" সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হত। আর নবিগণের মুজিয়া ছিল প্রতিদ্বন্দিতারহিত। অতএব দুটি এক রকম নয়। [ইমাম ইবনে হাজার র. ফাতহুল বারীতে এ উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করেছেন ১২/৮৯]

ইমাম ইবনে হাজার র. বলেন, 'এর পাশাপাশি, খোদ দাজ্জালের মধ্যেই রয়েছে এমন স্পষ্ট দলিল, যা তার মিথ্যাবাদী হওয়া প্রমাণ করে; কেননা সে বিভিন্ন অংশ দ্বারা গঠিত। সে যে সৃষ্টিজীব, তা তাতে স্পষ্ট। এর সঙ্গে তার রয়েছে কিছু খুঁত, যেমন তার কানা হওয়া। অতএব যখন সে মানুষকে বলবে তাকে রব হিসেবে মেনে নিতে, তখন তাদের মধ্যে সর্বনিম্ন বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও বুঝতে পারবে- যে নাকি নিজের খুঁত সারাতে অক্ষম, সে কি করে অন্যকে সৃষ্টি করতে পারে, সুঠোম ও সুন্দর করতে পারে? অতএব দাজ্জালের প্রতিবাদে সর্বনিম্ন যা বলা আবশ্যিক হবে, তা হলো- হে অমুক! তুমি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা বলে যে দাবি করছ, তা যদি সঠিক হয়, তাহলে আগে তুমি নিজের দেহকে ঠিক করো, তাতে যে খুঁত রয়েছে তা সরাও। আর যদি বল যে, যে রব সে তার শরীর থেকে কোনোকিছু সরায় না, তাহলে কমপক্ষে তোমার দুচোখের মাঝখানে যা লেখা আছে, তা সরিয়ে নাও। [প্রাগুক্ত]

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৩৬ : কেয়ামতের বড় আলামত-০৪ : ঈসা আলাইসিস
সালামের অবতরণ

priyo.Islam

০৩ মার্চ ২০১৪, সময় - ০৮:২২

ঈসা আলাইসিস সালামের অবতরণ

শেষ জমানায়, কেয়ামতের পূর্বে, ঈসা আলাইসিস সালামের অবতরণ-প্রসঙ্গ সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা-ঐকমত্যও রয়েছে। তিনি এসে দাঙ্গালকে হত্যা করবেন। ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী তিনি শাসন পরিচালনা করবেন। মানুষ ইসলামের যা-কিছু পরিত্যাগ করেছে, তা তিনি জিন্দা করবেন। আল্লাহ তাআলা যতদিন চান তিনি পৃথিবীতে থাকবেন। এর পর তিনি ইন্তেকাল করবেন। মুসলমানরা তাঁর জানাজার নামাজ পড়বে এবং দাফন করবে। এ বিষয়ে বহু সহিহ হাদিস রয়েছে। এ সব হাদীসের কয়েকটি ওপরে গিয়েছে। অতএব প্রতিটি মুসলমানের আবশ্যিক দায়িত্ব হলো ঈসা আলাইসিস সালামের অবতরণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইসিস সালাম সম্পর্কে যা-কিছু বলেছেন, তার প্রতি ঈমান আনা। যেমন- ঈসা আলাইসিস সালামকে ইহুদিরা হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তাআলা তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং তিনি কেয়ামতের আগে পৃথিবীতে নেমে আসা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

‘এবং তাদের (এই) কথার কারণে যে,
‘আমরা আল্লাহর রাসূল মারিয়াম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি’। অথচ তারা তাকে
হত্যা করেনি এবং তাকে শূলেও চড়ায়নি। বরং তাদেরকে ধাঁধায় ফেলা হয়েছিল। আর
নিশ্চয় যারা তাতে মতবিরোধ করেছিল,
অবশ্যই তারা তার ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ছিল। ধারণার অনুসরণ ছাড়া এ ব্যাপারে তাদের
কোন জ্ঞান নেই। আর এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তাঁর
কাছে তাকে
তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ মহা
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। কিতাবীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তার মৃত্যুর পূর্বে তার
প্রতি ঈমান আনবে না [কেয়ামতের পূর্বে ঈসা আ. যখন অবতরণ করবেন, তখন সে
যুগের ইহুদি ও
খ্রিষ্টানগণ পুরো বিষয়টি
উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং সকলেই মৃত্যুর মুহূর্তে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে; কিন্তু
ফির‘আউনের মতো তাদের ঈমান তখন কোন কাজে আসবে না।] এবং কেয়ামতের দিনে
সে তাদের বিরুদ্ধে
সাক্ষী হবে’ - (সূরা আন-
নিসা, ১৫৭-১৫৯)।

‘অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং তাকে শূলেও
চড়ায়নি। বরং তাদেরকে ধাঁধায় ফেলা হয়েছিল।’

এ আয়াতাংশ ---

----- এবং

‘কিতাবীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তার মৃত্যুর
পূর্বে তার প্রতি ঈমান আনবে না।’

এ আয়াতাংশ পড়ে দেখলে উল্লিখিত বিশ্বাসটির প্রমাণ আল কোরান থেকেই পাওয়া যায়।

ইমাম ইবনে কাছীর র. বলেছেন , ‘ইবনে জারীর বলেন, এসব কথার মধ্যে প্রথম
কথাটিই অধিক শুদ্ধ। অর্থাৎ ঈসা আলাইসিস সালামের অবতরণের পর আহলে কিতাবের

মধ্যে এমন কেউ থাকবে না, যে ঈসা আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না। এটা নিঃসন্দেহ যে, ইবনে জারীরের কথাই বিশুদ্ধ, কারণ আয়াতের আবহ-ঈসা আলাইহিস সালামকে শূলে চড়ানো, হত্যা করা ও মূর্খ খ্রিষ্টানদের দ্বারা তাঁর ইহুদিদের হাতে সোপর্দ হওয়া- ইত্যাদিকে বাতিল বলে ঘোষণা করছে। আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, বিষয়টি এরূপ ছিল না। বরং তাদের ধাঁধায় ফেলা হয়েছিল এবং তারা যাকে হত্যা করেছিল সে ছিল অন্য ব্যক্তি, যাকে ঈসা আলাইহিস সালামের সদৃশ করে দেয়া হয়েছিল। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর কাছে ঈসা আলাইহিস সালামকে উঠিয়ে নেন। তিনি এখনো জীবিত আছেন। তিনি- মূতাওয়াতির হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী- কেয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। দাজ্জালকে হত্যা করবেন। ক্রস ভেঙ্গে ফেলবেন। শূকর নিধন করবেন। জিমিয়া উঠিয়ে দেবেন। অতঃপর এ আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী সকল আহলে কিতাবই এ সময় তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, তাদের কেউ-ই বাকি থাকবে না। [তাকসিরে ইবনে কাছীর ১/৫৭৭]

অন্য এক হাদীসে আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যার হাতে আমার আত্মা, তাঁর কসম! তোমাদের কাছে, ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে ইবনে মারযামের অবতরণ অবশ্যই অত্যাসন্ন।

সে ক্রস ভেঙ্গে ফেলবে [ক্রস ভেঙ্গে ফেলার অর্থ- ঈসা আলাইহিস সালাম প্রকৃত অর্থেই তা ফেঙ্গে ফেলবেন এবং খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ক্রসের তামিএ সম্মান বিষয়ক যে ধারণা রয়েছে, তা তিনি বাতিল করে দেবেন। ক্রস ভেঙ্গে ফেলার অর্থ এটাও হতে পারে যে, তিনি খ্রিষ্টানদের ক্রসনির্ভর বিশ্বাস মিথ্যা প্রতিপন্ন করবেন। অর্থাৎ তাদের এ দাবি যে, ইহুদিরা ঈসা আলাইহিস সালামকে কাঠের ওপর শূলে চড়িয়েছিল। দেখুন: আদীনুল খালেস: ১/৯২],

শূকর নিধন করবে,

জিমিয়া উঠিয়ে দেবে, [জিমিয়া উঠিয়ে দেয়ার অর্থ- তিনি আহলে কিতাবের ওপর জিমিয়া আরোপ-নীতি বাতিল করে দেবেন। তাদের সামনে শুধু একটি সুযোগই অবশিষ্ট রাখবেন। আর তা হলো ইসলাম গ্রহণ করা। জিমিয়া উঠিয়ে দেয়ার অর্থ এটা নয় যে, তিনি শরীয়তের কোনো বিধান বাতিল করে দেবেন। হাদিসটি যা বুঝাচ্ছে, তা হলো আহলে কিতাবদের থেকে জিমিয়া গ্রহণনীতি ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ অবধি বলবদ থাকবে। দেখুন প্রাগুক্ত ১/৯৩]

তার সময়ে সম্পদ উপচে পড়বে, [অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম মানুষের মধ্যে যে ন্যায়-ইনসাফ কায়ম করবেন, তার ফলে সম্পদ বেড়ে যাবে।] এমনকি কেউ তা গ্রহণ করবে না। আর সে সময়ের এক সিজদা, দুনিয়া ও তাতে যা আছে, তার চেয়েও উত্তম মনে হবে।' [অর্থাৎ কেয়ামত এসে গেছে জেনে মানুষ সম্পদের প্রতি নিরাগ্রহ হয়ে পড়বে এবং আল্লাহর আনুগত্যে তারা অধিক আগ্রহী হয়ে ওঠবে।]

ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ বিষয়ে বহু সহিহ হাদিস রয়েছে। [দেখুন: বুখারি, আস-সহিহ (ফাতহুল বারীসহ ৭/৩০২; মুসলিম, আস-সহিহ (নববীর ব্যাখ্যাসহ) ২/১৮৯; তিরমিযি ৯/৭৬; ইবনে মাজাহ ২য় খন্ড, কিতাবুল ফিতান; আল ফাতহুররাব্বানী ২/১৪৩]

কাজী আয়ায বলেন, 'ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ এবং দাজ্জালকে হত্যা করা, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের একটি সত্য-শুদ্ধ বিশ্বাস, কেননা এ ক্ষেত্রে সহিহ হাদিসসমূহের দলিল রয়েছে। উপরন্তু আকল ও শরীয়তে এমন কিছু নেই যা এ বিশ্বাসকে

বাতিল করে দেয়। অতএব এ বিশ্বাসটি প্রতিষ্ঠিত করা ওয়াজিব। তবে মুতাজেলা সম্প্রদায়ের কেউ-কেউ এবং যারা তাদের বক্তব্যের সঙ্গে সুর মেলায়, তারা এ বিশ্বাসটি অস্বীকার করেছে। তাদের ধারণা, এ বিষয়ক হাদিসগুলো অকার্যকর হয়ে যাবে; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বশেষ নবি হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা ‘এবং সর্বশেষ নবি’ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোষণা, ‘আমার পরে আর কোনো নবি নেই’ এবং এ ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমা যে, আমাদের নবির পর অন্যকোনো নবি আসবে না, আমাদের নবির শরীয়ত কেয়ামত অবধি চলমান থাকবে, বাতিল হবে না- এসব দলিলের কারণে ঈসা আলাইহিস সালাম সংক্রান্ত হাদিসগুলো অকার্যকর হয়ে যাবে। বস্তুত মুতাজেলাদের এ কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক; কারণ ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণের অর্থ এটা নয় যে, তিনি নবি হিসেবে শরীয়ত নিয়ে অবতরণ করবেন, যা আমাদের শরীয়তকে বাতিল করে দেবে। সংশ্লিষ্ট হাদিসগুলোর কোথাও এ জাতীয় বক্তব্য আসেনি। বরং হাদিসগুলো যে কথা স্পষ্ট করেছে, তা হলো ঈসা আলাইহিস সালাম আমাদের শরীয়ত অনুযায়ী ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে অবতরণ করবেন। আমাদের শরীয়তের মধ্যে মানুষ যা বাদ দিয়েছে, তিনি তা প্রতিষ্ঠা করে শাসন করবেন। [মুসলিম, আস-সহিহ (নববীর ব্যাখ্যাসহ) ১৮/৭৫-৭৬]

ইয়াজুজ মাজুজের প্রকাশ

এ আলামতটি খোদ আল-কোরানেরই উল্লিখিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, ‘

তারপর সে আরেক পথ অবলম্বন করল। অবশেষে যখন সে দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছল, তখন সেখানে সে এমন এক জাতিকে পেল, যারা তার কথা তেমন একটা বুঝতে পারছিল না। তারা বলল, ‘হে যুলকারনাইন! নিশ্চয় ইয়াজুজ ও মাজুজ জমিনে অশান্তি সৃষ্টি করছে, তাই আমরা কি আপনাকে এ জন্য কিছু খরচ দেব যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটা প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন’? সে বলল, ‘আমার রব আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, সেটাই উত্তম। সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব’। ‘তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও’। অবশেষে যখন সে দু’পাহাড়ের মধ্যবর্তী জায়গা সমান করে দিল, তখন সে বলল, ‘তোমরা ফুক দিতে থাক’। অতঃপর যখন সে তা আগুনে পরিণত করল, তখন বলল, ‘তোমরা আমাকে কিছু তামা দাও, আমি তা এর উপর ঢেলে দেই’। এরপর তারা (ইয়া’জুজ ও মা’জুজ) প্রাচীরের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে পারল না এবং নিচ দিয়েও তা ভেদ করতে পারল না। সে বলল, ‘এটা আমার রবের অনুগ্রহ। অতঃপর যখন আমার রবের ওয়াদাকৃত সময় আসবে তখন তিনি তা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন। আর আমার রবের ওয়াদা সত্য’ - (সূরা আল কাহাফ , ৯২-৯৭)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, حَذَّبَ كُلِّ مَنْ وَهُمْ وَمَأْجُوجُ يَأْجُوجُ فُتِحَتْ إِذَا حَتَّى يَا كَفَرُوا الَّذِينَ أَبْصَارُ شَاخِصَةً هِيَ إِذَا فِ الْحَقِّ الْوَعْدُ وَاقْتَرَبَ يَنْسَلُونَ ظَالِمِينَ كُنَّا بَلْ هَذَا مِنْ غَفْلَةٍ فِي كُنَّا قَدْ وَيلْنَا ‘

অবশেষে যখন ইয়া’জুজ ও মা’জুজকে মুক্তি দেয়া হবে, আর তারা প্রতিটি উঁচু ভূমি হতে ছুটে আসবে। আর সত্য ওয়াদার সময় নিকটে আসলে হঠাৎ কাকেরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। তারা বলবে, ‘হায়, আমাদের দুর্ভোগ! আমরা তো এ বিষয়ে উদাসীন ছিলাম বরং আমরা ছিলাম জালিম’ (সূরা আল আশ্বিয়া , ৯৬-৯৭)।

ইয়াজুজ-মাজুজের উল্লেখে যেসব সহিহ হাদিস এসেছে, তন্মধ্যে একটি হলো যায়নাব বিনতে জাহশ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এখানে একদিন উৎকর্ষিত অবস্থায় এসে হাজির হয়েছেন এবং বলেছেন, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আরবদের জন্য আফসোস এমন একটি অকল্যাণের জন্য যা অবশ্যই নিকটে চলে এসেছে। আজ ইয়াজুজ-মাজুজের বাঁধ এই পরিমাণ খুলে দেয়া হয়েছে। এটা বলে তিনি তাঁর বৃদ্ধাপুলি ও তার পাশের আগুলি দ্বারা বৃত্ত তৈরি করলেন।’ যায়নাব বিনতে জাহশ (রাযি.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি ধ্বংস হয়ে যাব, আমাদের মধ্যে নেককার লোকেরা থাকা সত্ত্বেও? তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, যদি অপকর্ম বেড়ে যায়।’ [বুখারি, আস-সহিহ (ফাতহুল বারীসহ) ১৩/১৯ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো।]

কেয়ামতের আলামতসংবলিত একটি হাদিস নাওয়াস ইবনে সামআন (রাযি.) থেকে ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। হাদিসটিতে দাজ্জাল, ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজ ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। হাদিসটির একাংশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা ইয়াজুজ-মাজুজ পাঠাবেন। তারা প্রতিটি উঁচু ভূমি হতে

ছুটে আসবে। তাদের সম্মুখবর্তীরা তাবারিয়া হ্রদের কাছ দিয়ে যাবে এবং তাতে থাকা তাবৎ পানি পান করে ফেলবে। এরপর সর্বশেষে থাকা দলটি সেখান দিয়ে যাবে এবং বলবে, এখানে একদিন পানি ছিল।' [মুসলিম, আস-সহিহ (ইমাম নববীর ব্যাখ্যাসহ) ১৮/৬৮]

এ বিষয়ে সহিহ হাদীসে আরও রয়েছে। অতএব ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কিত আল-কোরানের আয়াত ও নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিহ হাদিসসমূহ, শেষ জমানায় এই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী জাতির প্রকাশ ঘটা বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত ও অকাট্য জ্ঞান দিচ্ছে। তাই একজন মুমিনের ওপর আবশ্যিক দায়িত্ব হলো ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে আল কোরান ও সহিহ সুন্নাহয় যা আছে, তার প্রতি ঈমান আনা। অবশ্য ইয়াজুজ-মাজুজ কোন যুগে প্রকাশ পাবে এবং তাদের বিষয়ে অন্যান্য বিস্তারিত তথ্য কী, তাদের আকার-বৈশিষ্ট্য কি, প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে তাদের অবস্থানের জায়গা কোথায়- এ সব বিষয় গায়েবি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যার ইলম একমাত্র আল্লাহ তাআলাই রাখেন।

শেষ দিবসের শুরু

এরপর আমাদের যে বিষয়টির ওপর ঈমান আনা আবশ্যিক, তা হলো শেষ দিবস শুরু হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আমাদের যা জানিয়েছে, বিশেষ করে সূরা আত-তাকউইর ও সূরা আল ইনফিতার-এ যা-কিছু উল্লিখিত হয়েছে এবং শেষ দিবস ও তাতে যা যা ঘটবে তার প্রতি ঈমান আনা। এ বিষয়ক সকল আয়াত একত্র করলে যে তথ্যটি পাই, তা হলো- শেষ দিবস শুরু হবে মহাবিশ্বে ব্যাপক পরিবর্তন দৃশ্যমান হওয়ার সঙ্গে। যেমন, আকাশ বিদীর্ণ হওয়া, নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া, গ্রহসমূহের পরস্পরে সংঘর্ষ হওয়া, জমিন খন্ড-বিখন্ড হয়ে যাওয়া এবং তা বিরানভূমিতে পরিণত হওয়া। পাহাড়গুলোর তুলার মতো উড়ে যাওয়া। সব কিছু বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়া। মানুষ এ পৃথিবীতে যা কিছু চেনে ও জানে তা ধ্বংস হয়ে যাওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন,

غَيْرَ الْأَرْضِ تُبَدَّلُ يَوْمَئِذٍ
الْقَهَّارِ الْوَاحِدِ لِلَّهِ وَبَرَزُوا وَالسَّمَوَاتِ الْأَرْضِ

যেদিন এ জমিন ভিন্ন জমিনে

রূপান্তরিত হবে এবং আসমানসমূহও। আর তারা একচ্ছত্র ক্ষমতাধর এক আল্লাহর সামনে হাজির হবে’ - (সূরা ইব্রাহীম , ৪৮)।

এটা ঘটবে ইসরাফীল আলাইসি সালামের শিঙ্গায় প্রথম ফুক দেয়ার পর। অতঃপর আসমানসমূহের ও জমিনে যারা আছে, তাদের সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করেন তারা ছাড়া। [দেখুন ফাতহুল বারী ১১/৩১৩]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فِي مَنْ فَصَعِقَ الصُّورِ فِي وَنُفِخَ
هُمْ فَإِذَا أُخْرِى فِيهِ نُفِخَ ثُمَّ لَئِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ إِلَّا الْأَرْضِ فِي وَمَنْ السَّمَوَاتِ
يَنْظُرُونَ قِيَامُ

‘আর শিঙ্গায় ফুক দেয়া হবে। ফলে আল্লাহ

যাদেরকে ইচ্ছা করেন তারা ছাড়া আসমানসমূহে যারা আছে এবং পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই বেহুঁশ হয়ে পড়বে। তারপর আবার শিঙ্গায় ফুক দেয়া হবে, তখন তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে’ - (সূরা আয-যুমার , ৫৭)।

তিনি অন্য-এক আয়াতে বলেন, وَحُمِلَتْ . وَاحِدَةً نَفْخَةً وَرَالِطُ فِي نُفْخٍ فَإِذَا
وَأَنْشَقَّتْ . الْوَاقِعَةُ وَقَعَتْ فَيَوْمَئِذٍ . وَاحِدَةً ذَكَّةً فَذَكَّتَا وَالْجِبَالُ الْأَرْضُ
وَاهِيَةً يَوْمَئِذٍ فَهِيَ السَّمَاءُ

‘অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুক

দেয়া হবে- একটি মাত্র ফুক। আর জমিন ও পর্বতমালাকে সরিয়ে নেয়া হবে এবং মাত্র একটি আঘাতে এগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। ফলে সে দিন মহাঘটনা সংঘটিত হবে। আর আসমান

বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

ফলে সেদিন তা হয়ে যাবে দুর্বল বিক্ষিপ্ত’ - (সূরা আল হাক্বাহ , ১৩-১৬)।

আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে মুঠো দিয়ে ধরবেন এবং আকাশকে তাঁর ডান হাত দিয়ে ভাঁজ করে ফেলবেন। এর পর বলবেন, আমিই রাজা, দুনিয়ার রাজারা কোথায়? [বুখারি, আস-সহিহ (ফাতুহুল বারিসহ) ১১-৩২৩] পুনরুত্থান আমরা ঈমান রাখি যে আল্লাহ তাআলা, এরপর, শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুক দেয়ার নির্দেশ দেবেন। [الرَّاجِفَةُ تَرْجِفُ يَوْمَ -]

الرَّادِفَةُ تَنْبَعُهَا . 'সেদিন কম্পনকারী প্রকম্পিত করবে। তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তী কম্পনকারী' - (সূরা আন-নাবিয়াত: ৬-৭)। এই আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তাআলা শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। 'সেদিন কম্পনকারী প্রকম্পিত করবে' এর দ্বারা প্রথম ফুঁক এবং 'তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তী কম্পনকারী' এর দ্বারা দ্বিতীয় ফুঁককে বুঝানো হয়েছে। দেখুন: বুখারি, আস-সহিহ (ফাতহুল বারিসহ ১/৩১০-৩১১।] এ ফুঁকের পর মৃতরা পুনরায় জীবনপ্রাপ্ত হবে। আর এটাই হবে পুনরুত্থান। অর্থাৎ মানুষ পৃথিবীতে যে রকম আত্মা ও শরীরের সমন্বিত অস্তিত্ব ছিল, এখানেও তাকে অনুরূপ অস্তিত্ব ফিরিয়ে দেয়া হবে। মানুষ জীবন্ত হয়ে ওঠে আসবে। কাফের ও মুনাফেকরা বলবে, 'হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উঠালো'? [সূরা ইয়াসীন: ৫২ নং আয়াতের অর্থানুবাদ] আর মুমিনরা বলবে, 'এটা তো তা, যার ওয়াদা পরম করুণাময় করেছিলেন এবং রাসূলগণ সত্য বলেছিলেন। ' [সূরা ইয়াসীন: ৫২ নং আয়াতের অর্থানুবাদ]

সহিহ হাদিসসমূহের বক্তব্য মূতাবেক, প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি তাঁর কবর থেকে বের হয়ে আসবেন। তিনি বলেছেন, 'বেহুঁশ হয়ে পড়ার সময় এলে মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়বে। অতঃপর আমি হব প্রথম ব্যক্তি যে ওঠে দাঁড়াবে। এ সময় আমি মূসাকে দেখতে পাব, সে আরশ ধরে আছে। আমি জানি না, যারা বেহুঁশ হয়েছে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কি না। [বুখারি, আস-সহিহ (ফাতহুল বারীসহ) ১১/৩১২]

হাশর

মানুষের পুনরুত্থান ও কবর থেকে বের হয়ে আসার পর তাদের হাশর হবে, এ ব্যাপারে আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

جَهَنَّمَ إِلَى الْمُجْرِمِينَ وَنَسُوقُ . وَفَدًا الرَّحْمَنُ إِلَى الْمُتَّقِينَ نَحْشُرُ يَوْمَ
وَرَدًا

‘যেদিন পরম করুণাময়ের নিকট মুতাকিদেরকে সম্মানিত মেহমানরূপে সমবেত করব, আর অপরাধীদেরকে তুচ্ছভাবে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব’ - (সূরা মারয়াম , ৮৫-৮৬)।

হাশর হলো ফয়সালার জন্য যে জায়গায় অপেক্ষমান থাকতে হবে, সে জায়গার দিকে সবাইকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া। মানুষের পুনরুত্থানের পর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের নির্দেশ দেবেন সবাইকে এ জায়গায় হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে। সে সময় সবার অবস্থা থাকবে, যেভাবে পৃথিবীতে এসেছিল, ঠিক সে রকম। অর্থাৎ সবাই থাকবে নগ্নপদ- কারও পায়ে জুতা থাকবে না। সবাই থাকবে উলঙ্গ- কারও গায়ে বস্ত্র থাকবে না। সবাই থাকবে খতনাহীন অবস্থায়।

আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘কেয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে নগ্নপদ, উলঙ্গ ও খতনাবিহীন অবস্থায়। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দেখবে? তিনি বললেন, ‘হে আয়েশা, বিষয়টি একজন অন্যজনের দিকে তাকানোর চেয়েও অধিক ভয়াবহ।’

ইবনে আববাস (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বক্তৃতা করে বলেছেন, ‘হে লোক সকল, নিশ্চয় তোমাদের কেয়ামতের দিন একত্র করা হবে নগ্নপদ, উলঙ্গ ও খতনাবিহীন অবস্থায়। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন,

ثُعَيْبُهُ خَلَقَ أَوَّلَ بَدَأْنَا كَمَا

‘যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করব’ - (সূরা আল আশ্বিয়া , ১০৪)।

এরপর তিনি বললেন, ‘জেনে রাখো, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাকে কাপড় পড়ানো হবে তিনি হলেন ইব্রাহীম। আর জেনে রাখো যে, আমার উম্মতের মধ্য থেকে কতগুলো লোককে নিয়ে আসা হবে, যাদের বা দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব, হে আমার রব, এরা আমার সাথী। অতঃপর বলা হবে, তুমি জান না তোমার পর এরা দ্বীনে কি উদ্ভাবন করেছিল! হাশরের ময়দানে মানুষ সীমাহীন কষ্টে নিপতিত হবে।

মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘কেয়ামতের দিন সূর্য মানুষের নিকটবর্তী হবে, এমনকি তা তাদের থেকে এক মাইল দূরত্বে চলে আসবে। আর মানুষ নিজ-নিজ আমল অনুপাতে ঘামে নিপতিত হবে। তাদের মধ্যে কারও পায়ে গিঁঠ পর্যন্ত ডুবন্ত থাকবে, কারও থাকবে হাঁটু পর্যন্ত, কারও

থাকবে কোমর পর্যন্ত, আবার কারও ঘাম তার মুখে লাগাম পড়িয়ে দেবে। এই বলে তিনি তাঁর মুখের দিকে ইশারা করলেন। [মুসলিম, আস-সহিহ (নববীর ব্যাখ্যাসহ)]

আর সে মুহূর্তে কিছু মানুষ থাকবে যাদের আল্লাহ তাআলা তার ছায়ায় ছায়া দেবেন। যেমন হাদীসে এসেছে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর ছায়ায় ছায়া দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্যকোনো ছায়া থাকবে না। তারা হলো- ইনসাফগার শাসক; ওই যুবক যে আল্লাহর ইবাদতে বড় হয়েছে; এমন ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সঙ্গে ঝুলন্ত ছিল; ওই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহকে কেন্দ্র করে পরস্পরকে মহব্বত করেছে, তারা এ উদ্দেশ্যেই একত্র ও পৃথক হয়েছে; এমন পুরুষ যাকে পদমর্যাদাশীলা সুন্দরী নারী আহবান করেছে, কিন্তু সে বলেছে, আমি আল্লাহকে ভয় করি; এমন ব্যক্তি যে একটি সদকা করেছে, এবং সে তা গোপনীয়ভাবে করেছে, যাতে তার ডান হাত জানতে না পারে তার বাম হাত কি দান করল; আরেকজন হলো ওই ব্যক্তি যে লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহর যিকর করল, অতঃপর তার চোখ উপচে অশ্রু গড়ে পড়ল। [বুখারি, আস-সহিহ (আস্মুদির টিকাসহ) ১/১৭০; মুসলিম, আস-সহিহ (নববীর ব্যাখ্যাসহ) ৭/১২০-১২২]

মানুষের কষ্ট যখন প্রচন্ড আকার ধারণ করবে, তাদের দুর্ভোগ যখন মারাত্মক আকার নেবে, তখন আল্লাহর কাছে তারা নবি-রাসূলগণের সুপারিশ প্রার্থনা করবে, যাতে তিনি তাঁদের সুপারিশে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ দেন। তিনি তাদের বিচার-ফয়সালা দ্রুত সম্পন্ন করেন। আর প্রত্যেক রাসূলই তার পরবর্তী রাসূলের কাছে যেতে বলবেন। পরিশেষে তারা আমাদের নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসবে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে মানুষের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন এবং তিনি তার সুপারিশ কবুল করবেন।

[এটাই হলো শাফায়াতে উযমা বা মহা-শাফায়াত, যা নবি-রাসূলগণের মধ্যে কেবল আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যই সুনির্দিষ্ট ও বিশিষ্ট। এ ব্যাপারে উম্মতের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে, কেননা তা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আর এটা হলো মাকামে মাহমুদ - প্রশংসিত মাকাম- এর অন্তর্ভুক্ত, যার ওয়াদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ আয়াতে দেয়া হয়েছে -

مَحْمُودًا مَقَامًا رَبُّكَ يَبْعَثُكَ أَنْ عَسَىٰ لَكَ لَافِلَةٌ بِهِ فَتَهْجُدَ اللَّيْلَ وَمِنْ

‘আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করো তোমার অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে। আশ করা যায় তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন। ’ (আল ইসরা: ৭৯), শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ পৃ. ২৫২-২৫৩] অতঃপর মানুষের বিচার-ফয়সালা শুরু হয়ে যাবে।

আমলের প্রতিদান

শেষ দিবসে আমলের প্রতিদান দেয়া হবে, এ ব্যাপারে আমরা বিশ্বাস রাখি। অর্থাৎ মানুষ পৃথিবীর জীবনে যা-কিছু করেছে, ভালো কি মন্দ, সব কিছুই প্রতিদান দেয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يُوفِّيهِمْ يَوْمَئِذٍ
الْمُيِّنُ الْحَقُّ هُوَ اللَّهُ أَنْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ دِينَهُمْ اللَّهُ

সেদিন আল্লাহ

তাদেরকে তাদের ন্যায্য প্রতিদান পুরোপুরি দিয়ে দেবেন, আর তারা জানবে যে, আল্লাহই সুষ্পষ্ট সত্য' - (সূরা আন-নূর , ২৫)।

উক্ত আয়াতে 'দ্বীন' শব্দের অর্থ প্রতিদান। বলা হয়- كما تدان تدين অর্থাৎ তুমি যেভাবে প্রতিদান দাও সেভাবে তোমাকেও প্রতিদান দেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

جَاءَ مَنْ
عَمِلُوا الَّذِينَ يُجْزَى فَلَا بِالسَّيِّئَةِ جَاءَ وَمَنْ مِنْهَا خَيْرٌ فَلَهُ بِالْحَسَنَةِ
يَعْمَلُونَ كَانُوا مَا إِلَّا السَّيِّئَاتِ

কেউ পূণ্য নিয়ে

আসলে তার জন্য থাকবে তা থেকে উত্তম প্রতিদান। আর কেউ পাপ নিয়ে আসলে তবে যারা মন্দ কর্ম করেছে তাদের শুধু তারই প্রতিদান দেওয়া হবে যা তারা করেছে' - (সূরা আলকাসাস, ৮৪)।

হাদিসে কুদসিতে এসেছে, 'হে আমার বান্দারা, এগুলো তো তোমাদের আমল, যা তোমাদের জন্য হিসেব করছি। এরপর আমি তোমাদের তা পরিপূর্ণ আকারে দেব। অতএব যে ভালো পাবে, সে যেন আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে। আর যে এর অন্যথা পাবে, সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য-কাউকে দোষারোপ না করে। [সহিহ মুসলিমে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে কুদসীর একাংশ, দেখুন রিয়ামুস সালেহীন পৃ. ৬২]

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৪১ : শেষ দিবসের শুরু-০৪ : আল্লাহর সামনে পেশ ও হিসাব

আল্লাহর সামনে পেশ ও হিসাব আমরা বিশ্বাস করি যে, ইনসাফপূর্ণ বিচারের পরই প্রতিদান দেয়া হবে। মানুষকে সে-সময় আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে। মানুষের ওপর সাক্ষী-প্রমাণ দাঁড় করানো হবে। তারা যা আমল করেছে, তা তাদের জানানো হবে। তাদের দিয়ে তাদের আমলনামা পড়ানো হবে। অতএব আল্লাহর সামনে মানুষকে পেশ করা, মানুষের হিসাব নেয়া, আমলনামা পড়ানো ইত্যাদি সবই সঠিক বলে ঈমান আনতে হবে। কোরান-সুননাহ ও আলেমদের ইজমা হলো এ ক্ষেত্রে দলিল। মানুষকে আল্লাহর সামনে পেশ করা সম্পর্কে আল-কোরানে এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

الْوَاقِعَةُ وَقَعَتْ قَيَوْمَئِذٍ
وَيَحْمِلُ أَرْجَائِهَا عَلَى وَالْمَلِكُ . وَاهِيَةٌ يَوْمَئِذٍ فَهِيَ السَّمَاءُ وَانْشَقَّتْ
خَافِيَةٌ مِنْكُمْ تَخْفَى لَا تُعْرَضُونَ يَوْمَئِذٍ . ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ فَوْقَهُمْ رَبُّكَ عَرْشٌ
كَتَابِيَّةٌ اقْرَأُوا هَؤُلَاءِ فَيَقُولُ بِيَمِينِهِ كِتَابُهُ أُوتِيَ مَنْ فَأَمَّا .

‘ফলে সে দিন মহা-ঘটনা সংঘটিত

হবে। আর আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে। ফলে সেদিন তা হয়ে যাবে দুর্বল বিক্ষিপ্ত।

ফেরেশতাগণ আসমানের বিভিন্ন প্রান্তে থাকবে। সেদিন তোমার রবের আরাধকে আটজন

ফেরেশতা

তাদের উর্ধ্ব বহন

করবে। সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন গোপনীয়তাই গোপন

থাকবে না। তখন যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবে, ‘নাও, আমার

আমলনামা পড়ে

দেখ’

- (সূরা আল হাক্বাহ , ১৫-১৯)।

আল্লাহ তাআলা অন্য-এক আয়াতে বলেন,

مَرَّةٍ أَوَّلَ خَلْقِنَاكُمْ كَمَا جِئْتُمُونَا قَدْ

صَفَا رَبُّكَ عَلَى وَعُرْضُوا

‘আর তাদেরকে তোমার রবের

সামনে উপস্থিত করা হবে কাতারবদ্ধ করে। (আল্লাহ বলেন) ‘তোমরা আমার কাছে

এসেছ তেমনভাবে, যেমন আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম; বরং তোমরা তো

ভেবেছিলে আমি তোমাদের জন্য কোনো প্রতিশ্রুত মুহূর্ত রাখিনি’ - (সূরা আল কাহফ ,

৪৮)।

অতএব এ ব্যাপারে প্রতিটি মুসলমানের বিশ্বাস থাকা ওয়াজিব যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আল্লাহ তাআলার সামনে পেশ করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা নিজেই প্রত্যেক ব্যক্তির হিসাব নেবেন। এ ক্ষেত্রে অন্য কেউ মাধ্যম হিসেবে থাকবে না।

আদী ইবনে হাতেম (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের সঙ্গেই আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন কথা বলবেন। আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোনো অনুবাদক থাকবে না। এরপর বান্দা চেয়ে দেখবে, কিন্তু সে তার সামনে কিছুই দেখতে পাবে না। এরপর সে তার দু’হাতের মধ্যবর্তী সন্মুখে চেয়ে দেখবে। অতঃপর সে জাহান্নামকে তার সামনে অভ্যর্থনাকারী হিসেবে পাবে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চায়, সে যেন এক টুকরো খেজুর দিয়ে হলেও তা করে। [বুখারি, আস-সহিহ (ফাতহুল বারীসহ) ১১/৩৪০]

পেশ করার মধ্যে আমল বের করা ও প্রকাশ করাও शामिल। অতএব পাপীকে তার পাপ সম্পর্কে অবহিত করা হবে। যদি সে নাজাতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে- আমলনামা ডান

হাতে পেয়ে থাকে- তবে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। হিসাব নেয়ার জন্য তাকে আর জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। বরং আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তাকে জাহান্নামে আজাব দেবেন না। পক্ষান্তরে যার পাপ-গুনাহ বেশি হবে এবং তার আমলনামা পেছন দিক থেকে দেয়া হবে, তাকে হিসাব নেয়ার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ছোট-বড় সকল পাপ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘কেয়ামতের দিন কাউকে হিসাব নেওয়ার অর্থই হবে তার ধ্বংস হয়ে যাওয়া।’ আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ‘আর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে তাকে হিসাব নেয়া হবে সহজ হিসাব?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘এটা হলো, উপস্থাপন করা। কিন্তু যাকে হিসাবের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তাকেই আজাব দেয়া হবে। [বুখারি, আস-সহিহ (ফাতহুল বারীসহ) ১১/১৩৮] মুনাকাশা তথা জিজ্ঞাসাবাদের অর্থ হলো তল্লাতন্ন করে হিসাব নেয়া। ছোট-বড়-তুচ্ছ সব জিজ্ঞাসা করা, এ ব্যাপারে আদৌ কোনো ক্ষমা প্রদর্শন না করা। [ফাতহুল বারী ১১/৩৩৭]

আমলনামা

কেয়ামতের দিন বান্দাদের আমলনামা লাভ ও পাঠ করা, হক ও সত্য হিসেবে আমাদের আবশ্যিকভাবে বিশ্বাস করতে হবে। যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

الْإِنْسَانُ وَكُلُّ
يَلْقَاهُ كِتَابًا الْيَوْمَ لَهُ وَنُخْرِجُ عَنْهُ فِي طَائِرِهِ أَلْزَمْنَاهُ
حَسِيبًا عَلَيْكَ الْيَوْمَ بِنَفْسِكَ كَفَى كِتَابَكَ اقْرَأ . مَنشُورًا

‘আর আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার ঘাড়ে সংযুক্ত করে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিন তার জন্য আমি বের করব একটি কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত। পাঠ কর তোমার কিতাব, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-

নিকাশকারী হিসেবে যথেষ্ট’ - (সূরা আল ইসরা , ১৩-১৪)।

অতএব আমলনামা সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা যা বলেছেন, তার প্রতিও আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। ইরশাদ হয়েছে,

الْإِنْسَانُ أَتَاهَا يَأ
بِيَمِينِهِ كِتَابَهُ أَوْتِي مَنْ قَامًا . مُلَاقِيهِ فَكَذَّبَا رَبَّكَ إِلَى كَادِحٍ إِنَّكَ
مَنْ وَأَمَّا . مَسْرُورًا أَهْلِهِ إِلَى وَيَنْقَلِبُ . يَسِيرًا حِسَابًا يُحَاسِبُ فَسَوْفَ
إِنَّهُ . سَعِيرًا وَيَضَلَّى . ثُبُورًا يَدْعُو فَسَوْفَ . ظَهْرِهِ وَرَاءَ كِتَابِهِ أَوْتِي
لَهُ أَهْلٌ فِي كَانَ
بَصِيرًا بِهِ كَانَ رَبُّهُ إِنَّ بَلَى . يَحُورَ لَنْ أَنْ ظَنَّ إِنَّهُ . مَسْرُورًا
হে মানুষ, তোমার

রব পর্যন্ত (পৌঁছতে) অবশ্যই তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। অতঃপর তুমি তাঁর সাক্ষাৎ পাবে। অতঃপর যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে; অত্যন্ত সহজভাবেই তার

হিসাব-নিকাশ করা হবে। আর সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে আনন্দিত হয়ে ফিরে যাবে। আর যাকে তার আমলনামা পিঠের পেছনে দেয়া হবে, অতঃপর সে ধ্বংস আহবান করতে থাকবে। আর সে স্বলন্ত

আগুনে প্রবেশ করবে। নিশ্চয় সে তার পরিবার-পরিজনদের মধ্যে আনন্দে ছিল। নিশ্চয় সে মনে করত যে, সে কখনো ফিরে যাবে না। হ্যাঁ, নিশ্চয় তার রব তার প্রতি সম্যক দৃষ্টি দানকারী’ - (সূরা আল ইনশিকাক , ৬-১১)।

আমলনামাকে আল-কোরানে কিতাব বা সুহুফ বলা হয়েছে। আর তা হলো ওইসব খাতা, যাতে ফেরেশতাগণ পৃথিবীর জীবনে মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করেছেন। [শারহুল বানজুরী আলা জাওহারাতিতাওহিদ পৃ.২১৩]

আর আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি যে, ঈমানের একটি রোকন হলো, ফেরেশতা ও তাদের আমল সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আমাদের যা জানিয়েছেন, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আর এ বিশ্বাস স্থাপন তখনই হবে যখন আমরা ফেরেশতাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আমাদের যেসব বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন তার প্রতি এজমালি ও বিস্তারিত উভয় প্রকার ঈমান আনা হবে। অতএব আমাদের ঈমান আনতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের

সংরক্ষণ করা এবং আমাদের কথা ও কর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্য ফেরেশতা নিয়োজিত করে রেখেছেন। এঁরা হলেন সংরক্ষণকারী সম্মানিত লেখক ফেরেশতা, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করে বলেন,

عَلَيْكُمْ وَإِنْ

تَفْعَلُونَ مَا يَعْلَمُونَ . كَاتِبِينَ كِرَامًا . لَخَافِظِينَ

‘আর নিশ্চয় তোমাদের

উপর সংরক্ষকগণ রয়েছে। সম্মানিত লেখকবৃন্দ। তারা জানে, যা তোমরা কর’ - (সূরা আল ইনফিতার , ১০-১২)।

আল্লাহ তাআলা অন্য-এক আয়াতে বলেন ,

كِتَابُنَا هَذَا

تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ مَا نَسْتَنْسِخُ كُنَّا إِنَّا بِالْحَقِّ عَلَيْكُمْ يَنْطِقُ

‘এটি আমার লেখনী,

যা তোমাদের ব্যাপারে সত্য সহকারে কথা বলবে; নিশ্চয় তোমরা যা করতে আমি তা লিখে রাখতাম’ - (সূরা আল জাসিয়া, ২৯)।

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৪৩ : শেষ দিবসের শুরু-০৬ : হিসাব ও হিসাবের ধরন-
ধারণ

হিসাব

হিসাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হাশরের ময়দান পরিত্যাগ করার পূর্বে বান্দাদের খামিযে তাদের কথা-কর্ম-বিশ্বাসের হিসাব নেয়া, হোক তা ভালো বা মন্দ। আর এটা হবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমলনামা লাভ করার পর, তাদের কৃত আমল সম্পর্কে তাদের পরিচিত করার উদ্দেশ্যে। ইরশাদ হয়েছে,

إِلَىٰ ثُمَّ

يَعْمَلُونَ كَانُوا بِمَا فَيُنَبِّئُهُمْ مَرْجِعُهُمْ رَبُّهُمْ

তারপর তাদের

রবের কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তিনি জানিয়ে দেবেন তাদেরকে, যা তারা করত’
- (সূরা আল আনআম , ১০৮)।

হিসাবের ক্ষেত্রে মানুষের নানা পর্যায় থাকবে। কারও হিসাব হবে খুব সহজ। শুধু তার আমল তার সামনের উপস্থাপন করা হবে। সে যে গুনাহগুলো করেছে, আল্লাহ তাআলা সে গুনাহগুলো তাকে দেখাবেন। তিনি তা এমনভাবে দেখাবেন যে অন্য কেউ তা জানবে না। এরপর তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। আবার কাউকে খুঁটিনাটি সব জিজ্ঞাসা করা হবে। তার কোনো ওয়র-আপত্তি থেকে থাকলে পেশ করতে বলা হবে, কিন্তু তার কোনো ওয়রই গ্রহণযোগ্য হবে না। অতএব সে ধ্বংসশীলদের সঙ্গে ধ্বংস হবে। আল্লাহ তাআলা একজন ঘোষণাকারী ফেরেশতাকে নির্দেশ দেবেন, যাতে সকল মানুষের সামনে তার পাপগুলো উল্লেখ করে ঘোষণা করে। অতএব মুমিনের উচিত, হিসাবের সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই নিজের হিসাব নিজেই করে নেওয়া, সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পূর্বেই সংকাজ করায় যারপরনাই চেষ্টা করে যাওয়া, বিশ্বাস-কথা-কাজ এর হিসাব হবে এ ব্যাপারে দৃঢ় ঈমান পোষণ করা এবং তার জন্য প্রস্তুত হওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন,

كَانَ وَإِنْ

حَاسِبِينَ بِنَا وَكَفَىٰ بِهَا أَتَيْنَا خَرَدَلٍ مِنْ حَبَّةٍ لَمِثْقَا

‘কারো কর্ম

যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা হাযির করব। আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট’ - (সূরা আল আশ্বিয়া , ৪৭)।

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘বান্দার পা স্বস্থান থেকে সরবে না যতক্ষণ না তার বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, সে তা কিসে শেষ করেছে? তার ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, সে তাতে কি করেছে? তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, সে তা কোথা থেকে অর্জন করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে? তার শরীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে সে তা কিসে ক্ষয় করেছে? [মুসলিম, আস-সহিহ (নববীর ব্যাখ্যাসহ) ৩/৮৮]

হিসাবের ধরন-ধারণ হিসাবের ধরন-ধারণ কি হবে এ ব্যাপারে কোরান-সুন্নাহয় যা এসেছে, তাতে কোনো কমবেশ না করে ঈমান পোষণ করব এবং এর অতিরিক্ত কিছু জানার জন্য প্রশ্ন করব না- অতঃপর আমরা বিশ্বাস করব যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বান্দার দুনিয়ার জীবনের সকল আমল, কি ভালো কি মন্দ, স্মরণ করিয়ে দেবেন। তিনি বান্দাদের ওপর সাক্ষী দাঁড় করাবেন যা কিছু তিনি সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাতে চান। [মাহমুদ সাবকী

বলেন, ‘পাপী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেয়ামতের দিন এগারটি সাক্ষ্য দাঁড় করানো হবে- জিহবা, দু-হাত, দু-পা, চোখ, কান, চামড়া, জমিন, রাত ও দিন, সম্মানিত সংরক্ষক ও লেখক ফেরেশতা। এরপর তিনি বেশ কিছু আয়াত ও হাদিস দলিল হিসেবে পেশ করেন। দেখুন আদীনুল খালেস ১/১০৫ ও তদপরবর্তী।] অতঃপর জমিন সাক্ষী দেবে তার পৃষ্ঠে যা ঘটেছে, সে বিষয়ে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

الْأَرْضُ زُلْزِلَتْ إِذَا
يَوْمَئِذٍ . لَهَا مَا الْإِنْسَانُ وَقَالَ . أَثْقَالَهَا الْأَرْضُ وَأَخْرَجَتْ . زُلْزَالَهَا
أَشْثَاءُ النَّاسِ يَصُدُّرُ يَوْمَئِذٍ . لَهَا أَوْحَى رَبُّكَ بَيِّنًا . خَبَارَهَا تَحْدُثُ
مِثْقَالَ يَغْمَلُ وَمَنْ . يَزُهُ خَيْرًا ذَرَّةً مِثْقَالَ يَغْمَلُ فَمَنْ . أَعْمَالُهُمْ لِيُرَوْا
‘যখন

প্রচন্ড কম্পনে জমিন প্রকম্পিত হবে। আর জমিন তার বোঝা বের করে দেবে, আর মানুষ বলবে, ‘এর কী হল?’ সেদিন জমিন তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, যেহেতু তোমার রব তাকে নির্দেশ দিয়েছেন। সেদিন

মানুষ বিক্ষিপ্তভাবে বের হয়ে আসবে যাতে দেখানো যায় তাদেরকে তাদের নিজদের কৃতকর্ম। অতএব, কেউ অণু পরিমাণ ভালকাজ করলে তা সে দেখবে, আর কেউ অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করলে তাও সে দেখবে’ - (সূরা আয-যিলযাল)।

আবু হুরায়র (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিলাওয়াত করলেন (সেদিন জমিন তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে) এরপর বললেন, তোমরা কি জান, জমিনের বৃত্তান্ত কি? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, জমিনের বৃত্তান্ত হলো প্রত্যেক বান্দা ও বান্দী তার পৃষ্ঠে যা যা আমল করেছে, সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া। সে বলবে, অমুক অমুক দিন সে এই এই করেছে। তিনি বললেন, এটাই হলো বৃত্তান্ত বর্ণনা। [দেখুন তিরমিযি, আস-সুনান (ইবনুল আরাবির ব্যাখ্যাসহ) ৯/২৬০] আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে এ হিসাব প্রক্রিয়ায় আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্যও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যেমন জিহবা, হাত-পা, চামড়া ইত্যাদি। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের আরেকটি বিশ্বাস হলো যে, এ সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে আল্লাহর শত্রুদের কথা কাটাকাটি হবে। যেমন ইরশাদ হয়েছে,

اللَّهُ أَعْدَاءُ يُخْشَرُ وَيَوْمَ
سَمِعَهُمْ عَلَيْهِمْ شَهِدَ جَاءُهَا مَا إِذَا حَتَّى . يُوزَعُونَ فَهُمْ النَّارِ إِلَى
شَهِدْتُمْ لِمَ لَجَلُودِهِمْ وَقَالُوا . يَغْمَلُونَ كَانُوا بِمَا وَجَلُودُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ
مَرَّةً أَوَّلَ خَلْقِكُمْ وَهُوَ شَيْءٌ كُلُّ أَنْطَقَ الَّذِي اللَّهُ أَنْطَقْنَا قَالُوا عَلَيْنَا
وَمَا . تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ
وَلَكِنْ جُلُودَكُمْ وَلَا أَبْصَارَكُمْ وَلَا سَمْعَكُمْ عَلَيْكُمْ بِشَهِدَ أَنْ تَسْتَبْرُونَ كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ مِمَّا كَثِيرًا يَعْلَمُ لَا اللَّهُ أَنْ ظَنَنْتُمْ

‘আর যেদিন আল্লাহর

দুশমনদেরকে আগুনের দিকে সমবেত করা হবে তখন তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হবে। অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে

তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। আর তারা তাদের চামড়াগুলোকে বলবে, ‘কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে? তারা বলবে, ‘আল্লাহ আমাদের বাকশক্তি দিয়েছেন যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি

দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই প্রতি তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।’ তোমরা কিছুই গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চোখসমূহ ও

সাক্ষ্য দেবে না, বরং তোমরা মনে করেছিলে যে, তোমরা যা কিছু করতে আল্লাহ তার অনেক কিছুই জানেন না' - (সূরা ফুসসিলাত , ১৯-২২)।

হিসাব সম্পর্কে আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে, মুমিন বান্দাদের হিসাবের সময় আল্লাহ তাআলা করুণা প্রদর্শন করবেন। পক্ষান্তরে কাফেরদের তিনি আদৌ ছাড় দেবেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস থেকে আমরা এটাই জানতে পারি। অতঃপর আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দা থেকে একান্তে হিসাব নেবেন। সে যেসব গুনাহ করেছে, তা তাকে স্বীকার করাবেন। তিনি তাকে হিসাবের খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করবেন না।

এক বর্ণনায় এসেছে, ইবনে উমর (রাযি.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, নাজওয়া - অর্থাৎ পরকালে মুমিন বান্দার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার একান্তে কথা বলা- সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কী বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, 'মুমিন তার রবের নিকটবর্তী হবে... আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি কি এই এই কাজ করেছ? সে বলবে, হ্যাঁ, করেছি। তিনি বলবেন , তুমি কি এই এই কাজ করেছ? সে বলবে, হ্যাঁ, করেছি। এরপর তিনি বলবেন, দুনিয়াতে আমি তোমার গুনাহ গোপন রেখেছি। আর আজ আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি। এরপর তাকে তার পুণ্যকর্মের আমলনামা দেয়া হবে। এর বিপরীতে, কাফেরদের ব্যাপারে উপস্থিত সকলের সামনে ঘোষণা করে বলা হবে- এরাই তারা, যারা তাদের রবের ওপর মিথ্যা আরোপ করেছে। জেনে রাখো, জালেমদের ওপর আল্লাহর লানত।' [ইমাম নববী প্রণীত সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যা ১৫/৫২; শারহুল আকীদা আত্-তাহাবিয়্যা পৃ.২৫০]

হাউজ

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর উম্মতের ওপর অনুকম্পাস্বরূপ আল্লাহ তাআলা যে হাউজ দান করবেন, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অত্যাৱশ্যক। এ ব্যাপারে যেসব হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তা সব মিলিয়ে মূতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছায়। ত্রিশ জনেরও অধিক সাহাবী (রাযি.) এ বিষয়ক হাদিস বর্ণনা করেছেন। [দেখুন শারহুল আকীদা আত্-তাহাবিয়াহ পৃ.২৫০; ইমাম নববী প্রণীত সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যা ১৫/৫৩]

সবার পূর্বে যিনি এ হাউজের পানি পান করবেন, তিনি হলেন আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এরপর তাঁর উম্মত তা থেকে পানি পান করবে। কাকের ও একদল কবীরা গুনাহকারীকে তা থেকে বিতারিত করা হবে। এটা হবে হাশরের ময়দানে আল্লাহর সামনে হাজিরা দেয়া, হিসাবকর্ম ও আমলনামা পাঠ ইত্যাদির পর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদের পূর্বে হাউযে যাব। যে ব্যক্তি হাউজের ধারে যাবে, সে তা থেকে পান করবে। আর যে তা থেকে পান করবে সে কোনোদিন তৃষ্ণার্ত হবে না। হাউজের ধারে এমন কিছু লোক আসবে, যাদের আমি চিনি এবং তারাও আমাকে চেনে। অতঃপর আমার ও তাদের মধ্যে প্রতিবন্ধক দাঁড় করানো হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলবেন, ‘এরা আমার উম্মত’। এর উত্তরে বলা হবে, ‘তুমি জান না, তোমার পর এরা কি আমল করেছে।’ অতঃপর আমি বলব, ধ্বংস ধ্বংস, ওই ব্যক্তির জন্য যে আমার পরবর্তীতে পরিবর্তন করল। [মুসলিম, আস-সহিহ (নববীর ব্যাখ্যাসহ) ১৫/৫৩-৫৪]

উকবা বিন আমের (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন বের হলেন এবং জনৈক পরিবারের মৃতব্যক্তির জানাযার নামাজ পড়লেন। এরপর তিনি মিস্বারে আরোহন করলেন। তিনি বললেন, ‘আমি তোমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম হাউজের ধারে যাব। আর আমি তোমাদের ওপর সাক্ষী হব। আল্লাহর কসম! আমি এ মুহূর্তে সুনিশ্চিতভাবেই আমার হাউজ দেখতে পাচ্ছি। আর আমাকে পৃথিবীর সকল ধনরত্নের চাবিসমূহ দেয়া হয়েছে অথবা পৃথিবীর চাবিসমূহ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম! তোমরা আমার পর শিরক করবে- এ আশঙ্কা আমি করি না, কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় যে, তোমরা দুনিয়া অর্জনে প্রতিযোগিতায় নামবে। [বুখারি ও মুসলিম]

আসমা বিনতে আবু বকর (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি হাউজের কাছেই থাকব যাতে দেখতে পাই তোমাদের মধ্যে কে তাতে পান করতে আসে। আর আমার কাছ থেকে কিছু মানুষ দূরে সরিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর আমি বলব, ‘হে আমার রব, এরা আমার পক্ষ থেকে, এরা আমার উম্মতের অংশ।’ উত্তরে বলা হবে, ‘তুমি কি অনুভব করতে পারনি তোমার পর এরা কী করেছে, আল্লাহর কসম! তোমার পর এরা পশ্চাদগমন অব্যাহত রেখেছে। [মুসলিম, আস-সহিহ (নববীর ব্যাখ্যাসহ) ১৫/৫৫]

হাউযে কাউছারের ধরন-বৈশিষ্ট্য কী, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন আমরা তার প্রতি আবশ্যিকভাবে ঈমান আনব। এ বিষয়ে তাঁর বাণীসমূহকে বাহ্য অর্থেই বুঝব এবং এ ক্ষেত্রেও কোনো কমবেশ করব না। ‘আকীদা আত্-তাহাবিয়া’র ব্যাখ্যাকার বলেন, ‘হাউজের বর্ণনায় যেসব হাদিস উল্লিখিত হয়েছে, তার খোলাসা হলো- এটি বৃহদাকারের হাউজ, পান করার সম্মানিত এক স্থান, যা জান্নাতের পানীয় থেকে ধারা

সংগ্রহ করে, জালাত্তের কাউছার নদী থেকে। যা দুধের চেয়েও অধিক সাদা, বরফের চেয়েও অধিক ঠান্ডা, মধুর চেয়েও অধিক মিষ্টি, মিসকের চেয়েও অধিক সুগন্ধময়। আর তা অত্যন্ত প্রশস্ত। এর দৈর্ঘ্য এর প্রস্থের সমান। এর প্রতিটি কোণের দৈর্ঘ্য এক মাসের চলার পথ। কিছু হাদীসে এসেছে- যখন যখন তা হতে পান করা হবে, তখন তখন তা অধিক বেড়ে, অধিক প্রশস্ত হয়ে চলবে। পবিত্র-মহান সৃষ্টিকর্তা, যাকে কোনো কিছুই অপারগ করতে পারে না। [শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ পৃ. ২৫১]

হাউজের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় আরও যেসব হাদিস এসেছে, তন্মধ্যে একটি বর্ণিত হয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার হাউজ এক মাস চলার পথ। এর পানি দুধের চেয়েও সাদা। এর সুগন্ধি মিসকের চেয়েও অধিক প্রিয়। এর বাতিগুলো আকাশের তারার মতো। যে তা হতে পান করবে সে কোনোদিন তৃষ্ণার্ত হবে না।' [বুখারি, আস-সহিহ (ফাতহুল বারীসহ) ১১/৩৯৬-৩৯৮]

আমাদের নবি (স.) এর হাউজ সম্পর্কে অনেক বিশুদ্ধ হাদিস বিবৃত আছে। সবগুলো একত্র করলে তা মুতাওয়াতির এর পর্যায়ে পৌঁছায়। অতএব হাউজের অস্তিত্বে বিশ্বাস ঈমানের একটি অঙ্গ। কাজি আয়াম র. বলেন, হাউজ বিষয়ক হাদিসগুলো সহিহ, হাউজ-এর ওপর ঈমান আনা ফরজ, হাউজ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের অঙ্গ। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের নিকট, হাউজ শব্দটি বাহ্যত যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, সে অর্থেই তা বুঝতে হবে। এ ক্ষেত্রে তাবিল করা চলবে না, কোনো মতানৈক্য করা চলবে না। হাউজ-বিষয়ক হাদিসগুলো মুতাওয়াতির বর্ণনাক্রমে এসেছে। সাহাবীদের (রাযি.) বিরাট এক দল তা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মুসলিম হাউজ বিষয়ক হাদিস যে ক'জন সাহাবীর (রাযি.) বর্ণনা ধারায় উল্লেখ করেছেন তারা হলেন- আমার বিন আল আস, আয়েশা, উম্মু সালামা, উকবা বিন আমের, ইবনে মাসউদ, হুযায়ফা, হারেছা বিন ওয়াহাব, মুস্তাওরাদ, আবু যর, ছাওবান, আনাস, যাবের বিন সামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন)।

ইমাম মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য মুহাদ্দিসীন সাহাবীদের (রাযি.) মধ্যে যাদের বর্ণনায় এ বিষয়ক হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাঁরা হলেন- আবু বকর সিদ্দীক, যায়েদ বিন আল আরকাম, আবু উমামা, আবদুল্লাহ বিন যায়েদ, আবু বারযা, সুওয়াইদ বিন হাবলা, আবদুল্লাহ বিন আল আস সানাবজী, বারা বিন আযেব, আসমা বিনতে আবু বকর, খাওলা বিনতে কাইস প্রমুখ।

অতএব এতগুলো বর্ণনা ধারার দাবি হলো হাদিসগুলো সব মিলিয়ে মুতাওয়াতির হাদীসের পর্যায়ভুক্ত। [দেখুন ইমাম নববী প্রণীত সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ১৫/৫৩] অবশ্য কিছু সহিহ হাদীসে এটাও আছে যে, প্রত্যেক নবিরই হাউজ আছে, তবে আমাদের প্রিয় নবির হাউজটিই হলো সর্ববৃহৎ, অধিক সুমিষ্ট, এবং পানকারীদের সংখ্যার বিচারে অন্যান্য নবীদের হাউজের তুলনায় অধিক। [শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ পৃ. ১৫১]

মীযান (পাল্লা)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মীযান সম্পর্কে যা-কিছু বলেছেন তার প্রতি ঈমান আনা আমাদের জন্য ফরজ। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বান্দাদের, কি ভালো কি মন্দ, সকল আমলই মীযানে উঠিয়ে মাপবেন। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসানের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

كَانَ وَإِنْ شِئْنَا نَفْسُ تُظْلَمُ فَلَا الْقِيَامَةَ لِيَوْمِ الْقِسْطِ الْمَوَازِينَ وَنَضَعُ حَاسِبِينَ بَيْنَنَا وَكَفَىٰ بِهَا أَتَيْنَا خَرَدَلٍ مِنْ حَبَّةٍ لَمِثْقًا

‘আর কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। কারো কর্ম যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা হাযির করব। আর হিসাব

গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট’ (সূরা আল আশ্বিয়া , ৪৭)।

অন্য-এক আয়াতে এসেছে ,

وَمَنْ . الْمُفْلِحُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ مَوَازِينُهُ ثَقُلَتْ مَنْ فِي الْحَقِّ يَوْمَئِذٍ وَالْوَزْنُ بَيَّاتِنَا كَانُوا بِمَا أَنْفُسُهُمْ خَسِرُوا الَّذِينَ فَأُولَئِكَ مَوَازِينُهُ خَفَّتْ . يَظْلِمُونَ .

‘আর সেদিন পরিমাপ হবে যথাযথ। সুতরাং যাদের পাল্লা ভারি হবে তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই হবে সেই সব লোক, যারা নিজদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কারণ

তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি (অস্বীকার করার মাধ্যমে) জুলুম করত’ - (সূরা আল আরাফ, ৮-৯)।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

خَفَّتْ مَنْ وَأَمَّا . رَاضِيَةً عِيشَةٍ فِي فَهُوَ . مَوَازِينُهُ ثَقُلَتْ مَنْ فَأَمَّا هَاوِيَةً فَأَمُّهُ . مَوَازِينُهُ

‘অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে, সে থাকবে সন্তোষজনক জীবনে; আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার আবাস হবে হাবিয়া’ - (সূরা আল কারিয়া , ৬-৯)।

মীযান বিষয়ক হাদিসসমূহের ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, মীযান হবে প্রকৃত অর্থেই পরিমাপক বস্তু যার দুটি পাল্লা থাকবে। আর আল্লাহ তাআলা মানুষের আমলকে শরীরী বস্তুতে রূপান্তরিত করবেন, যাতে তা ওজন করে মাপা যায়। এরপর মানুষের পুণ্যসমূহ এক পাল্লায় এবং পাপসমূহ অন্যপাল্লায় রাখা হবে। [দেখুন শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ পৃ.৪৭২]

অবশ্য পাল্লা দিয়ে মানুষের পাপ-পুণ্য মাপার পর্বটি আসবে হিসাব-পর্বের পর। অর্থাৎ হিসাবের মাধ্যমে নির্ণয় করা হবে কে কি ভালো-মন্দ কাজ করেছে, এরপর মাপ দিয়ে ভালো-মন্দ কাজের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে, এবং সে অনুপাতে শাস্তির বিধান দেয়া হবে। [শারহুল বানজুরি আলাল জাওহারাহ] তবে নবি-রাসূল, ফেরেশতা এবং আল্লাহ

তাত্ৰালা যাকে ইচ্ছা তাকে হিসাবেৰ আওতাভুক্ত কৰবেন না। [শাৰহল বানজুরি আলাল
জাওহাৰা পৃ.২১৫]

পুল সিরাত

আমরা ঈমান রাখি যে হিসাব ও মিযানের পর মানুষ তাদের অবস্থানস্বল ত্যাগ করবে এবং জাহান্নামের ওপর দিয়ে যে পুল টানা আছে তা অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে যাবে। এ পুলকেই বলা হয় 'সিরাত'। পুল সিরাতের ওপর দিয়ে সবাইকেই অতিক্রম করতে হবে। আশ্বিয়া, সিদ্দীকীন, মুমিন, কাফের, যার হিসাব নেওয়া হবে অথবা হবে না, সবাইকে পুল সিরাতের ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। যে ব্যক্তি পৃথিবীর জীবনে সিরাতুল মুস্তাকীম বা সত্যদ্বীনের ওপর অবিচল থেকেছে সে পরকালের সিরাতেও অবিচল থাকবে।

[- الصراط শব্দের মূল অর্থ পথ। শব্দটির আরেকটি উচ্চারণ হলো سراط অর্থাৎ সোওয়াদের পরিবর্তে সীন। এ সময় তা سراط থেকে উৎকলিত বলে গণ্য হবে। আর سراط শব্দের অর্থ গলাধঃকরণ করা। সে হিসেবে জাহান্নামের ওপর দিয়ে টেনে দেয়া পথ এ হিসেবে سراط যে তা তার ওপর দিয়ে অতিক্রমকারীকে গলাধঃকরণ করে ফেলবে।] বেশ কয়েকটি সহিহ হাদীসে এসেছে যে, মানুষ তার ওপর দিয়ে অতিক্রম করবে। এ অতিক্রমকর্ম কার জন্য কি পরিমাণ সহজ হবে, তা নির্ভর করবে পৃথিবীর জীবনে কে কি পরিমাণ আমল করেছে, তারই ওপর। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ অতিক্রম করবে নক্ষত্র পতনের গতির ন্যায়। আবার কেউ বাতাসের গতি, কেউ এক পলকে, কেউ দ্রুত দৌড়িয়ে, অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ-নিজ আমলের পরিমাণ অনুযায়ী দ্রুতগমনের সুযোগ পাবে। এমনকি যে ব্যক্তির নেক-কাজ একেবারেই কম, সে পড়ে পড়ে গমন করবে, যদি তার এক হাত শক্তিহীন হয়ে পড়ে তবে অন্য হাত দ্বারা সে ঝুলে থাকবে, যদি এক পা ফসকে যায় তবে অপর পা দ্বারা ঝুলে থাকবে, তার বিভিন্ন পার্শ্ব যন্ত্রণা-আক্রান্ত হয়ে পড়বে। এভাবে মুমিনরা পুল সিরাত পার হয়ে যাবে। যখন পার হয়ে যাবে তখন তারা বলবে, 'সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি তোমাকে দেখানোর পর তোমার কাছ থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের এতই দিয়েছেন যা অন্য-কাউকে দেননি।' [শারহুল আকীদা আত্-তাহাবিয়্যাহ পৃ.৪৭০]

সিরাতের ব্যাপারে যেসব সহিহ হাদিস এসেছে, তার মধ্যে একটি হলো আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখব?' তিনি বললেন, 'পূর্ণিমারাতে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়? তারা বললেন, 'না, হে আল্লাহর রাসূল।' তিনি বললেন, 'মেঘ না-ঢাকা সূর্য দেখতে কি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়? তারা বললেন, 'না, হে আল্লাহর রাসূল।' তিনি বললেন, 'তোমরা এভাবেই তাঁকে দেখবে।' আল্লাহ তাআলা মানুষকে কেয়ামতের দিন একত্র করবেন। তিনি বলবেন, 'যে যে-বস্তুর ইবাদত করত সে সে-বস্তুর অনুসরণ করবে', অতঃপর যারা সূর্যের ইবাদত করত, তারা সূর্যের অনুসরণ করবে। যারা চাঁদের ইবাদত করত, তারা চাঁদের অনুসরণ করবে। যারা তাগুতদের [আল্লাহ ছাড়া যা কিছুই ইবাদত করা হয়, তাকেই তাগুত বলে। দেখুন ইমাম নববী প্রণীত সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ৩/১৮] ইবাদত করত, তারা তাগুতদের অনুসরণ করবে। বাকি থাকবে এই উম্মত, তাদের যারা মুনাফেক তারা সহ। [আলেমগণ বলেন: মুনাফেকরা মুমিনদের দলে এ জন্য থেকে যাবে যে, তারা দুনিয়ার জীবনে মুমিনদের মুখোশ পরে মুমিনদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে থাকত। পরকালেও তারা অভিন্ন কায়দায় মুমিনদের সঙ্গেই মিশে থাকবে। মুমিনরা যেদিকে

যাবে তারাও সেদিকে যাবে, মুমিনদের আলোতে তারা চলবে। এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে ও মুমিনদের মধ্যে পর্দা দিয়ে দেবেন। মুমিনদের আলো তাদের থেকে সরিয়ে নেবেন। পরিশেষে জাহান্নামের সর্বশ্রী স্তরে তাদের দাখিল করাবেন। দেখুন ইমাম নববী প্রণীত সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ পৃ.৭ -১৯]

অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের কাছে আসবেন, তারা যে আকৃতিতে তাঁকে চেনে, সে আকৃতি ছাড়া অন্য-আকৃতিতে তিনি আসবেন। অতঃপর তিনি বলবেন, 'আমি তোমাদের রব।' তারা বলবে, 'তোমার থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। এটা আমাদের জায়গা যতক্ষণ না আমাদের রব আমাদের কাছে আসেন। আমাদের রব যখন আমাদের কাছে আসবেন, আমরা তাঁকে চিনব।' এরপর আল্লাহ তাআলা ওই আকৃতিতেই আসবেন যে আকৃতিতে তারা তাকে চেনে। অতঃপর বলবেন, 'আমি তোমাদের রব।' তারা বলবে, 'আপনি আমাদের রব। অতঃপর তারা তাঁর অনুসরণ করবে। এরপর জাহান্নামের ওপর পুল সিরাত টেনে দেওয়া হবে। আর সে সময় আমি ও আমার উম্মত তা প্রথম অতিক্রমকারী হবে। সেদিন রাসূলগণ ছাড়া অন্যকেউ কথা বলবে না। আর সেদিন আল্লাহর কাছে রাসূলগণের প্রার্থনা হবে, 'হে আল্লাহ! আপনি শান্তি বর্ষণ করুন, শান্তি বর্ষণ করুন।' আর সেদিন জাহান্নামের থাকবে মাথা-বাঁকানো লোহা। তা হবে সু'দান বৃক্ষের কাটার ন্যায়। তোমরা কি সু'দান বৃক্ষ দেখেছ? সাহাবীগণ বললেন, 'জী, দেখেছি, হে আল্লাহর রাসূল।' তিনি বললেন, 'তা হবে সু'দান বৃক্ষের কাটার ন্যায়। তবে তা কতটুকু বৃহদাকায় হবে তা কেবল আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। মানুষের আমল অনুযায়ী জাহান্নাম তাদের ছোঁ মেরে নেবে। তাদের মধ্যে কিছু থাকবে মুমিন, যারা আমলের কারণে মুক্ত হয়ে যাবে, আর কিছু থাকবে সাজাপ্রাপ্ত যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তাদের পরিত্রাণ দেন।'

[এ হাদীসের একাংশ বুখারি ও মুসলিমে রয়েছে। তবে হাদীসের শব্দগুলো মুসলিম থেকে নেয়া। দেখুন বুখারি, আস-সহিহ (ফাতহুল বারীসহ) ১১/৩৬৭; মুসলিম, আস-সহিহ (নববীর ব্যাখ্যাসহ) ৩/১৭]

পুল সিরাতের ওপর দিয়ে অতিক্রম করাকেই আল-কোরানে জাহান্নামে পতিত হওয়া বলা হয়েছে,

مَقْضِيًّا حَتْمًا رَّبُّكَ عَلَىٰ كَانَ وَارِدُهَا إِلَّا مِنْكُمْ وَإِنْ

'আর তোমাদের প্রত্যেককেই তার ধারে যাবে, এটি তোমার রবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত' - (সূরা মারয়াম, ৭১।

অতএব পুল সিরাত থেকে কেউ রেহাই পাবে না। সহিহ মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বৃক্ষওয়ালাদের মধ্য থেকে কেউ জাহান্নামে যাবে না, ইনশাআল্লাহ, অর্থাৎ যারা বৃক্ষের নিচে বাইয়াত গ্রহণ করেছে। হাফসা ((রাযি.)) বললেন, 'আর তোমাদের প্রত্যেককেই তাতে পতিত হবে'? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

جِيئًا فِيهَا الظَّالِمِينَ وَنَذْرٌ اتَّقُوا الَّذِينَ تُنَجِّي ثُمَّ

'তারপর আমি তাদেরকে মুক্তি দেব যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে। আর জালিমদেরকে আমি সেখানে রেখে দেব নতজানু অবস্থায়।' - (সূরা মারয়াম, ৭২)।

অতএব নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, জাহান্নামে উপনীত হওয়ার অর্থ জাহান্নামে প্রবেশকে আবশ্যক করে না। [শারহুল আকীদাত-তাহাবিয়াহ পৃ: ৪৭১]

সবাই পুল সিরাত হয়ে জাহান্নামের ওপর দিয়ে অতিক্রম করবে। যারা মুমিন আল্লাহ তাআলা তাদের নাজাত দেবেন। আর যারা জালেম তারা জাহান্নামে পড়ে যাবে। যখন মুমিনরা পুল সিরাত পার হয়ে যাবে, তখন তারা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে একটি পুলের ওপর দাঁড়াবে। তাদের একজন অন্যজন থেকে জুলুম অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবে। যখন তারা এভাবে পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মুমিনরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। অতঃপর তাদের জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে একটি পুলের ওপর আঁটকে দেয়া হবে। দুনিয়াতে তাদের পরস্পরের প্রতি, যেসব জুলুম অন্যায় হয়েছিল, সেগুলোর তারা প্রতিশোধ নেবে। আর এভাবে তারা যখন পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তাদের তখন জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। মুহাম্মাদের জীবন যার হাতে তার কসম খেয়ে বলছি, নিশ্চয় জান্নাতে তোমাদের একজনের বাড়ি দুনিয়াতে তার বাড়ি থেকে উত্তম হবে। [বুখারি, আস-সহিহ (ফাতহুল বারীসহ) ১১/৩৩৬]

জান্নাত ও জাহান্নাম

আমরা জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি। আমরা বিশ্বাস করি জান্নাত ও জাহান্নাম আল্লাহ তাআলার দুটি সৃষ্টি, যা তিনি বান্দাদের পুরস্কার ও শাস্তির জন্য প্রস্তুত করেছেন। তিনি এ দুটো মানব সৃষ্টির পূর্বেই সৃষ্টি করেছেন। জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানেও অস্তিত্ববান এবং তা অবিনশ্বর হয়ে অনন্তকাল থেকে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

الَّذِينَ أُيْهِبُوا
عَلَيْهَا وَالْجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ نَفْسُكُمْ أَقُوا أَمْثُوا
يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادَ غِلَظَ مَلَائِكَةٍ
‘হে ঈমানদারগণ,

তোমরা নিজদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে
মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে এমন নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকুল, যারা আল্লাহ
তাদেরকে যে নির্দেশ

দিয়েছেন সে ব্যাপারে অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা
হয়’ - (সূরা আত-তাহরীম, ৬)।

তিনি অন্য-এক আয়াতে বলেন ,

لِجَهَنَّمَ نَقُولُ يَوْمَ
مَزِيدٍ مِنْ هَلٍ وَتَقُولُ امْتَلَأَتْ هَلٍ

‘সেদিন আমি জাহান্নামকে

বলব, ‘তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছ’? আর সে বলবে, ‘আরও বেশি আছে কি?’ - (সূরা
কাফ , ৩০)।

জাহান্নামের কয়েকটি শাস্তির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন,

نُزُلًا خَيْرٌ أَدْلِكَ
تَخْرُجُ شَجَرَةٌ إِنَّهَا . لِلظَّالِمِينَ فِتْنَةٌ جَعَلْنَاهَا إِنَّا . الزُّقُومُ شَجَرَةٌ أَمْ
مِنْهَا لَا يَكُونُونَ فَإِنَّهُمْ . الشَّيَاطِينَ رُءُوسَ كَأَنَّهُ طَلْعُهَا . الْجَحِيمِ أَضَلَّ فِي
حَمِيمٍ مِنْ لَشُوبًا عَلَيْهَا لَهُمْ إِنْ ثُمَّ . الْبُطُونُ مِنْهَا فَمَالِيُونَ
‘আপ্যায়নের জন্য

এগুলো উত্তম না যাক্কুম [অতি তিক্ত স্বাদযুক্ত জাহান্নামের এক গাছ।] বৃক্ষ? নিশ্চয় আমি
তাকে জালিমদের জন্য করে দিয়েছি পরীক্ষা। নিশ্চয় এ গাছটি জাহান্নামের তলদেশ থেকে
বের হয়। এর ফল

যেন শয়তানের মাথা; নিশ্চয় তারা তা থেকে খাবে এবং তা দিয়ে পেট ভর্তি করবে।

তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ’ - (সূরা আস-সাক্ষাত , ৬২-৬৭)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহান্নামের বর্ণনায় বলেন, ‘তোমাদের আগুন
জাহান্নামের আগুনের এক-সত্তরাংশ। প্রশ্ন করে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, দুনিয়ার
আগুনই তো যথেষ্ট। তিনি বললেন, দুনিয়ার আগুনের চেয়ে তা সত্তর মাত্রা প্রবল। প্রতি
মাত্রার তাপ দুনিয়ার আগুনের তাপের মতো। [বুখারি, আস-সহিহ (ফাতহুল বারীসহ) :
৬/২৫৬-২৫৭]

জাহান্নামের সর্বনিম্ন আজাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,
‘নিশ্চয় কেয়ামতের দিন সহজতম আজাব হবে ওই ব্যক্তির, যার পায়ের তলায় আগুনের
একটি অঙ্গার রাখা হবে, যার কারণে তার মস্তিষ্ক উথলাতে থাকবে।’ [বুখারি, আস-সহিহ

(ফাতহুল বারীসহ) : ৬/৩৬১] এর পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা আল-কোরানের বহু জায়গায় জান্নাতের নেয়ামত-প্রাচুর্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন-

جَنَّاتٍ فِي . أَمِينٍ مَقَامٍ فِي الْمُتَّقِينَ إِنَّ
يَخُورُ وَزَوْجَتَاهُمْ كَذَلِكَ . مُتَقَابِلِينَ وَإِسْتَبْرَقَ سُنْدُسٍ مِنْ يَلْبَسُونَ . وَعُيُونُ
الْمَوْتِ فِيهَا يَذُوقُونَ لَا . آمَنِينَ فَآكِهَةٍ يَكُلُ فِيهَا يَدْعُونَ . نَعِيدُ
الْفَوْزُ هُوَ ذَلِكَ رَبُّكَ مِنْ فَضْلًا . الْجَحِيمِ عَذَابٍ وَوَقَاهُمْ الْأُولَى الْمَوْتِ
الْعَظِيمِ

‘নিশ্চয় মুতাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে,
বাগ-বাগিচা ও ঝরনাধারার মধ্যে, তারা পরিধান করবে পাতলা ও পুরু রেশমবস্ত্র এবং
বসবে মুখোমুখি হয়ে। এরূপই ঘটবে, আর আমি তাদেরকে বিয়ে দেব ডাগর নয়না হূরদের
সঙ্গে ।

সেখানে তারা প্রশান্তিতে সকল প্রকারের ফলমূল
আনতে বলবে। প্রথম মৃত্যুর পর সেখানে তারা আর মৃত্যু আশ্বাদন করবে না। আর তিনি
তাদেরকে জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করবেন। তোমার রবের অনুগ্রহস্বরূপ, এটাই
তো মহা সাফল্য’ - (সূরা আদ-দুখান , ৫১-৫৭)।

مَا هَذَا . بَعِيدٍ رَغْبٍ لِمُتَّقِينَ الْجَنَّةِ وَأَزْلَفَتْ ,
مُنِيبٍ يِقْلِبُ وَجَاءَ بِالْغَيْبِ الرَّحْمَنُ خَشِيَ مَنْ . حَفِيطٍ أَوَابٍ لِكُلِّ ثَوَعْدُونَ
وَلَدَيْنَا فِيهَا يَشَاءُونَ مَا لَهُمْ . الْخُلُودُ يَوْمَ ذَلِكَ بِسَلَامٍ ادْخُلُوهَا .
مَزِيدٌ .

‘আর জান্নাতকে মুতাকীদের অদূরে,
কাছেই আনা হবে। এটাই, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। প্রত্যেক আল্লাহ অভিমুখী
অধিক সংরক্ষণশীলদের জন্য। যে না দেখেই রহমানকে ভয় করত এবং বিনীত হৃদয়ে
উপস্থিত হত। তোমরা তাতে শান্তির সঙ্গে প্রবেশ কর। এটাই স্থায়িত্বের দিন। তারা যা
চাইবে, সেখানে তাদের জন্য তাই থাকবে এবং আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক’ - (সূরা
কাফ , ৩১-৩৫)।

فَاكِهِينَ . وَنَعِيمٍ جَنَّاتٍ فِي الْمُتَّقِينَ إِنَّ
هَنِيئًا وَاشْرَبُوا كُلُّوا . الْجَحِيمِ عَذَابٍ لَهُمْ رَبُّ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ آتَاهُمْ بِمَا
. عَيْنٍ يَخُورُ وَزَوْجَتَاهُمْ مَصْفُوفَةٍ سُرُرٍ عَلَى مُتَكِّينَ . تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا
اَوْمَرْتُمْ بِهِمُ الْحَقْنَا بِإِيمَانٍ ذُرِّيَّتُهُمْ وَاتَّبَعْتُمْ أَمَنُوا وَالَّذِينَ
شَاءَ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ
. يَسْتَهْوُونَ مِمَّا وَلَحْمٍ بِفَاكِهَةٍ وَأَمَدَدْنَاهُمْ . رَهِيْنٌ كَسَبَ بِمَا أَمَرُوا كُلَّ
غُلَامٍ يَوْمَ عَدٍ وَيَطُوفُ . تَأْتِيْمٌ وَلَا فِيهَا لَعْوٌ لَا كَأْسًا فِيهَا يَتَنَازَعُونَ
مَكْنُونٌ لَوْ لَوْ كَانَتْ لَهُمْ

‘নিশ্চয় মুতাকীরা (থাকবে) জান্নাতে
ও প্রাচুর্যে। তাদের রব তাদেরকে যা দিয়েছেন তা উপভোগ করবে, আর তাদের রব
তাদেরকে বাঁচাবেন স্বলন্ত আগুনের আজাব থেকে। তোমরা তৃপ্তি সহকারে খাও ও পান কর,
তোমরা যে আমল করতে তার বিনিময়ে। সারিবদ্ধ পালঙ্কে তারা হেলান দিয়ে বসবে; আর
আমি তাদেরকে মিলিয়ে দেব ডাগরচোখা হূর-এর সঙ্গে । আর যারা ঈমান আনে এবং
তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানের সঙ্গে

তাদের অনুসরণ করে, আমরা তাদের সঙ্গে তাদের সন্তানদের মিলন ঘটাব এবং তাদের
কর্মের কোনো অংশই কমান না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কামাইয়ের ব্যাপারে দায়ী থাকবে। আর
আমি তাদেরকে অতিরিক্ত দেব

ফলমূল
ও গোশত যা তারা কামনা করবে। তারা পরস্পরের মধ্যে পানপাত্র বিনিময় করবে;
সেখানে থাকবে না কোনো বেহুদা কথাবার্তা এবং কোন পাপকাজ। আর তাদের সেবায়
চারপাশে ঘুরবে বালকদল; তারা যেন

সুরক্ষিত মুক্তা’ - (সূরা আত-তুর , ১৭-২৪)।

জান্নাতের নেয়ামত-প্রাচুর্যের কথা উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রব থেকে বর্ণনা করে বলেন, ‘আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন প্রাচুর্য তৈরি করেছি, কোনো চক্ষু যা দেখেনি, কোনো কান যা শোনেনি, কোনো মানুষের হৃদয়ে যা কল্পিত হয়নি। তোমরা যদি চাও তাহলে পড়ে দেখ-

لَهُمْ أُخْفِيَ مَا نَفْسٌ تَعْلَمُ فَلَا

أَعْيُنٍ قُرَّةٍ مِنْ

‘অতঃপর কোন ব্যক্তি জানে না

তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়েছে,’ - (সূরা আস-সাজদা , ১৭)।

জান্নাত ও জাহান্নাম বিষয়ে আমাদের আরেকটি বিশ্বাস হলো, জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীরা পরস্পরকে ডাকবে ও কথা বলবে। সূরা আল আরাফে বর্ণিত এ দৃশ্যটি অনুধাবন করে দেখুন-

الْجَنَّةُ أَصْحَابُ وَنَادَى

وَعَدَ مَا وَجَدْتُمْ فَهَلْ حَقًّا رَبُّنَا وَعَدْنَا مَا وَجَدْنَا قَدْ أَنْ النَّارِ أَصْحَابُ
. الظَّالِمِينَ عَلَى اللَّهِ لَعْنَةُ أَنْ بَيْنَهُمْ مُؤَذِّنٌ فَأَذَّنَ نَعَمْ قَالُوا حَقًّا رَبُّكُمْ
فَرُؤُنَا بِالْآخِرَةِ وَهُمْ عَوَّجًا وَيَبْغُونَهَا اللَّهُ سَيِّلٌ عَنْ يَصُدُّونَ الَّذِينَ

‘আর জান্নাতের অধিবাসীগণ

আগুনের অধিবাসীদেরকে ডাকবে যে, ‘আমাদের রব আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছেন তা আমরা সত্য পেয়েছি। সুতরাং তোমাদের রব তোমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছেন, তা কি তোমরা

সত্যই পেয়েছ’? তারা

বলবে, ‘হ্যাঁ’। অতঃপর এক ঘোষক তাদের মধ্যে ঘোষণা করবে যে, আল্লাহর লা’নত জালেমদের ওপর’ - (সূরা আল আরাফ , ৪৫-৪৬)।

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, أَفِيضُوا أَنْ الْجَنَّةُ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ وَنَادَى
عَلَى حَرَمَهُمَا اللَّهُ إِنَّ قَالُوا اللَّهُ قَكْمُرَزَزَ مِمَّا أَوْ الْمَاءِ مِنْ عَلَيْنَا
الْكَافِرِينَ

‘আর আগুনের অধিবাসীরা

জান্নাতের অধিবাসীদেরকে ডেকে বলবে, ‘আমাদের ওপর কিছু পানি অথবা তোমাদেরকে আল্লাহ যে রিয়ক দিয়েছেন, তা ঢেলে দাও’। তারা বলবে, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তা কান্নারদের ওপর

হারাম করেছেন’ -

(সূরা আল আরাফ , ৫০)।

জান্নাত ও জাহান্নামের অবিনশ্বরতা, শাস্বত্ব এবং জান্নাতে মুমিনদের অনন্তকাল ও জাহান্নামে কান্নারদের অনন্তকাল থাকার বিষয়টি আল-কোরানের অনেক জায়গাতেই এসেছে। হাদীসেও বিষয়টির স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যখন জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে যাবে, তখন মৃত্যুকে এনে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যখানে দাঁড় করানো হবে। তাকে জবাই করা হবে। এরপর একজন ঘোষক ঘোষণা করে বলবে, হে জান্নাতবাসীগণ, মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামবাসীরা, মৃত্যু নেই। জান্নাতবাসীগণ খুশির ওপর খুশি হবে, আর জাহান্নামবাসীরা দুঃখের ওপর আরও অধিক দুঃখ পাবে।’ [বুখারি, আস-সহিহ (ফাতহুল বারীসহ) ১১/৩৫১]

ভাগ্যের প্রতি ঈমান

ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনা ইসলামি আকিদার একটি রোকন। এটি ঈমানের ষষ্ঠ রোকন। অতএব যে ব্যক্তি ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস রাখবে না, সে আল্লাহর দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে উমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস ইতোপূর্বে গিয়েছে, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরিল আলাইহিস সালামের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, 'তা হলো, তুমি ঈমান আনবে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর রাসূলগণ, তাঁর কিতাবসমূহ ও শেষ দিবসের প্রতি। আরও ঈমান আনবে ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি। [মুসলিম (নববীর ব্যাখ্যাসহ, খ ১, পৃ ১৫৭)]

কাজা ও কদরের সংজ্ঞা

কাজা ও কদরের সংজ্ঞা নির্ধারণে আলেমদের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। তাদের কারও নিকট কাজা ও কদর একই বিষয়। অর্থাৎ শব্দ হলো দুটি, তবে উভয় শব্দ অভিন্ন ভাব নির্দেশক। আবার কেউ-কেউ উভয় শব্দকে ভিন্ন-ভিন্ন অর্থে নিয়েছেন। তারা বলেছেন- কদর হলো- সৃষ্টিকুলের ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার সুপরিজ্ঞাত থাকার নাম। আর কাজা হলো- আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও ইচ্ছায় থাকা অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়কে অস্তিত্বদান। আবার কেউ-কেউ এর ঠিক উল্টোটা বলেছেন। অর্থাৎ কদরের সংজ্ঞা দিয়ে কাজা-র অর্থ করেছেন, আবার কাজা-র সংজ্ঞা দিয়ে কদরের অর্থ করেছেন। এটাও সম্ভাবনাময়। [রমযান আল বুতী, কুবরাল ইয়াকীনিয়াত আর কাওনিয়াহ পৃ.১৪৭] যারা উভয় শব্দকে অভিন্ন সংজ্ঞায় বেঁধেছেন, তাদের কথা হলো- কাজা ও কদর হলো এমন এক সুসংহত পদ্ধতি, যা আল্লাহ তাআলা এ মহাবিশ্ব ও মহাবিশ্বে ফলিত সাধারণ নীতি-বিধান ও নিয়ম হিসেবে নির্ধারণ করে রেখেছেন, যার দ্বারা তিনি কার্যকারণ ও তার ফলিত অবস্থাকে পরস্পরে বেঁধে দিয়েছেন। [সাইয়েদ সাবেক, আর আকাইদ আল ইসলামিয়া পৃ.৯৫]

আল-কোরানের যেসব আয়াতে 'কদর' শব্দের ব্যবহার এসেছে, সেখানে এ অর্থই তা ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

بِمَقْدَارٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ وَكُلُّ

‘আর তাঁর নিকট প্রতিটি বস্তু নির্দিষ্ট পরিমাণে রয়েছে’ - (সূরা আর্-রা'দ , ৮)।

অন্য জায়গায় এসেছে, شَيْءٌ مِنْ وَابِنٌ مَعْلُومٌ يَقْدَرُ إِلَّا نُنَزِّلُهُ وَمَا خَزَائِنُهُ عِنْدَنَا إِلَّا

‘আর প্রতিটি বস্তুই ভান্ডারসমূহ রয়েছে আমার কাছে এবং আমি তা অবতীর্ণ করি কেবল নির্দিষ্ট পরিমাণে’ - (সূরা আল হিজর , ২১)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

قَدَرِيبِ خَلَقْنَاهُ شَيْءٌ كُلُّ إِنَّا

‘নিশ্চয় আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী’ - (সূরা আল কামার , ৪৯)।

ইমাম আহমদ রা. কতো সুন্দর জবাবই-না দিয়েছেন, যখন তাঁকে কদর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, কদর হলো আল্লাহ তাআলার কুদরত। ইবনুল কাইয়েম রা. তাঁর

প্রসিদ্ধ এক কবিতায় বলেন, কদরের স্বরূপ, যা নির্ধারণে দিশেহারা/সকল মানুষ- তা হলো দয়াময়ের ক্ষমতা-কুদরত/ 'আল্লাহর রেজামন্দী' আহমদ যে অর্থ করেছেন/তা পছন্দ হয়েছে ইবনে আকীলের। [শারহ কাসিদাতি ইবনুল কাইয়েম ১/২৫৪] বস্তুত কাজা কদরের সংজ্ঞায় ইমাম আহমদ (র.) এর কথাই যথেষ্ট। নিম্নবর্ণিত আয়াতগুলোতে যে ভাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তা-ই হলো কদর।

ইরশাদ হয়েছে,
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ اللَّهُ الْأَمْرُ إِنَّ قُلْ

‘বল, ‘নিশ্চয় সব বিষয় আল্লাহর’ - (সূরা আলে ইমরান , ১৫৪)।

আরও ইরশাদ হয়েছে,
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ اللَّهُ الْأَمْرُ يُرْجَعُ وَإِلَيْهِ

‘এবং তাঁরই কাছে সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে’ - (সূরা হুদ , ১২৩)।

অন্যত্র এসেছে,
شَيْءٌ كُلُّ مَلَكُوتٍ بِيَدِهِ

‘যার হাতে রয়েছে সকল কিছুর রাজত্ব’ - (সূরা ইয়্যাসীন , ৮৩)।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,
إِذْنِهِ بَعْدَ مِنْ إِلَّا شَفِيعٌ مِنْ مَا الْأَمْرُ يُدَبَّرُ

‘তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন। তার অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করার কেউ নেই’ - (সূরা ইউনুস , ৩)।

এ জাতীয় আরও অন্যান্য আয়াত, যা নির্দেশ করে যে, এ মহাবিশ্বের কোনো কিছুই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত ছাড়া ঘটে না। ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস মূলত আল্লাহ তাআলার গুণমাধুরীর প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে দাঁড়িয়ে। যেমন জ্ঞান, ক্ষমতা ও ইচ্ছা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,
عَلِيمٌ شَيْءٌ يَكُلُّ وَهُوَ

‘আর সব কিছু সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞাত’ - (সূরা আল বাকারা , ২৯)।

তিনি অন্যত্র বলেন,
قَدِيرٌ شَيْءٌ كُلُّ عَلَى وَهُوَ

‘আর তিনি সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান’ - (সূরা আল হাদীদ, ২)।

তিনি আরও বলেন,
يُرِيدُ لِمَا فَعَالٌ

‘তিনি তা-ই করেন যা চান’ - (সূরা আল বুরূজ , ১৬) ।

ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, প্রত্যেক বিষয় আল্লাহর নির্ধারণ ও ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। আল্লাহর ইচ্ছায় বাস্তবায়িত হয়। বান্দার কোনো ইচ্ছা নেই তবে আল্লাহ যা চান। আল্লাহ তাআলা যা চান তা-ই ঘটে। আর যা চান না, তা ঘটে না। আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত কেউ ফেরাতে পারে না।

ভাগ্যের প্রতি ঈমানের অর্থ

ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ। কি ভালো কি মন্দ, কি সুখকর কি দুঃখকর, সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে। ভাগ্যের প্রতি ঈমানের অর্থ আল্লাহ তাআলার অনাদি-স্তানের ওপর ঈমান আনা, আল্লাহ তাআলার অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছা ও সর্বব্যাপী ক্ষমতার ওপর ঈমান আনা। এ কথার ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেন- কদরের প্রতি ঈমান দু-পর্যায়ের। প্রতিটি পর্যায় আবার দু-পর্যায় শামিল করে,

প্রথম পর্যায় এ বিশ্বাস পোষণ করা যে মানুষ যা করবে, আল্লাহ তাআলা তা পূর্ব থেকেই জানেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর অনাদি ইলম অনুযায়ী তা জানেন, যে অনাদি স্তান আল্লাহ তাআলার একটি অবিচ্ছেদ্য গুণ। আল্লাহ তাআলা বান্দার সকল অবস্থা- পাপ-পুণ্য, রিযিক ও মৃত্যু সব কিছু তিনি পূর্ব থেকেই জানেন। এরপর তিনি লাওহে মাহফুযে সৃষ্টিকুলের ভাগ্যসমূহ লেখেন। আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। তিনি কলমকে লেখার নির্দেশ দিয়েছেন। কলম বলেছে, আমি কী লিখব? আল্লাহ তাআলা বলেছেন, কেয়ামত পর্যন্ত যা-কিছু হবে সব লেখ। অতএব মানুষকে যা স্পর্শ করেছে তা কখনো ভুল করার ছিল না। আর যা ভুল করেছে তা কখনো স্পর্শ করার ছিল না। কলম শুকিয়ে গিয়েছে এবং কাগজ ভাঁজ করে ফেলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

ذَلِكَ إِنَّ كِتَابَ فِي ذَلِكَ إِنَّ وَالْأَرْضِ السَّمَاءِ فِي مَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنْ تَعْلَمَ أَلَمْ يَسِيرُ اللَّهُ عَلَى

‘তুমি কি জান না যে, আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, আল্লাহ তা জানেন? নিশ্চয় তা একটি কিতাবে রয়েছে। অবশ্যই এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ’ - (সূরা আল হাঙ্ক , ৭০)।

তিনি আরও বলেন,

أَنْ قَبْلَ مِنْ كِتَابٍ فِي إِلَّا أَنْفُسَكُمْ فِي وَلَا الْأَرْضِ فِي مُصِيبَةٍ مِنْ أَصَابَ مَا يَسِيرُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ إِنَّ تَبَرَأَهَا

‘জমিনে

এবং তোমাদের নিজদের মধ্যে এমন কোনো মুসীবত আপতিত হয় না, যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি না। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ’ - (সূরা আর হাদীদ , ২২)।

দ্বিতীয় পর্যায় হলো আল্লাহ তাআলার অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছা ও সর্বব্যাপী ক্ষমতার ওপর ঈমান আনা। অর্থাৎ এ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা করেছেন তা হয়েছে, আর যা ইচ্ছা করেননি, তা হয়নি। আর আসমান ও পৃথিবীতে স্থিরতা ও নড়াচড়ার যা-কিছু আছে সব আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা অনুযায়ী। আল্লাহ তাআলার রাজত্বে তিনি যা চান না, তা কখনো হতে পারে না। আর যা কিছু অস্তিত্ববান অথবা অস্তিত্বহীন সব কিছুর ওপরই আল্লাহ তাআলা ক্ষমতাবান। আসমান ও পৃথিবীতে সৃষ্টি-বস্তু যা আছে, সবার সৃষ্টিকর্তাই একমাত্র আল্লাহ তাআলা, তিনি ছাড়া অন্যকোনো সৃষ্টিকর্তা নেই, অন্যকোনো রব নেই। এর পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের তাঁর ইবাদত-আনুগত্য ও রাসুলগণের (আ.) আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁর অবাধ্য হতে নিষেধ করেছেন। তিনি মুত্তাকী, মুহসিন ও ইনসাফগারদের পছন্দ করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের প্রতি

তিনি সন্তুষ্ট হন। তিনি কাফেরদের অপছন্দ করেন। ফাসেকদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হন না। তিনি অশ্লীল কর্মের নির্দেশ দেন না। তাঁর বান্দারা কুফরি করুক, এটা তাঁর সন্তুষ্টির বিষয় নয়। তিনি দুষ্কর্ম পছন্দ করেন না। বান্দারা প্রকৃত অর্থেই কর্ম সম্পাদন করে থাকে, আর আল্লাহ তাআলা হলেন তাদের কর্মের স্রষ্টা। আর মুমিন-কাফের, সৎ-অসৎ, নামাজী-রোজাদার সবাই আল্লাহর বান্দা। কাজ-কর্মের ওপর বান্দাদের ক্ষমতা রয়েছে। তাদের ইচ্ছাশক্তিও আছে। তবে আল্লাহ হলেন তাদের ক্ষমতা ও ইচ্ছার স্রষ্টা।’ [দেখুন আর রাওয়া আল্লাদিইয়া ; শারহুল আকীদা আত্-তাহাবিয়্যাহ পৃ. ৩৫২-৩৫৩]

ইবনে তাইমিয়া (র.) এর কথার খোলাসা হলো- ভাগ্যের প্রতি ঈমানের চারটি পর্যায় রয়েছে,

প্রথম পর্যায় : আল্লাহ তাআলার অনাদি ইলমের প্রতি বিশ্বাস রাখা যে, তিনি বান্দাদের সকল কাজ পূর্ব থেকেই জানেন।

দ্বিতীয় পর্যায় : বান্দাদের এ কাজগুলো লাওহে মাহফুযে লিখে রাখা।

তৃতীয় পর্যায় : আল্লাহ তাআলার অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছা ও সর্বব্যাপী ক্ষমতা।

চতুর্থ পর্যায় : সকল সৃষ্টিকে আল্লাহ তাআলা অস্তিত্বদান করেন, একমাত্র তিনিই সৃষ্টিকর্তা এবং অন্য সব কিছু হলো মাথলুখ বা সৃষ্টি।

ভালো-মন্দ

এরপর আসে ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রসঙ্গ। অর্থাৎ আমরা যে ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস করি তা ভালো ও মন্দ, এ দু-ভাগে বিভক্ত। মূলত এ ভালো-মন্দটা হলো মানুষ ও সৃষ্টিজীবের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি বিষয়। কেননা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পৃক্ত কদর পুরোটাই ভালো। যা মন্দ, তা আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায় না। আল্লাহ তাআলার জ্ঞান, ইচ্ছা, লিপিবদ্ধ করে রাখা, সকল বিষয় ও বস্তু সৃষ্টি করা- এ সবই হলো আল্লাহর হিকমত, ইনসাফ, রহমত ও ভালো। আল্লাহ তাআলার কোনো গুণে বা কর্মে কোনো মন্দ বা অকল্যাণ আদৌ অনুপ্রবেশ করে না। আল্লাহ তাআলার মহান সত্তার সঙ্গে কোনো ত্রুটি বা মন্দ সংযুক্ত হয় না। আল্লাহ তাআলা হলেন পূর্ণাঙ্গতম, অতিমহান। [দেখুন ইবনে তাইমিয়া, আল হাসানাহ ওয়াস সাই-ইআহ পৃ.১৯০] এ কারণে ভিন্নভাবে কোনো মন্দ বিষয়কে আল্লাহর সঙ্গে যোগ করা যাবে না। তবে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির ব্যাপকতার আওতাধীন মন্দ বিষয় অনুপ্রবিষ্ট থাকতে পারে। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী,

شَيْءٌ كُلُّ خَالِقٍ لِلَّهِ

‘আল্লাহ সকল জিনিসের স্রষ্টা’ - (সূরা আয-যুমার, ৬২)।

অনুরূপভাবে কার্যকারণের সঙ্গে মন্দকে যোগ করা বৈধ। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী,

خَلَقَ مَا شَرَّ مِنْ . الْفَلَقِ يَرْبِّ أَعُوذُ قُلْ

‘বল, ‘আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঊষার রবের কাছে, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে’ - (সূরা আল-ফালাক, ১-২)।

কর্তাবিশেষ্যকে ফেলে দিয়েও মন্দ বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। যেমন স্বিনদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

رَشَدًا رَبُّهُمْ بِهِمْ اِدَارَ اَمَ الْاَرْضِ فِي يَمْنٍ اُرِيدَ اَشْرُ نَذْرِي لَا وَاُنَا

‘আর নিশ্চয় আমরা জানি না, জমিনে যারা রয়েছে তাদের জন্য অকল্যাণ চাওয়া হয়েছে, নাকি তাদের রব তাদের ব্যাপারে মঙ্গল চেয়েছেন’ - (সূরা আল স্বিন, ১০)।

বস্তুত আল্লাহ তাআলা এমন কোনো বিষয় আদৌ সৃষ্টি করেননি, যা সকল দিক থেকে মন্দ; কেননা তা হবে আল্লাহর হিকমতের বিপরীত। অতএব আল্লাহ তাআলা এমন কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করেন না, যা সকল বিবেচনায় অকল্যাণকর, যার সৃষ্টিতে কোনোদিক থেকেও কোনো কল্যাণ নেই। আর আল্লাহ তাআলা তো হলেন এমন সত্তা যিনি সকল কল্যাণের মালিক। তিনি অকল্যাণের সম্পৃক্ততা থেকে মুক্ত। অতএব যা-কিছু আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত, তা ভালো ও কল্যাণকর। আর যা-কিছু অকল্যাণকর, তা এ জন্য অকল্যাণকর হয়েছে যে, তা আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। [আদীনুল খালেস: ১/১৪৪]

উদাহরণত, অসুস্থতা একটি মন্দ বিষয়, তা ইহলোকে মানুষের পক্ষে একটি মুসীবত, তবে পরকালের বিচারে তা মানুষের পক্ষে কল্যাণকর, আল্লাহর তাআলার বিচারেও তা ভালো,

কেননা অসুস্থতার ফল হিসেবে যা আসে, তা হলো গুনাহ মাফ হওয়া, আত্মা পরিশুদ্ধ হওয়া। অনুরূপভাবে কাফেররা যদি জেলে আবদ্ধ করে মুমিনদের কষ্ট দেয়, তবে এতে বাহ্যত দুঃখ-কষ্ট হয়ে থাকে, কিন্তু এর মাধ্যমে মুমিনদের মধ্যে কে সাম্রা ঈমানদার, আর কে দুর্বল ঈমানের অধিকারী তা যাচাই হয়ে যায়, পাশাপাশি এর মাধ্যমে মুমিনদের আত্মোন্নতিও ঘটে। উপরন্তু এর মাধ্যমে মুমিনরা লাভ করতে পারে অফুরান ছাওয়াব। ইবলীসকে সৃষ্টি করার মধ্যেও অনেক হিকমত নিহিত। যেমন, ইবলীসের প্ররোচনায় পদস্বলনের পর মানুষের তাওবা করা, ইবলীস ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াই করে মুমিনদের মধ্যে কে আল্লাহর দাসত্ব করা অব্যাহত রাখে, তা বের করে নিয়ে আসা। ইবলীসের প্ররোচনার বিরুদ্ধে ধৈর্যের পরিচয় দেয়া এবং আল্লাহর সাহায্য চাওয়া এবং তাঁর আশ্রয়ে নিজেকে সঁপে দেয়া।

[ইমাম ইবনুল কাইয়েম ইবলীস সৃষ্টির পেছনে বহু হিকমত রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি হলো নিম্নরূপ:

ক- আল্লাহ তাআলা যে বিপরীতমুখী বিষয়ও সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন, তা প্রকাশ করা। অতঃপর ফেরেশতা জিবরিল - যে পবিত্র ও নিষ্পাপ এবং সকল কল্যাণের কারণ-এর মুকাবিলায় ইবলীসের মতো জীব সৃষ্টি করা, যে সর্বনিকৃষ্ট এবং সকল দুষ্কর্মের কারণ, আল্লাহ তাআলার অপার ক্ষমতাকেই নির্দেশ করে। অনুরূপভাবে রাত ও দিন, ব্যাধি ও ওষুধ, জীবন ও মৃত্যু, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ইত্যাদি সৃষ্টি করা মহান আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতা ও পরিপূর্ণ কুদরতকেই নির্দেশ করে।

খ- আল্লাহ তাআলার পরাক্রমশালিতা-নির্দেশক যেসব নাম রয়েছে, তার প্রভাব প্রকাশ পাওয়া। যেমন আল-কাহহার (পরাক্রমশালী), আল মুত্তাকিম (প্রতিশোধ গ্রহণকারী), আশ্বাদীদুল ইকার (কঠিন শাস্তিদাতা), আশ্বারীউল হিসাব (অতিক্রান্ত হিসাব গ্রহণকারী), যিল বাতশিশ শাদীদ (কঠিন আঘাতকারী), আল মুইয় ওয়াল মুয়িল (সম্মানদাতা ও লাঞ্ছনাকারী)। আল্লাহ তাআলার এসব নাম ও কর্মের দাবি হলো, সৃষ্টিজগতে এমন বিষয় উপস্থিত থাকা, যার সঙ্গে তা সম্পৃক্ত হতে পারবে। আর তাই, যদি মানুষের প্রকৃতি ফেরেশতাতুল্য হত, তবে এসব নামের প্রভাব প্রকাশ পেত না।

গ- আল্লাহ তাআলার ওইসব নামের প্রভাব প্রকাশ পাওয়া যা তাঁর ক্ষমা ও ধৈর্য, মাগফেরাত, বান্দাকে পাকড়াও না করা, যাকে তিনি চান তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিদান ইত্যাদিকে নির্দেশ করে। অতএব যদি আল্লাহ তাআলা এমন কার্যকারণ সৃষ্টি না করতেন, যার ফলস্বরূপ এ সব নামের প্রভাব প্রকাশ পাবে, তা হলে এ সবার হিকমত ও উপকারিতা বাতিল হয়ে যেত।

ঘ- যেসব নাম আল্লাহ তাআলার হিকমত ও প্রজ্ঞা প্রকাশক, তার প্রভাব প্রকাশ পাওয়া। যেমন আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা সম্মান দেন, আর যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন, তিনি জানেন রিসালত কোথায় রাখবেন, তিনি জানেন কে তা গ্রহণের জন্য অধিক উপযোগী এবং এ নেয়ামত পেয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করবে।

ঙ- বান্দাদের বিভিন্ন প্রকারের দাসত্বের প্রকাশ ঘটানো, যা ইবলীস সৃষ্টি না করলে প্রকাশ পেত না। যেমন আল্লাহর পথে লড়াই করা, আল্লাহর খাতিরে বন্ধুত্ব ও মহব্বত, আল্লাহর খাতিরে কাউকে ঘৃণা করা, সংকাজে আদেশ ও অসংকাজে নিষেধ করা, তাওবা করা ও আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়া, শয়তানের বিরুদ্ধাচরণ ও তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং আত্মসম্মতি থেকে বেঁচে থাকা ইত্যাদি। - দেখুন মাদারিজুস সালেকীন:২/১৯৪]

অতএব অকল্যাণ বিষয়টি আপেক্ষিক ও যৌগিক। অর্থাৎ তা আল্লাহ তাআলার কর্মসংলগ্ন হওয়ার বিচারে ভালো, আর যার জন্য তা অকল্যাণকর, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার বিচারে তা মন্দ। অতএব প্রতিটি অকল্যাণেরই দুটি দিক রয়েছে, একটি ভালো, আরেকটি মন্দ। ভালোটি হলো আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার দিক, যেহেতু তা আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি, তৈরি ও ইচ্ছা এবং এতে আছে আল্লাহ তাআলার সীমাহীন হিকমত, যার জ্ঞান তিনি নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন অথবা তাঁর বান্দাদের কাউকে যদি কিছু জানাতে চেয়েছেন, জানিয়েছেন।

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৫১ : অজুহাত হিসেবে ভাগ্যের ব্যবহার করা

অজুহাত হিসেবে ভাগ্যের ব্যবহার করা

মুশরিকরা শিরকে অনড় থাকার পক্ষে অজুহাত হিসেবে ভাগ্যকে ব্যবহার করেছে। তাদের বক্তব্য ছিল- আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা না হলে তারা মুশরিক হত না। আল্লাহ তাআলা তাদের এ অজুহাতের অকাট্য জবাব দিয়ে বলেন,

مَا لِّلّٰهِ شَآءٌ لَّوْ أَشْرَكُوا الَّذِيْنَ سَيَقُولُ
قَبْلِهِمْ مِّنَ الَّذِيْنَ كَذَّبَ كَذِبَ شَيْءٍ مِّنْ حَرَمِنَا وَلَا أَبَاؤُنَا وَلَا أَشْرَكُنَا
إِلَّا تَتَّبِعُونَ إِنَّا فَتَخْرُجُوهُ عِلْمٌ مِّنْ عِنْدِكُمْ هَلْ قُلْ بِأَسْنَا ذَاقُوا حَتَّى
شَاءَ فَلَوْ الْبَالِغَةُ الْحُجَّةُ فَلِلّٰهِ قُلْ تَخْرُصُونَ إِلَّا أَنْتُمْ وَإِنَّ الظَّنَّ
أَجْمَعِينَ لَهَذَاكُمْ .

‘অচিরেই মুশরিকরা বলবে, ‘আল্লাহ যদি চাইতেন, আমরা শিরক করতাম না এবং আমাদের পিতৃপুরুষরাও না এবং আমরা কোন কিছু হারাম করতাম না’। এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, যে পর্যন্ত না তারা

আমার আজাব আশ্বাদন করেছে।

বল, ‘তোমাদের কাছে কি কোনো জ্ঞান আছে, যা তোমরা আমাদের জন্য প্রকাশ করবে? তোমরা তো শুধু ধারণার অনুসরণ করছ এবং তোমরা তো কেবল অনুমান করছ’ বল, ‘চূড়ান্ত প্রমাণ

আল্লাহরই। সুতরাং যদি তিনি চান,

অবশ্যই তোমাদের সবাইকে হিদায়েত দেবেন’ - (সূরা আল আনআম, ১৪৮-১৪৯)।

যারা নিজেদের পাপ-অন্যায়ের পক্ষে ভাগ্যকে অজুহাত হিসেবে পেশ করে, এটা হলো তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলার জবাব। আর চূড়ান্ত প্রমাণ আল্লাহরই। আল্লাহ তাআলার এ জবাবটি অত্যন্ত স্পষ্ট; কেননা তা দুটি সুস্পষ্ট সর্বস্বীকৃত বিষয়ের ওপর নির্মিত, যে ব্যাপারে কেবল হিতায়েত ছেড়ে অন্ধস্থ পছন্দকারী ব্যক্তিরাই বিতন্ডা করতে পারে। জবাব দুটি হলো-

প্রথমত : আল্লাহ তাআলা বিগতযুগের কাফেরদের তাঁর শাস্তি আশ্বাদন করিয়েছেন। তাদের ওপর তিনি আজাব নায়িল করেছেন। অতএব তারা যেসব অন্যায়-অপরাধ, কুফরি-শিরক করেছিল, তা যদি স্বেচ্ছায় করে না থাকত, তবে আল্লাহর তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতেন না; কারণ তিনি ইনসাফগার, তিনি কাউকে জুলুম করেন না। আর যারা নিজেদের কুফর-শিরক ও পাপ-গুনাহের পক্ষে ভাগ্যকে অজুহাত হিসেবে পেশ করে, তাদের দু-অবস্থা হতে পারে, তারা হয়ত আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী হবে, অথবা অবিশ্বাসী হবে। যদি বিশ্বাসী হয়, তা হলে আল্লাহ তাআলা যে ইনসাফগার, কাউকে জুলুম করা থেকে তিনি যে পবিত্র, এ কথার প্রতিও তাদের বিশ্বাস রাখতে হবে। কারণ জুলুম হলো একটি ত্রুটি যা আল্লাহর সঙ্গে কখনো যুক্ত হতে পারে না। আর আল্লাহ তাআলা সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র, কোনো অবস্থাতেই কোনো ত্রুটি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আর এটা নিঃসন্দেহ যে, কোনো ব্যক্তিকে যদি কোনো কাজ করতে বাধ্য করা হয়, এরপর সে কাজের জন্য তাকে শাস্তি দেয়া হয়, তবে তা জুলুম বলে পরিগণিত হবে। অতএব যদি কেউ, ইতোপূর্বের পাপীদের ওপর নেএ আসা শাস্তি প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও, নিজের পাপকর্মের পক্ষে তাকদীরের লিখনকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করায়, তবে সে আল্লাহর সঙ্গে জুলুমকে সম্পৃক্ত করছে, যা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আর যদি ভাগ্যকে অজুহাত হিসেবে পেশকারী ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী হয়, তাহলে এটা হবে ঘোরতর বৈপরীত্য; কেননা সে একদিকে আল্লাহর অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে না, অন্যদিকে বলছে যে, আল্লাহ তার ভাগ্যে এরূপ লিখে রেখেছেন। অতএব এরূপ ব্যক্তি আদৌ কোনো জবাব লাভের উপযোগী নয়।

দ্বিতীয়ত : নিজের কুফরি ও পাপের পক্ষে ভাগ্যকে অজুহাত হিসেবে পেশকারী ব্যক্তি মুখ্যভাবে আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করছে। কারণ একজন কাফের বা পাপী কীভাবে বলতে পারে যে, তার দ্বারা কুফর বা পাপকর্ম সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তার ভাগ্যে তা লিখে রেখেছেন? কোনো কাজ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে এ ব্যাপারে কি লিখা আছে তাতো একটি অদৃশ্য বিষয়, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আর আল্লাহ তাআলা তো কুফরি, পাপ-গুনাহ করতে নিষেধ করেছেন, তিনি তাঁর ইবাদত করতে বলেছেন, তাঁর বিধান মূতাবেক চলতে বলেছেন। সহজভাবে বলতে গেলে- কোনো ব্যক্তির পক্ষে এ কথা বলা কি করে শুদ্ধ হবে যে, আমি চুরি করতে যাচ্ছি, কেননা চুরি করা আল্লাহ আমার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন, অতঃপর আল্লাহ তাআলার সে ভাগ্যলিখন বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি? এ ব্যক্তি কী লাওহে মাহফুযে যা লেখা আছে তা পড়ে দেখেছে, যার কারণে সে জানতে পেরেছে যে, তার ভাগ্যে চুরি করা লেখা আছে? অথচ সে এ মুহূর্তে পাপ থেকে বিরত থাকা এবং চুরি না করার ব্যাপারে, আল্লাহ তাকে যে খেতাব করেছেন, তা অনুসরণ করা তার জন্য আবশ্যিক ছিল। এ ধরনের চূড়ান্ত প্রমাণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ভাগ্যকে প্রমাণ হিসেবে পেশকারীদের অকাট্য জবাব দিয়েছেন। এর আরেকটি উদাহরণ নিম্নবর্তী আয়াত। ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ يٰۤهٰٓاَۤمَنَّا ۖ وَاللّٰهُ اَبۡءَانَا يٰۤهٰٓعَدۡ وَجَدْنَا قَالُوۡا فَاَحۡشَۃً فَعَلُوۡا ۚ وَاِذَا تَعَلَّمُوۡنَ لَا مَالِ لََّۤ عَلٰۤى اَتَقُوۡلُوۡنَ يٰۤاَلۡفَحۡشَآءُ يٰۤاُمۡرُ لََّۤ اللّٰهُ اِنَّ

‘আর যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে তখন বলে, ‘আমরা এতে আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি এবং আল্লাহ আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন’। বল, ‘নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না?— (সূরা আল আরাফ, ২৮)।

বস্তুত উল্লিখিত ধরনের ভাগ্যবাদীদের বিরুদ্ধে আল-কোরানের জবাবদান-পদ্ধতি, মানুষের চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিকোণ চমৎকারভাবে শুদ্ধ করে দেয় এবং বলে যে, মানুষের দায়িত্ব হলো আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করা, যা-কিছু নিষিদ্ধ তা থেকে বিরত থাকা। মানুষের কাজ এটা নয় যে, আল্লাহ তাআলা অদৃশ্য আকারে তার জন্য কি রেখেছেন তা তালাশ করা, যাতে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে।

সাইয়েদ কুতুব (র.) সূরা আল আনআমের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ‘দ্বিতীয় সূক্ষ্ম বিষয়টি হলো, মানুষের চিন্তা-চেতনা শুদ্ধ করা সংক্রান্ত। আর তা হলো, আল্লাহ তাআলা মানুষকে কিছু নির্দেশ দিয়েছেন এবং কিছু বিষয় থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। এ নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাগুলো সুনিশ্চিতরূপে জানা আছে যা বাস্তবায়ন করা তাদের ক্ষমতার আওতাধীন, বরং তারা কেবল এতটুকুই পারে। পক্ষান্তরে ‘আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা’ কেবলই একটি অদৃশ্য-গায়েবি বিষয়, যা উন্মোচিত করার কোনো ক্ষমতা তাদের নেই, আর তাই মানুষের পক্ষে তা জানা কখনো সম্ভবপর নয়। আর যে বিষয়টি নিশ্চিতরূপে জানা সম্ভবপর নয়, তা কি করে অজুহাত হিসেবে পেশ করা শুদ্ধ হতে পারে? আল্লাহ তাআলার আদেশ নিষেধগুলো অকাট্যরূপে জ্ঞাত। তা হলে নিছক কল্পিত অজানা বিষয়ের পেছনে পড়ে এই অকাট্যরূপে জ্ঞাত বিষয়গুলো পরিত্যাগ করা কি করে শুদ্ধ হতে পারে? এটাই হলো এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা। অর্থাৎ মানুষকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়নি যে, অদৃশ্যে আল্লাহ তাআলা তার জন্য কি ইচ্ছা রেখেছেন, তার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন, তা সে তালাশ করতে যাবে, যাতে এ সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। বরং মানুষকে আল্লাহ তাআলা যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তা হলো, তাঁর আদেশ নিষেধের জ্ঞান লাভ করা, যাতে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে

চলতে পারে। মানুষ যখন এ পথে চলার চেষ্টা চালায়, আল্লাহ তাকে হিদায়েত নসীব করেন, তার হৃদয় ইসলামের জন্য খুলে দেন। এ বিষয়ে এতটুকুই তাদের জন্য যথেষ্ট, যা তাদের বাস্তবজীবনে পরিস্ফুটিত হয়ে দেখা দেয়, অত্যন্ত সহজ ও স্বচ্ছ আকারে, সকল অস্পষ্টতা থেকে দূরে, বিতর্ক ও বিতর্কজনিত টানাপড়েন থেকে দূরে। আল্লাহ যদি চাইতেন, তাহলে শুরুতে আদম সন্তানকে এমন প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করতে পারতেন, যা কেবল হিদায়েতকেই জানবে, অথবা তিনি তাদের হিদায়েতের পথে চলায় বাধ্য করতে পারতেন, অথবা তাদের অন্তরে হিদায়েত ঢেলে দিতে পারতেন, যাতে সকলেই স্বেচ্ছায় স্বতস্ফূর্তভাবে হিদায়েতের ওপর চলতে শুরু করে। কিন্তু তিনি এরূপ চাননি। বরং তিনি হিদায়েত ও গোমরাহি উভয় পথে চলার ক্ষমতা দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন। তিনি চেয়েছেন, যে ব্যক্তি হিদায়েতের দিকে ধাবমান হবে, তাকে তিনি হিদায়েতপ্রাপ্তি ও তদনুযায়ী চলার ক্ষেত্রে সাহায্য করবেন। আর যে ব্যক্তি গোমরাহির দিকে ধাবমান হবে তাকেও তিনি সুযোগ দেবেন। অতএব বিষয়টি খুবই স্পষ্ট এবং এমন সহজ অবকাঠামোয় নির্মিত যা মানুষের বোধ-বুদ্ধির পক্ষে সহজেই বোধগম্য। এর বিপরীতে এ ব্যাপারে বাকবিতন্ডা, যুক্তি-প্রতিযুক্তির লড়াই- তা ইসলামী অনুভূতি থেকে দূরের, ইসলামী পদ্ধতি থেকে দূরের একটি বিষয়। কোনো ফালসাফা-দর্শন, থিওলজির ক্ষেত্রেই এ বিষয়ক বিতন্ডা সন্তোষজনক নিষ্পত্তির চেহারা অদ্যাবধি দেখেনি; কেননা এ সবার পরিমন্ডলে বিষয়টিকে এমন এক আঙ্গিক থেকে পর্যালোচনা করা হয় যা এর প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য খোঁজে পায় না। পরিশেষে বলতে চাই যে, এ দ্বীন এসেছে একটি ফলিত বাস্তবতা কায়ম করতে। যে বাস্তবতার সীমানা-নির্ধারণ করবে তাতে থাকা স্পষ্ট আদেশ-নিষেধমালা। অতএব অদৃশ্য ইচ্ছার অজুহাত দেয়া অন্তহীন এক ঘূর্ণাবর্তে নিজেকে নিষ্ক্ষেপ করা। যেখানে মানববুদ্ধি প্রমাণ ছাড়া বিচরণ করে বেড়াবে, নষ্ট করবে মূল্যবান শ্রম যা ব্যয় হওয়া উচিত বাস্তবমুখী ইতিবাচক সব কাজে। [সাইয়েদ কুতুব, ফী যিলালিল কুরআন ৮/১২২৭]

অতএব, প্রিয় পাঠক! কোনো কাজ করার পূর্বে আপনার কাছে আল্লাহর দাবি হলো আপনি একমাত্র তাঁর আনুগত্য করবেন এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকবেন। আর কর্মের পর দাবি হলো, যদি আপনি আল্লাহর আনুগত্য করে থাকেন, তবে তার শোকর আদায় করবেন। আর যদি পাপ করে থাকেন, তবে তাওবা করে তাঁর কাছে ফিরে যাবেন। আপনি আপনার কাজে আল্লাহর তাআলার শরণাপন্ন হবেন। আল্লাহর আদল-ইনসাফ ও হিকমতে প্রগাড় বিশ্বাস রাখবেন। যা-কিছু পাপ-গুনাহ বলে বিবেচিত, তা সদাসর্বদা ঘৃণা করে চলবেন, যাতে এ ঘৃণার অনুভূতি আপনাকে পাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। আর যদি কখনো কোনো পাপ আপনার দ্বারা সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে পাপকে ঘৃণা করার অনুভূতি যেন আপনাকে তৎক্ষণাৎ তাওবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। জেনে রাখবেন, পাপকে ঘৃণা করার অর্থ ভাগ্যালিপিকে ঘৃণা করা নয়। বরং এটা হলো আল্লাহর দাবি যে, তিনি যা ঘৃণা করেন তা আপনিও ঘৃণা করবেন, তিনি যা পছন্দ করেন তা আপনিও পছন্দ করবেন, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির সঙ্গে আপনার কর্মের সাযুজ্য বজায় রাখবেন। অতএব আল্লাহ তাআলা যে বিষয়ে সন্তুষ্ট সে বিষয়ে আপনিও সন্তুষ্টচিত্ত থাকবেন, তিনি যে বিষয়ে অসন্তুষ্ট হন আপনিও সে বিষয়ে অসন্তুষ্টচিত্ত থাকবেন। আরও জেনে রাখবেন যে, আল্লাহ তাআলা কুফরি পছন্দ করেন না, বান্দারা কুফরি করুক আল্লাহ তা পছন্দ করেন না, তিনি পাপ-গুনাহ পছন্দ করেন না, তাঁর বান্দাদের কেউ পাপ-গুনাহ করুক তা তিনি পছন্দ করেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

تَشْكُرُوا وَإِنَّ الْكُفْرَ لِعِبَادِهِ يَرْضَى وَلَا عَنْكُمْ غَيْرِيَّ اللَّهُ إِنْ فَ تَكْفُرُوا إِنْ لَكُمْ يَرْضَاهُ

‘তোমরা যদি কুফরি কর তবে (জেনে রাখ) আল্লাহ তোমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী; আর তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফরি পছন্দ করেন না এবং তোমরা যদি শোকর কর তবে তোমাদের জন্য তিনি তা পছন্দ করেন’ – (সূরা আয-যুমার, ৭)।

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৫২ : ভাগ্য অদৃশ্য বিষয়, তা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা
অপছন্দনীয়

ভাগ্য অদৃশ্য বিষয়, তা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা অপছন্দনীয়

ভাগ্যের বিষয়ে একজন মুমিনের যা করণীয় তা হলো ভাগ্যের অর্থ ও পর্যায়সমূহ জানা, ভাগ্যের প্রতি ঈমান রাখা, আল্লাহ তাআলা সকল বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত, তিনি সকল বিষয়ের স্রষ্টা, তিনি যা চেয়েছেন তা হয়েছে, যা চাননি তা হয়নি- এ বিষয়ে বিশ্বাস রাখা। আরও বিশ্বাস রাখা যে তিনি ইনসাফগার, তিনি কাউকে জুলুম করেন না, তিনি অযথা কাজ থেকে পবিত্র, ভাগ্য বিষয়ে এর থেকে অধিক জানার কোনো আবশ্যকতা একজন মুমিনের নেই। আল্লাহ আমাদের যা জানিয়েছেন তা আমাদের প্রয়োজনের নিরিখেই জানিয়েছেন, আর যা জানাননি সে ব্যাপারে ঘাঁটাঘাঁটি করার আদৌ কোনো আবশ্যকতা নেই। কেননা তা করতে গেলে আমরা মতানৈক্যে লিপ্ত হব, ফলে ধ্বংস হয়ে যাব; কারণ আমাদের বুদ্ধি-মনীষা সীমিত ক্ষমতার অধিকারী, পৃথিবী নির্মাণ করতে যেটুকুর প্রয়োজন সে টুকু। অতএব যা গায়েবের পর্দার আড়ালে, যার জ্ঞান আল্লাহ তাআলা নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন, সে ব্যাপারে ঘাঁটাঘাঁটি করার দায়িত্ব আমাদের ক্ষীণ বুদ্ধি-মনীষাকে দেয়া হয়নি। অতএব আমাদের সামনে একমাত্র যে পথ খোলা, তা হলো আল্লাহসমর্পণ করা এবং আল্লাহ তাআলা যেসব গায়েবি বিষয়ের সংবাদ আমাদের দিয়েছেন, তার প্রতি ঈমান আনা। এসব বিষয়ের মধ্যে একটি হলো মানুষের ইচ্ছা ও আল্লাহর তাআলা কর্তৃক কর্মসৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক ও মানুষ দ্বারা সে সব কর্ম সম্পাদিত হওয়ার বিষয়টি। এটিই শুধু একমাত্র গায়েবি বিষয় নয়, যার স্বরূপ উদ্ঘাটন মানববুদ্ধির পক্ষে অসম্ভব; কারণ আমরা আল্লাহর তাআলার গুণাবলির আছর ও প্রভাব আঁচ করতে পারি, কিন্তু তার ধরন-ধারণ কি তা জানি না। তা অনেকটা আল্লাহর সত্তার মতোই যার আকার-ধারণ বুঝা মানববুদ্ধির সাধ্যের বাইরে। [দেখুন তাবসীতুল আকাইদ আল ইসলামীয়াহ]

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাগ্য নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা নিষেধ করে দিয়েছেন। সহিহ বুখারিতে বর্ণিত এক হাদিস অনুযায়ী, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন বের হলেন। মানুষ তখন ভাগ্য নিয়ে কথা বলছিল। ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা রাগে এমন রক্তিম হয়েছিল, যেন তাতে ডালিমের দানা মাথানো। তিনি বললেন,

‘তোমাদের কী হয়েছে যে আল্লাহর কিতাবের একাংশ অন্য অংশ দ্বারা আঘাত করছ, এরূপ করেই তো তোমাদের পূর্বের জাতিরা ধ্বংস হয়েছিল। [সাইয়েদ সাবেক, আল আকাইদ আল ইসামিয়ার পৃ.৯৯]

ইমাম তাহাবী (র.) খুব চমৎকার বলেছেন, ‘ভাগ্য মূলত সৃষ্টিজীব বিষয়ে আল্লাহর এক রহস্য। এমনকি নিকটতাপ্রাপ্ত কোনো ফেরেশতাও এর রহস্যের পর্দা উন্মোচিত করতে পারেনি। নবি এবং রাসূলও না। ভাগ্য বিষয়টি তলিয়ে দেখতে যাওয়া, তাকদীরের গভীরে প্রবেশ করতে যাওয়া লাঞ্ছিত হওয়ার একটি পথ, বঞ্চিত হওয়ার সিঁড়ি, তা বরং একপ্রকার ঔদ্ধত্য বই কি। অতএব সাবধান! সাবধান! এ নিয়ে চিন্তাভাবনা থেকে বিরত হোন, এ নিয়ে হৃদয়ে উত্থিত যে কোনো প্রকার ওয়াস্‌ওয়াসা প্রতিরোধ করুন। কারণ আল্লাহ তাআলা ভাগ্য বিষয়ক জ্ঞান মানুষ থেকে গোপন করেছেন, এ বিষয়ের সীমানা জরিপ করতে তিনি মানা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يُسْأَلُونَ وَهُمْ يَفْعَلُونَ عَمَّا يُسْأَلُ لَا

‘তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা যাবে না; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে’ – (সূরা আল আশ্বিয়া, ২৩)।

অতএব যে ব্যক্তি এ প্রশ্ন উত্থাপন করল যে, আল্লাহ তাআলা অমুক কাজটি কেন করলেন? সে কিতাবের হুকুম রদ করে দিল, আর যে কিতাবের হুকুম রদ করে দিল সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল। যাদের অন্তরাত্মা আলোকিত, যেমন আল্লাহর ওলীগণ, তাদের এর চেয়ে অধিক কিছু প্রয়োজন নেই। এটা হলো গভীর জ্ঞানের অধিকারীদের পর্যায়। কারণ জ্ঞান দু-প্রকার, সৃষ্টিজীবে থাকা জ্ঞান এবং সৃষ্টিজীবে না থাকা জ্ঞান। সৃষ্টিজীবে থাকা জ্ঞান অস্বীকার করা কুফরি এবং সৃষ্টিজীবে না থাকা জ্ঞান দাবি করাও কুফরি, আর ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয় না, যদি না সৃষ্টিজীবে-থাকা জ্ঞান গ্রহণ করা হয় এবং সৃষ্টিজীবে না-থাকা জ্ঞান তালাশ-অনুসন্ধান পরিত্যাগ করা হয়। [দেখুন আল আকীদা আত্-তাহাবিয়াহ পৃ.২৭৬]

মুসলমানের জীবনে তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসের প্রভাব

আল্লাহর হিকমত-প্রজ্ঞা ও ইচ্ছার সামনে আত্মসমর্পণ, রব্বানী হিকমতের বিস্তীর্ণ চিত্র বিষয়ে প্রশ্ন না করার ভিত্তি ওপরই দাঁড়িয়ে আছে দ্বীন-ইসলামের সৌধ। সাহাবীগণ (রাযি.) এভাবেই নির্মাণ করেছিলেন তাদের জীবন। ইসলামের পদযুগল আত্মসমর্পণের স্তরে গিয়েই কেবল স্থিরতা পায়। অতএব আল্লাহর নির্দেশকে তাসীম করার সর্বপ্রথম ধাপ তা অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করে নেয়া। এরপর তা বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া। এরপর তা বাস্তবায়নের জন্য দ্রুত অগ্রসর হওয়া। [প্রাগুক্ত] সাহাবায়ে কেরাম এরূপই ছিলেন। তাঁরা আল্লাহর সঙ্গে আদব রক্ষায় সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপকারী ছিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সর্বোচ্চ আদব রক্ষা করে চলতেন। সাহাবীগণের (রাযি.) ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের চেয়ে উত্তম জাতি আর দেখিনি। তাঁরা তাঁকে, ইহলোক ত্যাগ করা পর্যন্ত, মাত্র শোলটি প্রশ্ন করেছিলেন।’ [ইলামুল মুয়াক্কিঈন:১/৭১]

ভাগ্য বিষয়ে সাহাবী, তাবেঈ ও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের সকলেই একমত যে, যা-কিছু কিয়ামত পর্যন্ত ঘটবে তার সবই উম্মুল কিতাব (Mother Book)-এ লেখা রয়েছে। ইবনুদ দায়লামী বর্ণনা করে বলেন, আমি উবাই ইবনে কা’আবের (রাযি.) কাছে গেলাম। বললাম, আমার অন্তরে তাকদীর বিষয়ে একটা কিছু পতিত হয়েছে, আপনি আমাকে কিছু বলুন, যাতে সে বিষয়টি আমার অন্তর থেকে চলে যায়।

তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা যদি তাঁর আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসীকে আজাব দেন, তবে তিনি এ আজাবদানের কারণে জালেম হিসেবে পরিগণিত হবেন না। আর যদি তিনি তাদের প্রতি করুণা করেন, তবে এ করুণা তাদের আমল থেকে উত্তম হবে। আর যদি তুমি ওহদ পাহাড়ের সএ পরিমাণ স্বর্ণ দান কর, তবে আল্লাহ তা কবুল করবেন না যদি না তুমি তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস কর। আর জেনে রাখো, যা তোমাকে স্পর্শ করেছে, তা তোমাকে ভুল করার ছিল না। আর যদি তুমি তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস ছাড়া মারা যাও, তবে তোমার জাহান্নামে গমন সুনিশ্চিত। (বর্ণনাকারী বলেন) এরপর আমি ইবনে মাসউদ (রাযি.) এর কাছে গেলাম। তিনিও আমাকে অভিন্ন কথা বললেন। আমি হুয়াইফা (রাযি.) এর কাছে গেলাম। তিনিও আমাকে একইরকম বললেন। আমি যায়েদ ইবনে ছাবেতের (রাযি.) কাছে গেলাম তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে অনুরূপ বললেন।’ [দেখুন সহীহুল জামে আস-সাগীর:৫/৫৭]

উবাদা ইবনুস সামেত (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি মৃত্যুর সময় তাঁর ছেলেকে বলেছেন, হে আমার বৎস, তুমি হাকীকতে ঈমানের মজা পাবে না যতক্ষণ না তুমি বিশ্বাস করবে যে, যা তোমাকে স্পর্শ করেছে, তা তোমাকে ভুল করার ছিল না, আর যা তোমাকে ভুল করেছে, তা তোমাকে স্পর্শ করার ছিল না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন, তা ছিল কলম। তিনি কলমকে বলেছেন, লেখো, কলম বলেছে, আমি কী লিখব? তিনি বলেছেন কিয়ামত পর্যন্তের জন্য সকল জিনিসের পরিমাণ বা তাকদীর লিপিবদ্ধ করো। হে বৎস, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস ভিন্ন অন্য বিশ্বাস নিয়ে মারা যাবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।’

সাহাবীদের (রাযি.) অন্তরে, এ বিশ্বাস, সীমাহীন আশার সঞ্চার করেছিল। তাঁরা পৃথিবী বক্ষে বন্ধুর-পাহার-সাগর সব দৃষ্টপদে মারিয়ে যান ভাগ্যের প্রতি এ বিশ্বাস বুক ধারণ করেই, ঠিক সেভাবে যেভাবে রাসূল (সা.) তাদের শিখিয়েছেন। সালমান ফারেসী (রাযি.) ইবনে আববাস (রাযি.) কে বলেছেন, ‘হে বালক, তুমি আল্লাহকে সংরক্ষণ কর, তিনি তোমাকে সংরক্ষণ করবেন। আল্লাহকে তুমি সংরক্ষণ করো তাঁকে তোমার পক্ষে পাবে। তুমি যদি কিছু চাও তবে আল্লাহর কাছেই চাও, যদি সাহায্য প্রার্থনা কর, তবে আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। জেনে রাখ, যদি সমগ্র জাতি একত্র হয়ে তোমার কোনো উপকার করতে চায়, তবে আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত তারা তোমার কোনো উপকারই করতে পারবে না। আর যদি সমগ্র জাতি তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্র হয়, তবে আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত তারা তোমার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, কাগজ শুকিয়ে ফেলা হয়েছে। [তিরমিযি, আস-সুনান] এ বিশ্বাস তাঁদের অন্তরে প্রশান্তির সুশীতল ঝরনাধারা সদাপ্রবাহমান করে রেখেছিল। তাদের হৃদয়ে ঢেলে দিয়েছিল পরিতৃপ্তির সুধা। এ বিশ্বাস তাদের শৌর্যবীর্য-ইয়্যাত-মর্যাদার উর্বর ভূমিতে বড় করে তুলেছে। আর তাই শান্ত-স্থির স্নায়ু নিয়ে তাঁরা ছুটে চলেছেন গোত্র থেকে গোত্রে, দেশ থেকে দেশে, দ্বীন প্রচারের মহান দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে। তারা পৃথিবীর তাবৎ বড়-বড় শক্তিকে আদৌ কোনো ভয়ের পাত্র মনে করেননি; কারণ তাদের ছিল ভাগ্যের প্রতি অগাধ বিশ্বাস।

সালমান ফারেসী (রাযি.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ‘ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস করতে হলে মানুষকে কি বলতে হবে?’ তিনি বললেন, ‘ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস করতে হলে জানতে হবে যে, যা তোমাকে স্পর্শ করেনি তা তোমাকে স্পর্শ করার ছিল না, আর যা তোমাকে স্পর্শ করেছে তা তোমাকে ভুল করার ছিল না।’ [আল আজুরী, আশ্শারীয়া পৃ.২০৬] কথাটি শুধু সালমান ফারেসী (রাযি.) এর একার নয়, বরং এটাই ছিল সকল সাহাবীর (রাযি.) কথা। এই আকীদা কত সৌভাগ্যের সৌরভেই না ভরে দেয় মানুষের হৃদয়। কি বীর-বাহাদুরই না বানিয়ে দেয় বিশ্বাসী একজন মানুষকে; কারণ সে বিশ্বাস করে যে সকল বিষয় আল্লাহর হাতে, মানুষের হাতে কিছুই নেই- পৃথিবীর তাবৎ শক্তি ওই মানুষটির সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াতে অক্ষম যে তার অন্তরের মণিকোঠায় এ বিশ্বাসের সুবাসকে জাগ্রত রাখে, যে তার বুক জুড়ে এ বিশ্বাসের আন্দোলন সদা অগ্রসরমান রাখে। এই বিশ্বাসের পটভূমিতেই আমরা খোঁজে পাই সঠিক ব্যাখ্যা ওইসব মহান কর্মের যা বাস্তবায়িত হয়েছে মুমিনদের মাধ্যমে, যারা দ্বীনকে বহন করে বেরিয়ে পড়েছেন অসম্ভবকে সম্ভব করতে। তাঁদের যে কীর্তি, তাদের যে অর্জন তা অলৌকিকতাতুল্য, তবে তা নিরেট বাস্তব। সেই মহান ও বিশাল কর্মকান্ড, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবৃন্দ (রাযি.) বাস্তবায়ন করেছেন, তা আল্লাহর প্রতি লৌহকঠিন ঈমান, পরকাল ও তাকদীরে ইলাহীর প্রতি অনড়-অবিচল বিশ্বাসেরই ফলাফল। যে ব্যক্তি ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসের প্রাচুর্যে শোভিত, এবং জানে যে যা-কিছু তাকে স্পর্শ করেছে তা কখনো লক্ষ্যচ্যুত হবার ছিল না, আর সমগ্র উম্মত যদি একত্র হয় তাকে কোনো ক্ষতি পৌঁছানোর উদ্দেশে, তবে আল্লাহর লিপির বাইরে তারা বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না, আর কোনো আত্মা ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুমুখী হবে না যতক্ষণ না তার রিমিক ও বয়স পূর্ণ করে নেবে। এই বিশ্বাসে বলিয়ান ব্যক্তিই কেবল পারে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর দাসত্বে সঁপে দিতে। এই ব্যক্তির পক্ষে পৃথিবীর বড় থেকে বড় শক্তির সামনে মাথানত করা আদৌ সম্ভব নয়; কারণ সে জানে যে, সকল বিষয় একমাত্র আল্লাহর হাতে, যিনি আসমান, পৃথিবী ও যা-কিছু এ দুয়ে আছে সকলের স্রষ্টা। এই ব্যক্তির পক্ষে কখনো সম্ভব নয় মাটি দ্বারা তৈরি কোনো দাসের সামনে নিজেকে অপদস্থ করা।

ইমাম ইবনে রজব (র.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল যে, জমিনের ওপর যা-কিছু আছে তা কেবলই মাটি, তার পক্ষে, রাজাধিরাজ রাব্বুল আলামীনকে রেখে মাটির পূজায় নিজেকে সঁপে দেয়া কী করে সম্ভব? সে কি সর্বদাতা মালিককে অসন্তুষ্ট করে মাটির সন্তুষ্টি তালাশ করতে যাবে? যদি এরূপ করে তবে তা হবে অবিশ্বাস্য আশ্চর্যের বিষয়। [জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম. পৃ. ৩৮৫]

ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস মানুষের অন্তর থেকে ভয়ভীতির সকল অনুষ্ণ উপড়ে ফেলে তা ভরে দেয় সীমাহীন শক্তি-সাহসে, তাকে প্রাণিত করে প্রবলভাবে, ইসলামের বার্তা নিয়ে হাজির হতে সকল মানুষের দরবারে, এমনকি ফের‘আউনতুল্য দাঙ্কিকদের কাছেও। আদর্শ প্রচারের অনন্ত লড়াইয়ে সে থাকে অনড়-অবিচল। বিপক্ষীয় শিবিরের সকল সরঞ্জাম তার কাছে মনে হয় তুচ্ছ-মূল্যহীন; কারণ সে জানে, আল্লাহ তাঁর রিয়িক পূর্ণ করার দায়িত্ব নিয়েছেন, তাঁর বয়স পূর্ণ করার দায়িত্ব নিয়েছেন। তাই সে হিম্মৎ হারায় না, কাপুরুষ হয় না। বিপদ যা আসার তা ঠেকানোর ক্ষমতা কারও নেই, আর যা আসার নয়, তা কখনো তাকে স্পর্শ করার ক্ষমতা রাখে না। অতএব সে এগিয়ে চলে দৃষ্টপদে, হিমালয়তুল্য দৃঢ়তায় সর্বত্র আল্লাহর কালিমা- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- ছড়িয়ে দেয়া ও উঁচু করার মহান মিশন নিয়ে। যে অন্তরে ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস আছে, তা আরেকটি নেয়ামত-প্রাচুর্য উপভোগ করে, যার সামনে দুনিয়ার তাবৎ প্রাচুর্য তুচ্ছ। আর তা হলো সর্বাবস্থায় সন্তুষ্টচিত্ত থাকার নেয়ামত। অর্থাৎ ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসী অন্তর জানে যে, আল্লাহর নির্দেশ-ইচ্ছা-ব্যবস্থাপনায় ভাগ্যের সকল বিষয়-আশয় ফলিত হয়। আর যা-কিছু ঘটে তা আল্লাহ তাআলার হিকমত ও ইচ্ছার প্রতিফলন-স্বরূপই ঘটে।

কারণ সে জানে যে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

شَرُّ وَهُوَ شَيْئًا تُجِبُّوا أَنْ وَعَسَى لَكُمْ خَيْرٌ وَهُوَ شَيْئًا تَكْرَهُوا أَنْ يَوْعَسَ
تَعْلَمُونَ لَا وَأَنْتُمْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ لَكُمْ

‘এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না’ – (সূরা আল বাকারা, ২১৬)।

অতএব ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসী মানুষ জানে যে, আল্লাহ তাআলা যিনি তার জন্য ভালো ও মন্দ নির্ধারণ করেছেন, তিনি প্রজ্ঞাময়, পরম দয়ালু। আর তাই সে আল্লাহর কোনো নেয়ামতকেই তুচ্ছ গ্তান করে না, কোনো মুসীবতেই সে বিচলিত হয় না। সে সুখে থাকলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে এবং দুঃখে থাকলে ধৈর্যধারণ করে। তার সকল বিষয়ই কল্যাণকর। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘মুমিনের ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক! তার সকল বিষয়ই কল্যাণকর। এটা শুধু মুমিনের ক্ষেত্রেই, অন্য কারও ক্ষেত্রে নয়। আর তা এভাবে যে, মুমিনকে যখন সুখের অবস্থা স্পর্শ করে তখন সে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করে। আর এটা হয় তার জন্য কল্যাণকর। আর যখন দুর্দশায় পড়ে তখন সে ধৈর্য ধরে। আর এটা হয় তার জন্য কল্যাণকর।’ অতএব মুমিন ব্যক্তি বিপদ-মুসীবতের প্রতি এভাবে তাকায় যে, তা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক লেখা ভাগ্য। অতঃপর সে স্থির ও সন্তুষ্টচিত্ত হয়। সে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে যথার্থ আদব বজায় রাখে এবং কখনো তাঁকে প্রশ্ন করে না। শুধু তাই নয় বরং বিপদ-মুসীবতের ইতিবাচক ফলাফলের দিকেও মুমিন দৃষ্টিনিবদ্ধ করে, অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাওয়াব ও প্রতিদান প্রাপ্তি।

অতঃপর সে সন্তুষ্টচিত্ত হয় এবং ধৈর্যধারণ করে। বুখারি ও মুসলিমের এক বর্ণায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘মানুষের মধ্যে সমধিক কঠিন বালা-মুসীবত যাদের দেয়া হয়েছে, তারা হলেন নবিগণ, এরপর যারা অন্যদের চেয়ে উত্তম এবং তাদের পর যারা অন্যদের চেয়ে উত্তম। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার দ্বীনদারিত্বের মাত্রা অনুযায়ী বালামুসীবত দেয়া হয়। যদি তার দ্বীনদারিত্বে অবিচলতা থাকে, তবে তাকে সে অনুপাতেই বালা-মুসীবত দেয়া হয়। আর যদি দ্বীনদারিত্বে কোমলতা থাকে তবে সে অনুপাতেই তার বালা-মুসীবত সহজ করে দেয়া হয়। ব্যক্তির সঙ্গে বালা-মুসীবত লেগেই থাকে যতক্ষণ না তাকে নিষ্পাপ করে জমিনের ওপর চলমান করে দেয়।’

ইমাম ইবনুল কাইয়েম যথার্থই বলেছেন, صبر لها فاصبر بليّة اعترتك وإذا تشكو إنما آدم ابن إلى شكوت وإذا أكرم بك فإنه الكريم لا يرحم الذي من إلى الرحيم

যদি তোমাকে পেয়ে বসে কোনো বিপদ, ধৈর্য ধরো দয়াময়ের ধৈর্যের মতো, তিনি তো তোমার প্রতি নিশ্চয় দয়াশীল অতি মাত্রায়।

আর যদি হাজির হও অভিযোগ নিয়ে ইবনে আদমের দ্বারে, তবে তো তুমি শেকায়েত করছ পরম দয়ালুর, এমন পাত্রের কাছে যে পারে না করতে দয়া।

বিপদ-মুসীবত আল্লাহর

অনুমতি সাপেক্ষেই আসে।

ইরশাদ হয়েছে, أَصَابَ مَا عَلِيمٌ شَيْءٌ بِكُلِّ وَاللَّهُ قَلْبُهُ يَهْدِي اللَّهُ يَأْمُرُ وَمَنْ لَّهِ يَأْذُنُ إِلَّا مُصِيبَةً مِنْ

‘আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আপতিত হয় না। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ, তার অন্তরকে সৎপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বজ্ঞ’ - (সূরা আত্-তাগাবুন, ১১)।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আলকামা (র.) বলেন, ‘অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হয় এবং এ বিশ্বাস রাখে যে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, তাহলে সে সন্তুষ্টচিত্ত হয় এবং শান্তিতে থাকে।’ [তাফসিরে ইবনে কাছীর ৪/৩৭৫]

ইবনে আববাস (রাযি.) বলেন, ‘(আল্লাহ, তার অন্তরকে সৎপথে পরিচালিত করেন) এর অর্থ হলো বান্দার এ বিশ্বাস যে, তার ওপর যা আপতিত হয়েছে তা অবশ্যই হবার ছিল। আর যা আপতিত হয়নি, তা তাকে স্পর্শ করার ছিল না। [প্রাগুক্ত]

এই ঈমানী দৃষ্টিকোণের ছত্রছায়ায় শীর্ষে উঠে যেতে সক্ষম হয়েছে সাহাবীগণের (রাযি.) অন্তরাঙ্গা, তাদের রূহ স্পর্শ করতে পেরেছে আল্লোন্নতির সুউচ্চ শিখর। তাদের অনুভূতি হতে পেরেছে স্পর্শকাতর। এমনকি তাদের দৃষ্টিতে সমান হয়ে গিয়েছিল সুখ-দুঃখ। সদৃশ হয়ে গিয়েছিল শোকর ও সবর। আর তাইতো উমর (রাযি.)-কে বলতে শুনেছি,

‘যদি শোকর ও সবর দুটি

উট হত, তাহলে আমি কোনটায় আরোহণ করলাম তা আমার কাছে গুরুত্বের ব্যাপার হত না।’

আবু মুহাম্মদ আল হারীরী বলেন, ‘ধৈর্য হলো, নেয়ামত এবং দুর্দশা-এ দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য না করা, সঙ্গে-সঙ্গে উভয় অবস্থায় অন্তরকে শান্ত রাখা।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, যদি কারও কাছে এক লক্ষ দিনার থাকে তাহলে কি দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ তথা যাহেদ হতে পারবে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ পারবে, কিন্তু শর্ত হলো – যদি এর থেকে বেশি হয় তবে সে খুশি হবে না, আর যদি তা কমে যায় তবে দুঃখিত হবে না। সালাফদের কেউ বলেছেন, দুনিয়ার মোহমুক্ত ওই ব্যক্তিকে বলা হবে, হালাল যার শোকরকে এবং হারাম যার সবারকে পরাহত করে না। [দেখুন: উত্তাতুস সাবেরীন পৃ. ২২৬]

উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) আবু মুসা আল আশআরী (রাযি.) কে লিখে পাঠান, ‘সন্তুষ্টির মধ্যেই সকল কল্যাণ নিহিত। অতএব যদি সন্তুষ্ট হতে পার তবে তা-ই করো, অন্যথায় ধৈর্য ধরো।’ [মাদারিজুস সালেকীন ২/১৭৭] ইবনে আতা বলেছেন, ‘সন্তুষ্টি হলো আল্লাহ অনাদি চয়ন বিষয়ে অন্তরকে শান্ত রাখা, এই বিশ্বাসে যে তিনি বান্দার জন্য উত্তমটিই চয়ন করেন।’ [প্রাগুক্ত ২/১৭৫]

ধৈর্যধারণ আলেমদের ঐকমত্য অনুযায়ী ওয়াজিব। আর সন্তুষ্টি হলো ধৈর্যের চেয়েও উঁচু পর্যায়ের বিষয়। সন্তুষ্টি অবলম্বন কারও কারও নিকট ওয়াজিব আবার কারও নিকট মুস্তাহাব। তবে আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে সন্তুষ্টি অবলম্বন করা নিদেনপক্ষে মুস্তাহাব। [প্রাগুক্ত ২/১১৭; আর রাওয়া আল্লাদিইয়া পৃ.৪৮৯]

সন্তুষ্টির মূল ভিত্তি হলো ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস করা- ওপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে- এবং বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার যে দয়া-করুণা তা অন্তর দিয়ে অনুভব করা। আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ বলেন, ‘সন্তুষ্টি হলো আল্লাহ তাআলার মহান এক দরজা, দুনিয়ার জাল্লাত, ইবাদতকারী ও সন্তুষ্টিচিহ্নদের বিশ্রামাগার। বিপদদাতা যে ছাওয়াব-প্রতিদান দেবেন এবং বান্দার দুর্দশায় তিনি যে কল্যাণ নিহিত রাখেন তা-ই থাকে তাদের দৃষ্টিতে। তিনি যে ফয়সালা করেন সে ব্যাপারে অভিযুক্ত হন না। আবার কখনো তারা ভাগ্যের প্রতি সন্তুষ্টির ছাওয়াব ভেবে দেখেন এবং ভাগ্যের লিপি হিসেবে যে দুর্দশা এসেছে তা ভুলে যান। আবার কখনো বিপদদাতার আয়মত, মহত্ত্ব, পূর্ণতা ইত্যাদি ভেবে দেখেন এবং এতে তারা এতই নিমগ্নচিত হয়ে পড়েন যে কষ্ট-ক্লেশের কোনো আঁচই তারা অনুভব করতে পারেন না। এর উল্টো বরং কষ্ট-ক্লেশে তারা মজা পান; যেহেতু তা তাদের প্রিয়তমের পক্ষ থেকে আসা।’ [মাদারিজুস সালেকীন ২/১৬৭; জামেউল উলুমি ওয়াল হিকাম পৃ.১৭০] এ ব্যাপারে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- ভাগ্যের প্রতি ঈমানের ফলস্বরূপ যে সন্তুষ্টি ও ধৈর্যের কথা আসে তা হলো বিপদ-মুসীবত বিষয়ক ভাগ্য, আল্লাহর আনুগত্য চর্চা, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং সকল কষ্ট-যাতনায় ধৈর্যধারণ বিষয়ক ভাগ্য। এখানে সন্তুষ্টি বলতে কুফরি, গুনাহ ও আল্লাহর নির্দেশ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ওপর সন্তুষ্ট থাকা নয়, আর ধৈর্য বলতে মানুষের জুলুম ও লাঞ্ছনা নীরবে হজম করে যাওয়ার অর্থে নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার জন্য কখনো কুফরি, গুনাহ, অবাধ্যতা, লাঞ্ছনা পছন্দ করেন না। অতএব আপনার সন্তুষ্টি হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগামী, আপনার ধৈর্য হতে হবে আল্লাহর আনুগত্যে এবং আল্লাহর পথে। ভাগ্যের ফয়সালায় সন্তুষ্টি এবং বিপদাপদে ধৈর্যধারণ এবং আল্লাহর হুকুম নির্দেশের প্রতি প্রশান্তচিত্ততাই হলো সমধিক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি যার ওপর বিনির্মিত হয় অন্তরের স্নিগ্ধতা, স্থির-ভাব। আর এটাই হলো এ পৃথিবী বক্ষে, আল্লাহ প্রদত্ত জীবনপদ্ধতির আওতায়, মানুষের তাবৎ শক্তি-সামর্থ্যের দৃষ্টপদধারণা শুরু হওয়ার সমধিক বিশিষ্ট প্রণোদনা। যেখানে থাকে না কোনো পেছন ফেরার ফুরসত, আফসোস ও লজ্জাবোধের কোনো অনুশঙ্গ- যদি এটা না করে ওটা করতাম, যদি এরূপ না করে ওরূপ করতাম এ সব বলার কোনো বৃত্তি সৃষ্টি হয় না। বরং ‘আল্লাহ যা তাকদীরে রেখেছেন এবং চেয়েছেন তা-ই হয়েছে’ এটাই থাকে তখন একমাত্র বুলি। এই বিশ্বাসে নিহিত আছে হৃদয়ের শান্তভাব।

শরীর, অন্তর, স্নায়ু, চিন্তামুক্ত থাকা, উৎকর্ষামুক্ত থাকার রহস্য। অতএব যারা এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী তাদের থাকে না কোনো হৃদয় খানখান হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ, থাকে না স্নায়ুবিধ পতন, একাকীত্বের বিমর্ষতা, ব্যক্তিত্বের বিক্ষিপ্ততা। বরং যা থাকে তা হলো, তুষ্টি, প্রশান্তি, স্ফূর্তি, আরাম, পরিতৃপ্তি, ইয়াকীনের শীতলতা, চোখের শীতলতা, মনীষার স্নিগ্ধতা, বুকের প্রশস্তি ও আল্লাহর রহমত, ইনসাফ, ইলম ও হিকমতের প্রতি অন্তরের প্রশান্তি। আর আল্লাহ তাআলাই হলেন সকল ওয়াসওয়াসা ও হৃদয়ে উত্থিত কু-ধারণা থেকে আশ্রয় নেয়ার একমাত্র পাত্র। ভাগ্য-বিষয়ক আকীদার প্রতি বিশ্বাস মানুষের বাস্তবজীবনে ও এই পৃথিবী পৃষ্ঠে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। এর বিপরীতে যেসব সমাজ এ আকীদার প্রতি বিশ্বাস ছেড়ে দিয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলা এবং তিনিই যে জীবন-জগৎ-সৃষ্টিজীব সবার একমাত্র নিয়ন্ত্রক, ব্যবস্থাপক- এ বিশ্বাস থেকে যারা বিচ্যুত হয়েছে পরকালে তাদের ভাগ্যে আছে মর্মক্লদ আজাব, আর দুনিয়াতে তাদের জন্য নির্ধারিত থাকে বঞ্চনা, স্নায়ুর অবনতি, রোজগারে অভাব-অনটন ও জীবনযাপন তেতো হয়ে যাওয়া। এ দিকে ইঙ্গিত করেই আল-কোরানে এসেছে,

أَعْرَضَ وَمَنْ يَشَقَىٰ وَلَا يَضِلُّ فَلَا هُدَايَ اتَّبَعَ فَمَنْ هُدَىٰ مِنِّي يَأْتِيَنَّكُمْ فَأَمَّا
أَعْمَى الْقِيَامَةِ يَوْمَ وَنَحْشُرُهُ ضَنْكًا مَعِيشَةً لَهُ فَإِنْ ذَكَرِي عَنْ

অতঃপর যখন তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হিদায়েত আসবে, তখন যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুর্ভাগ্যও হবে না। আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ

ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে নিশ্চয় এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়’ - (সূরা তাহা, ১২৩-১২৪)।

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৫৪ : ভাগ্যের প্রতি ঈমান, উপায় অবলম্বন নিষিদ্ধ করে না

ভাগ্যের প্রতি ঈমান, উপায় অবলম্বনকে নিষিদ্ধ করে না

মনে রাখা আবশ্যিক যে ইসলামী শরীয়ত, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করার নির্দেশের পাশাপাশি কার্যকারণ ও উপায় অবলম্বনের ব্যাপারেও আমাদের নির্দেশ দিয়েছে। অর্থাৎ এ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহর হাতেই সব কিছুর মালিকানা এবং যত কার্যকারণ ও উপায় আছে তা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আদৌ কোনো ফলাফল বয়ে আনার ক্ষমতা রাখে না; কেননা যিনি কার্যকারণ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তার পরিণতি ও ফলাফল সৃষ্টি করেন। অতএব যদি কেউ সং বংশধর চায়, তা হলে তার উচিত এ ক্ষেত্রের সুনির্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করা- বৈধভাবে বিবাহ করা। তবে এই বিবাহ ফল উৎপাদন করতেও পারে, আবার নাও করতে পারে, কারণ তা মহাশক্তিধর, প্রজ্ঞাময়, সকল বিষয়ে সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। ইরশাদ হয়েছে

لِمَنْ يَهَبُ ،
وَإِنَّا ذُكِّرْنَا يُزَوِّجُهُمْ أَوْ . الذُّكُورَ يَشَاءُ لِمَنْ وَيَهَبُ إِنَّا يَشَاءُ
قَدِيرٌ عَلِيمٌ إِنَّهُ عَقِيمًا يَشَاءُ مَنْ وَيَجْعَلُ

‘তিনি যাকে

ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন আর যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন। তিনি তো সর্বশক্তিমান’ - (সূরা

আশুরা, ৪৯)

এ কারণেই কোনো উপায় অবলম্বন না করা মুসলমানের পক্ষে হারাম। আর তাই, যদি কেউ রিমিকের জন্য দৌড়ঝাঁপ পরিত্যাগ করে বসে থাকে তবে সে গুনাহগার বলে বিবেচিত হবে, যদিও রিমিক একমাত্র আল্লাহর হাতে। বৈধ কার্যকারণ ও উপায় তাকদিরেরই একটি অংশ, বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই স্পষ্ট করেছেন। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করে বলা হলো- ‘আমরা যে ঝাড়ফুকের আশ্রয় নিই, আত্মরক্ষার জন্য কোনো অবলম্বন ধরি, ওষুধপত্র ব্যবহার করি, এগুলো কি আল্লাহ-নির্ধারিত ভাগ্যের কোনো কিছু রদ করে দেয়?’ তিনি বললেন, ‘এগুলো আল্লাহ-নির্ধারিত ভাগ্যের মধ্যেই শামিল।’ [بهاء، نتقي وتقي بها، نسترق رقي أريت]
من هي : فقال شيئا؟ الله قدر من ترد هي بها، ننداوى وأدوية
الله قدر (যাদুল মাদাদ: ৩/৬৬)] তবে এ ক্ষেত্রে যে বিষয়ে সর্বক থাকতে হবে, তা হলো কার্যকারণ ও হেতুর নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ ফলাফল সংঘটিত করার ক্ষেত্রে হেতুর কোনো দখল নেই। যদি কেউ মনে করে যে সুনির্দিষ্ট ফলাফল বয়ে আনার ক্ষেত্রে কার্যকারণ ও হেতুর প্রভাবী ক্ষমতা আছে, তবে তা শিরক বলে গণ্য হবে। এর বিপরীতে যদি কেউ কার্যকারণের প্রতি আদৌ ভ্রক্ষেপ না করে, শরীয়ত-অনুমোদিত সকল কার্যকারণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে এটা হবে শরীয়তের প্রতি নিন্দাঙ্গাপন। [দেখুন ইবনে তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া ৮/৫২৮] এ কারণেই রোগব্যাদি হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওষুধ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন।

উসামা বিন শারীক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম। সে সময় সাহাবীগণ ((রাযি.)) এমনভাবে বসা ছিলেন যে, তাদের মাথায় যেন পাখি বসা। আমি সালাম দিয়ে বসে পড়লাম। বৈদুইনরা এদিক-সেদিক থেকে এল। তারা বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল, ওষুধ ব্যবহার সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, ওষুধ ব্যবহার করো; কারণ আল্লাহ তাআলা এমন কোনো

ব্যাধি সৃষ্টি করেননি, যার জন্য তিনি ওষুধ সৃষ্টি করেননি। তবে একটি ব্যাধি ছাড়া-
অর্থাৎ বার্ধক্য।’ [তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়িও ইবনে মাজাহ। তিরমিযি বলেছেন,
হাদিসটি হাসান-সহিহ- দেখুন মুখতাসারু আবি দাউদ পৃ.৩৪৬] বুখারি ও মুসলিমে
এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘ আল্লাহ তাআলা সকল
রোগের জন্যই প্রতিষেধক নামিল করেছেন।’ [- أنزل الله أنزل ما -
 (দেখুন বুখারি, কিতাবুত্তিব) شفاء له] এর ওপর ভিত্তি করেই ফকীহগণ ওষুধ ব্যবহার
করা মুস্তাহাব বলেছেন, বরং তাদের কেউ কেউ ওয়াজিব বলেছেন।

‘আকীদায়ে তাহাবিয়া’র ব্যাখ্যাকার বলেন, মানুষের মধ্যে কেউ কেউ ভাবে যে, উপার্জন
করা এবং আসবাব-কার্যকারণ ব্যবহার করা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করার সঙ্গে
সাংঘর্ষিক। তাদের দাবি হলো যে, সব কিছু যেহেতু তাকদিরে লেখা, অতএব আসবাব-
কার্যকারণ অবলম্বনের কোনো প্রয়োজন নেই। তাদের এ কথা ভিত্তিহীন, কেননা উপার্জনের
বিভিন্ন ধরন রয়েছে, যেমন- ফরজ, মুস্তাহাব, জায়েয, মাকরুহ ও হারাম। আর
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওয়াক্কুলকারীদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ছিলেন। অথচ
তিনি যুদ্ধের বর্ম পরিধান করতেন, তিনি উপার্জনের উদ্দেশে হাটবাজারে যেতেন। [শারহুল
আকীদা আত-তাহাবিয়াহ পৃ.২০১]

ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস ও কার্যকারণ অবলম্বন, এ দুটোর মধ্যে সম্পর্কটা সাহাবায়ে কেরাম
এভাবেই বুঝেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, সতর্কতা অবলম্বন করে ধীরে চলা ভাগ্যের
প্রতি ঈমানেরই একটি অংশ। ভাগ্যের সঙ্গে এর কোনো বিরোধ নেই। বরং তা ভাগ্যের প্রতি
ঈমানেরই দাবি। সহিহ বুখারিতে উমর (রাযি.) সম্পর্কে একটি বর্ণনা এভাবে এসেছে যে,
তিনি যখন শাম এলাকায় যান, বিভিন্ন শহরের নেতৃবর্গ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শাম
দেশে মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে বলে তারা তাঁকে সংবাদ দেন। তিনি মুহাজের ও আনসার
সাহাবীদের ((রাযি.)) সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করেন। এরপর কুরাইশ নেতাদের সঙ্গে
পরামর্শ করেন। কুরাইশ নেতারা ফিরে চলে যাওয়া এবং মহামারী থেকে দূরে যাওয়ার
ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। অতঃপর উমর (রাযি.) ফিরে যাওয়ার নির্দেশ জারি
করেন। এ সময় আবু উবায়দা (রাযি.) বললেন, এটা ভাগ্য থেকে পালিয়ে যাওয়া নয়,
কারণ - একটু চিন্তা করে দেখুন- যদি আপনার এক পাল উট থাকে আর তারা একটি
উপত্যকায় নেমে যায় যার দুটি প্রান্তর রয়েছে, একটি উর্বর, অপরটি বন্ধ্যা, এমতাবস্থায়
যদি আপনি উর্বর প্রান্তরে উটগুলো চড়ান তবে তা আল্লাহ নির্ধারিত তাকদির অনুযায়ীই
হবে, আর যদি বন্ধ্যা প্রান্তরে চড়ান তবে সেটাও আল্লাহ নির্ধারিত তাকদির অনুযায়ী-ই
হবে। [ফাতহুল বারী ১/১৫, ১৫১, ৫৫৭, ৮৫৫] এ করণেই উমর (রাযি.) ওই লোকদের
অবস্থা দেখে কেঁদে ফেলেছেন যারা খরচাপাতি সঙ্গে না নিয়েই ইয়ামেন থেকে হজ্ব করতে
চলে এসেছিল। তিনি তাদের এর জন্য শাসান।

মুয়াবিয়া বিন কুররা বলেন, উমর (রাযি.) ইয়েমেনবাসী কিছু লোককে দেখতে পেলেন।
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কারা? তারা বললেন, আমরা তাওয়াক্কুলকারী। তিনি
বললেন, বরং তোমরা ধ্বংসশীল, কারণ তাওয়াক্কুলকারী জমিনে বীজ বপন করে, এরপর
আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে।’ [জামেউল উলুমি ওয়াল হিকাম পৃ.২৮৪]

ইবনুল কাইয়েম আল জাওযিয়া (র.) বলেন, ‘তাওহিদের হাকীকত বাস্তবায়িত হয় না
যদি না আল্লাহ তাআলা কর্তৃক স্থাপনকৃত কার্যকারণের সম্পূর্ণতা অবলম্বন করা হয়। এসব
কার্যকারণ বাতিল করে দেওয়া খোদ তাওয়াক্কুলকেই আহত করে; কেননা কার্যকারণ ছেড়ে
দেয়া এমন এক অপারগতা যা তাওয়াক্কুলকেই নস্যাত করে দেয়; কারণ তাওয়াক্কুলের
হাকীকত হলো বান্দার দ্বীন ও দুনিয়ায় যা-কিছু উপকারী তা লাভের জন্য এবং যা-কিছু

ঋতিকর তা থেকে দূরে থাকার জন্য আল্লাহর ওপর অন্তর দিয়ে ভরসা রাখা। এই ভরসার সঙ্গে কার্যকারণের সম্পৃক্ততা অবলম্বনও জরুরি। অন্যথায় তা হিকমত ও শরীয়ত উভয়টিকে বাতিলকারী বলে পরিগণিত হবে। অতএব বান্দা তার অপরাগতাকে তাওয়াঙ্কুল বানাবে না, না বানাবে তার তাওয়াঙ্কুলকে অপরাগতা...। [যাদুল মাআদ ২/১৭]

সাহল ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি দৌড়ঝাঁপের নিন্দা করল, সে সুনগতের নিন্দা করল। আর যে তাওয়াঙ্কুলকে নিন্দা করল সে ঈমানকেই নিন্দা করল। অতঃপর তাওয়াঙ্কুল হলো নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা, আর উপার্জন করা হলো নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত। অতএব যে ব্যক্তি তাঁর অবস্থার অনুসরণ করল সে যেন কখনো তাঁর সুন্নতকে পরিত্যাগ না করে।

ঈমানের হাকিকত

এগুলোই হলো ঈমানের বিষয়বস্তু যার প্রতি বিশ্বাস রাখা প্রতিটি মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু এসব বিষয়ের প্রতি ঈমানের আকার-প্রকৃতি কী? ঈমান পরিভাষার প্রয়োগ কোন-কোন বিষয়ের ওপর হয়ে থাকে? আসুন এবার এ বিষয়গুলো অধ্যয়ন করে দেখি- এ বিষয়ে আলেমদের দুটি অভিমত রয়েছে,

প্রথম অভিমত : ঈমান হলো এমন একটি অভিধা, যা মুখে স্বীকার করা, অন্তরে বিশ্বাস করা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল করাকে বুঝায়। এটিই অধিকাংশ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত অনুসারীদের অভিমত।

দ্বিতীয় অভিমত : মুখের স্বীকারোক্তি ও অন্তরের বিশ্বাসকেই ঈমান বলা হয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা আমল করা ঈমানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনায় দ্বীন ও শরীয়ত ও বয়ান-বিশ্লেষণ হিসেবে যা-কিছু এসেছে সে অনুযায়ী আমল করা মুমিনদের অবশ্য কর্তব্য, যারা মৌখিক স্বীকারোক্তি ও অন্তরের বিশ্বাসের কারণে ‘মুমিন’ খেতাবে ভূষিত হওয়ার যোগ্য হয়েছে। যদিও কোরান সুন্নাহর দলিল-প্রমাণ প্রথম অভিমতের পক্ষেই অধিক পরিষ্কার, এবং দ্বিতীয় অভিমতের চেয়ে অধিক মজবুত, [প্রথম অভিমতটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হওয়া বিষয়ে আরও অধ্যয়নের জন্য দেখুন: ইমাম নববী প্রণীত সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ] তবুও উভয় পক্ষই নিজ-নিজ অভিমত বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। তবে বলা যায় যে, বিষয়টি মূলত তাত্ত্বিক মতানৈক্যজাত, প্রায়োগিক জীবনে এর কোনো প্রভাব-প্রতিফলন নেই বললেই চলে। যদিও এ বিষয়ের তাত্ত্বিক মতানৈক্য অন্য আরও কিছু তাত্ত্বিক মতানৈক্যের জন্ম দেয়।

‘আকীদায়ে তাহাবিয়া’র ব্যাখ্যাকার বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র.) ও অন্যান্য আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের ইমামদের মধ্যে যে মতানৈক্যটি রয়েছে, তা একটি বাহ্যিক মতানৈক্য; কারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলকে অন্তরে-থাকা ঈমানের আবশ্যিক দাবি হিসেবে গণ্য করা অথবা ঈমানের অংশ হিসেবে গণ্য করা কেবলই একটি শাস্তিক বিতর্ক। বিশেষ করে এ ব্যাপারে উভয় পক্ষ একমত হওয়ার পর যে, কবীরা গুনাহকারী ঈমান থেকে সমূলে বের হয়ে যায় না, বরং তার বিষয়টি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন থাকে, তিনি যদি চান তাকে শাস্তি দেবেন অথবা যদি চান তাকে ক্ষমা করে দেবেন। অতএব এ বিতর্কের ফলাফল হিসেবে কোনো পক্ষেরই ঈমান-আকীদা বাতিল বা অশুদ্ধ বলে প্রতিপন্ন হয় না।’ [يقول

حنيفة ي أب بين الذي والإختلاف : الطحاوية العقيدة شرح صاحب أعمال كون فإن صوري، اختلاف السنة، أهل من الباقيين والأئمة الاتفاق مع الإيمان من جزء أو القلب لإيمان لازمة الجوارح مشيئة في هو بل الإيمان، من يخرج لا الكبيرة مرتكب أن على عليه يترتب لا لفظي نزاع عنه، عفا شاء وإن عذبه شاء إن الله ، [شارহুল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ) اعتقاد فساد]

এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল উভয় পক্ষের কাছেই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তারা এর স্বরূপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতানৈক্য করেছেন- অর্থাৎ তা কি ঈমানের অংশ, না ঈমানের চাহিদা ও আবশ্যিক দাবি। যারা আমলকে ঈমানের অংশ বলেছেন, তারাও কিন্তু আমলকে, মৌখিক স্বীকারোক্তি ও অন্তরের বিশ্বাস, এ দুটোর সমান্তরাল রেখায় দাঁড় করাননি। অর্থাৎ তারা বলেছেন যে, মৌখিক স্বীকারোক্তি ও অন্তরের বিশ্বাস যদি না থাকে তাহলে ঈমান বিষয়টি সমূলেই নস্যাৎ হয়ে যায়, কিন্তু যদি শুধু

আমল না থাকে তাহলে সমূলে ঈমান নস্যাত হয় না। আর যারা আমলকে ঈমানের অংশ হিসেবে সাব্যস্ত করেন না, তারাও বলেন যে, আমল করা ওয়াজিব; কেননা আমল হলো ঈমানের এক আবশ্যিক দাবি। যদি তাই হয়, তাহলে বিষয়টি নিয়ে অধিক ঘাটাঘাটি করায় কোনো ফায়দা আছে বলে আমার মনে হয় না। এর চেয়ে বরং উপকারী অন্য বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা ভালো। তবে উভয় পক্ষ আলোচ্য বিষয়ের যে অংশটুকুতে একমত, তা থেকে উৎকলিত কিছু মানদণ্ড এখানে উপস্থাপন করা যায়, যার মাধ্যমে যাচাই করে নেয়া সম্ভব হবে কারা কারা ঈমান অভিধার আওতাভুক্ত হয় এবং কারা কারা বাদ পড়ে, ১ - উভয় পক্ষ এ ব্যাপারে একমত যে, যারা কেবল মৌখিকভাবে প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি দিল, কিন্তু অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করল না, তারা ঈমানের বলয়ে প্রবেশ করল না। তারা বরং মুনাফেক, আল্লাহ তাআলা যাদের প্রকাশ্যে অস্বীকারকীদের চেয়েও অধিক শাস্তি দেবেন জাহান্নামের তলদেশে। [নববী প্রণীত সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ১/১৪৭]

২ - উভয় পক্ষ এ ব্যাপারে একমত যে, শুধু অন্তর দিয়ে জানা ঈমান অভিধার প্রয়োগের জন্য যথেষ্ট নয়, বরং অন্তর দিয়ে জানা ও বিশ্বাস করার পাশাপাশি মৌখিক স্বীকারোক্তিরও আবশ্যিকতা রয়েছে; কারণ মুসা ও হারুন (আলাইহিসালাম) -এর সত্যবাদিতা ফেরআউন ও তার দল অন্তর দিয়ে জানত। কিন্তু তবুও তারা কাফের ছিল, মুমিন খেতাবে ভূষিত হয়নি। মুসা আলাইহিসালাম ফেরআউনকে যা বলেছিলেন, তা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

بِمَآئِرِ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ رَبُّ لَا هَؤُلَاءِ أُنْزِلَ مَا عَلِمْتُ لَقَدْ قَالَ

‘সে বলল, তুমি জান যে, এসব বিষয় কেবল আসমানসমূহ ও জমিনের রবই নাজিল করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে’ - (সূরা আল ইসরা, ১০২)।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

عَاقِبَةُ كَانَ كَيْفَ فَاَنْظُرْ وَغُلُّوا ظُلُمًا اَنْفُسَهُمْ وَاسْتَيْقَنَتْهَا بِهَا وَجَحَدُوا الْمُفْسِدِينَ

‘আর

তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করল। অথচ তাদের অন্তর তা নিশ্চিত বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখ, ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল’ - (সূরা আন-নামল, ১৪)।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাললাম যে সত্য নবি ছিলেন, তা কিতাবীরা অন্তর থেকে জানত, কিন্তু তাঁর প্রতি তারা ঈমান আনেনি। ইরশাদ হয়েছে,

خَسِرُوا الَّذِينَ اَبْنَاءُهُمْ يَعْرِفُونَ كَمَا يَعْرِفُونَهُ الْكِتَابَ اَتَيْنَاهُمُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ لَا فَهُمْ اَنْفُسَهُمْ

‘যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে চিনে যে রূপ চিনে তাদের ছেলে-সন্তানদেরকে। যারা নিজদের ক্ষতি করেছে তারা ঈমান আনবে না’ - (সূরা আল আনআম, ২০)।

বরং ইবলীস তার রব সম্পর্কে বড় জাননেওয়ালা ছিল, তথাপি সে সকল কাফেরদের ঈমান হয়েছে। [দেখুন আবুল কাসেম ইবনে সালাম, কিতাবুল ঈমান পৃ.১০২; শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ পৃ.৩৭২-৩৭৪] আহলে সুন্নত এ ব্যাপারেও একমত যে, যে-মুমিনকে আহলে কিবলা বলে আখ্যায়িত করা শুদ্ধ, সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না। আহলে কিবলা বলতে এমন মুমিনকে বুঝায় যে সকল সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়ে অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং মুখে শাহাদাতাইন উচ্চারণ করেছে। যদি কেউ এ উভয়টি না করে তবে সে আহলে কিবলা বলে গণ্য হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। হ্যাঁ,

যদি জিহবায় কোনো সমস্যা থাকার কারণে, অথবা উচ্চারণ করার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অথবা কোনো জবরদস্তিমূলক পরিস্থিতিতে উচ্চারণ করতে অক্ষম হয়, তাহলে অন্য কথা। [নববী প্রণীত সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ১/১৪৯]

আহলে সুন্নত এ ব্যাপারেও একমত যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের কাছে কথা ও কাজ উভয়টিই দাবি করেন। কথার দ্বারা উদ্দেশ্য অন্তরের কথা, আর তা হলো অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা, সত্য বলে জানা, কথার দ্বারা আরেকটি উদ্দেশ্য হলো মুখের কথা, অর্থাৎ মৌখিক স্বীকারোক্তি দেয়া। এ ক্ষেত্রে আহলে সুন্নতের আলেমগণ যে ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন, তা হলো-সকল কথা ও সকল কাজই কি ঈমান অভিধার মধ্যে প্রবিষ্ট, না কি কিছু কথা ও কাজ প্রবিষ্ট আর কিছু কথা ও কাজ ঈমান অভিধার বাইরে অবস্থিত? তাদের মধ্যে একপক্ষ সকল কথা ও সকল কাজ ঈমান অভিধায় প্রবিষ্ট করেছেন, আবার অন্যপক্ষ কিছু প্রবিষ্ট করেছেন আর অবশিষ্টগুলো ঈমানের দাবি ও ফলাফলের আওতাভুক্ত করেছেন।

[শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ পৃ.২৭৯] আহলে সুন্নত এ ব্যাপারেও একমত যে, যদি কোনো ব্যক্তি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করল এবং মুখে স্বীকারও করল, কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা আমল করা থেকে বিরত থাকল, তবে এরূপ ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবাদ্য বলে পরিগণিত হলো। সে, আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাদীসে যেসব শাস্তির ব্যাপারে হুঁশিয়ার করেছেন, তা ভোগ করার উপযোগী বলে গণ্য হলো। [শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ পৃ.৩৭৪]

আহলে সুন্নত এ ব্যাপারেও একমত যে, কবীরাগুনাহকারী যতক্ষণ না সে গুনাহকে হালাল মনে না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কাফের বলে পরিগণিত হবে না। যদিও সে গুনাহ থেকে তাওবার পূর্বেই মারা যায়। অধিকাংশ আহলে সুন্নত যদিও আমলকে ঈমানের অংশ হিসেবে বিবেচনা করেন, তবুও তারা অন্তর দিয়ে বিশ্বাসী ও জিহবা দিয়ে স্বীকারকারী ব্যক্তিকে, আমলহীন হলেও, কাফের বলেননি। আর হানাফী মায়হাব যদিও আমলকে ঈমানের বাইরে মনে করে, তবে তা আমলকে ঈমানের দাবি ও তাকাযা হিসাবে বিশ্বাস করে এবং আমল তরককারীকে কাফের না বলার ওপর একমত পোষণ করে। [প্রাগুক্ত পৃ.৩৭৫]

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত এ ব্যাপারেও একমত যে, অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকারোক্তি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল-কেন্দ্রিক ঈমানের যে সংজ্ঞা ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি তা আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া, জান্নাত লাভ করা ও জাহান্নামে চিরস্থায়ী না হওয়ার জন্য যা প্রয়োজন তার নিরিখে। তবে দুনিয়ার হুকুএ আহকাম আরোপিত হওয়ার জন্য যতটুকু যথেষ্ট, তা হলো শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি ও শাহাদাতাইন উচ্চারণ করা। অতঃপর যে ব্যক্তি শাহাদাতাইন উচ্চারণ করবে, তার ওপর সকল বিধিবিধান আরোপ করা হবে। তাকে শাহাদাতাইনের দাবি অনুযায়ী চলার নির্দেশ দেয়া হবে। শাহাদাতাইন উচ্চারণের ফলে ব্যক্তি যেসব অধিকার পায় তা তাকে দেয়া হবে এবং তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কাফের বলা হবে না যতক্ষণ না সে কোনো কথা ও কাজের মাধ্যমে শাহাদাতাইনকে নস্যাত করে দেয়। [ফাতহুল বারী ১/৩৯-৪০] উল্লিখিত মূলনীতিটি আমরা উসামা ইবনে যায়েদের ((রাযি.)) একটি বর্ণনা থেকে পাই।

উসামা ইবনে যায়েদ (রাযি.) বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের এক অভিযানে প্রেরণ করলেন। আমরা জুহাইনা গোত্রে গিয়ে সকাল করলাম। অতঃপর এক লোককে আমি সামনে পেয়ে গেলাম। লোকটি বলল, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। লোকটিকে আমি আক্রমণ করলাম। বিষয়টি আমার মনের মধ্যে রেখাপাত করল। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি ঘটনার বৃত্তান্ত শোনালাম। তিনি বললেন, ‘সে লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহ বলল আর তুমি তাকে মেরে ফেললে?’ বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, সে তো তা অস্ত্রের ভয়ে করেছে।’ তিনি বললেন, ‘তুমি যদি তার অন্তর বিদীর্ণ করে জানতে সে মন থেকে বলেছে কিনা?’ তিনি কথাটি এতবার বললেন যে আমি কামনা করতে লাগলাম, যদি আমি ওই দিনই মুসলমান হতাম।’ [মুসলিম, আস-সহিহ (নববীর ব্যাখ্যাসহ) ২/৯৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা- ‘তুমি যদি তার অন্তর বিদীর্ণ করে জানতে সে মন থেকে বলেছে কিনা’ - এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষের বাহ্যিক আমল গ্রহণ করে নেয়াই আমাদের দায়িত্ব; কেননা যা অন্তরে থাকে তা জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি

ঈমান অভিধাটি কি কি বিষয় শামিল করে, এ ক্ষেত্রে মতানৈক্যের কারণে অন্য আরেকটি বিষয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে, আর তা হলো ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি। অতএব যারা আমলকে ঈমান অভিধার অন্তর্ভুক্ত করেন, তারা ঈমান বাড়ি-কমে বলে অভিমত দিয়েছেন। আর যারা ঈমান অভিধা মৌখিক স্বীকারোক্তি ও অন্তরের বিশ্বাসের বলয়ে সীমিত করেছেন, তারা ঈমান বাড়ি-কমার বিপক্ষে অভিমত দিয়েছেন। যেহেতু আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি যে, এ বিষয়ের বিতর্কটি কেবলই শাস্তিক ও তত্ত্বকেন্দ্রিক বিতর্ক, প্রায়োগিক জীবনে যার কোনো প্রভাব নেই। অনুরূপভাবে বর্তমান আলোচ্য বিষয়টির একই অবস্থা। আর তা এভাবে যে, যারা ঈমানকে একটি স্থির জিনিস বলে ভাবেন, যা বাড়িও না কমেও না, তারা বলেন যে তাকওয়া ও নেক-আমল একজনকে অন্যজনের ওপর মর্যাদাবান করে দেয়। আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে প্রতিদান লাভের ক্ষেত্রেও মানুষের মধ্যে পরস্পরে পার্থক্য থাকবে।

ইমাম তাহাবী আকীদায়ে তাহাবিয়াতে বলেন, ‘ঈমান হলো এক এবং ঈমানওয়ালারা মৌলিক ঈমানের বিচারে সবাই সমান। অবশ্য তাকওয়া, ভয়, প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে দূরে থাকা এবং যা উত্তম তা আঁকড়ে ধরে থাকার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে একজন অন্যজনের চেয়ে মর্যাদায় উত্তম।’ [শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ পৃ.৩৭৫] তবে যাই হোক, আল-কোরানের বহু আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেশ কিছু হাদিস ঈমান বাড়ি-কমার পক্ষেই সাক্ষ্য বহন করে। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী,

عَلَيْهِمْ ثَلِيثٌ وَإِذَا قُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ لِلَّهِ ذُكِرَ إِذَا الَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا يَتَوَكَّلُونَ رَبَّهُمْ وَعَلَىٰ إِيْمَانًا زَادَتْهُمْ آيَاتُهُ

‘মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের

উপরই ভরসা করে’ - (সূরা আল আনফাল, ২)।

فَزَادَهُمْ فَاحْشَوْهُمْ لَكُمْ جَمَعُوا قَدْ النَّاسَ إِنَّ النَّاسَ لَهُمْ قَالَ الَّذِينَ الْوَكِيلُ وَنِعْمَ اللَّهُ حَسْبُنَا وَقَالُوا إِيْمَانًا

‘যাদেরকে মানুষেরা বলেছিল যে, ‘নিশ্চয় লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে একত্র হয়েছে।

সুতরাং তাদেরকে ভয় কর’। কিন্তু তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা

বলেছিল, ‘আল্লাহই আমাদের জন্য

যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক’! - (সূরা আল আনফাল, ১৭৩)।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন , السَّكِينَةَ أَنْزَلَ الَّذِي هُوَ جُنُودٌ وَلِلَّهِ إِيْمَانِهِمْ مَعَ إِيْمَانًا لِيَزِدَادُوا الْمُؤْمِنِينَ قُلُوبٍ فِي حَكِيمًا غَلِيْمًا اللَّهُ وَكَانَ لِأَرْضَا وَالسَّمَاوَاتِ

‘তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাজিল করেছিলেন যেন তাদের ঈমানের সঙ্গে ঈমান বৃদ্ধি পায়।’ - (সূরা আল ফাতহ, ৪)। ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির অর্থসংবলিত কয়েকটি হাদিস হলো নিম্নরূপ, ‘ঈমানের

সত্ত্বের অধিক শাখা আছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চটি হলো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং সর্বনিম্নটি হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক ময়লা সরিয়ে দেয়া। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।’

[বুখারি, আস-সহিহ

১/৪৪; মুসলিম, আস-সহিহ ১/৬]

তিনি আরও বলেন, ‘মুমিনদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানওয়ালা সে, যে চরিত্রে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম।’ [তিরমিযি; হাকেম। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি বুখারি ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহিহ। তিরমিযি বলেছেন, হাদিসটি হাসান। দেখুন আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ৩/৪০৩] অন্য এক হাদিসে এসেছে, ‘তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কোনো খারাপ কাজ দেখে, সে যেন তা হাত দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়, যদি না পারে তাহলে জিহবা দ্বারা, যদি না পারে তাহলে অন্তর দ্বারা, আর এটাই দুর্বলতম ঈমান।’ [মুসলিম, আস-সহিহ (নববীর ব্যাখ্যাসহ) ২/২৭]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আমার পূর্বে যে জাতির কাছে যে নবীই প্রেরিত হয়েছেন, সে জাতির মধ্য থেকে ওই নবির কিছু সঙ্গী-সাথী ছিল যারা তার আদর্শ ধরে চলত, যারা তার নির্দেশ অনুসরণ করত। অতঃপর তাদের পরে এমন উত্তরসূরি এসেছে যারা কথা অনুযায়ী কাজ করে না। আবার এমন কাজ করে যার নির্দেশ তাদের দেওয়া হয়নি। অতঃপর যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে হাত দ্বারা জিহাদ করবে সে মুমিন, যে জিহবা দ্বারা জিহাদ করবে সেও মুমিন, যে অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে সেও মুমিন, তবে এরপর সরিষা পরিমাণ ঈমানেরও অস্তিত্ব থাকে না।’ [মুসলিম, আস-সহিহ (নববীর ব্যাখ্যাসহ) ২/২৭] এ মর্মে সাহাবীগণেরও বিভিন্ন কথা রয়েছে। যেমন

আবুদদারদা (রাযি.) বলেন, ‘দ্বীন বিষয়ে কোনো ব্যক্তির জ্ঞানী হওয়ার একটি নিদর্শন হলো যে, সে তার ঈমানের পরিচর্যা করবে, ঈমানের কি হ্রাস পেল তা দেখবে। দ্বীন বিষয়ে কোনো ব্যক্তির জ্ঞানী হওয়ার একটি নিদর্শন হলো যে সে জানবে, তার ঈমান কি বাড়ছে, না কমছে।’ উমর (রাযি.) তাঁর সাথীদের বলতেন, ‘এসো আমরা ঈমান বাড়িয়ে নিই, অতঃপর তারা আল্লাহ তাআলার জিকির করতেন।’ আমলের কারণে এভাবে ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে আরও বহু হাদিস ও সাহাবীদের (রাযি.) কথা রয়েছে। [দেখুন শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ, পৃ: ৩৮৬] যেহেতু কোরান-সুন্নাহর টেক্সটসমূহের বাহ্যিক অর্থানুযায়ী ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি বুঝা যাচ্ছে, অতএব তা অবলম্বন করাই উত্তম। বিশেষ করে এ ক্ষেত্রে তাবিল করার আদৌ কোনো ফায়দা নেই। এ ব্যাপারে মতানৈক্যেরও কোনো ফলাফল নেই। তবে যে বিষয়টি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, একজন মুমিনের উচিত, তার ঈমানের পরিচর্যা করা, যত্ন নেয়া। হিসাব মিলিয়ে দেখা তার ঈমান কি বাড়ছে, না কমছে। যদি ঈমান কমে গেছে বলে মনে হয়, তাহলে কমে যাওয়ার কারণ কী তা খুঁটিয়ে দেখা এবং তা দূরস্ত করার উদ্যোগ নেয়া। যা করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়, সুশোভিত হয়, আত্মা পরিশুদ্ধ হয় তা করা, যেমনি করতেন সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

ইমান বৃদ্ধির কিছু কারণ

নিচে ঈমান বৃদ্ধির কিছু কারণ উল্লেখ করা হলো-

এক. ইলম : ইলম বা জ্ঞান বৃদ্ধি করা ইয়াকীন ও অন্তর্জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ। জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) ও ইবনে উমর (রাযি.) বলেন, 'আমরা ঈমান শিখেছি, কোরান শিখেছি অতঃপর আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে।' [দেখুন শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ ২/১৪১] আলোচ্য ক্ষেত্রে ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ সম্পর্কে ইলম। তাঁর নাম, গুণাবলি ও কর্ম সম্পর্কে ইলম। আল্লাহ তাআলার দিবসসমূহ সম্পর্কে ইলম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে ইলম। তিনি যে শরীয়ত, বিধান, জীবনপদ্ধতি নিয়ে এসেছেন সে সম্পর্কে ইলম। তাঁর ইবাদত আদায়-বিষয়ক সীরত, তাঁর জিহাদ ও আচরণ বিষয়ক সীরত ইত্যাদির ইলম। আল্লাহর কিতাবে ইলম এবং তাতে যেসব সংবাদ, উপমা-উদাহরণ, হিকমত ও ধৈর্য, সত্যমিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী বিষয়সমূহ ইত্যাদি সম্পর্কে ইলম। আর তা এ কারণে যে, ঈমান হলো আল্লাহর উলুহিয়াত এবং তিনি যেসব গুণে গুণান্বিত তা স্বীকার করে নেওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালত স্বীকার করে নেয়া, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা-কিছু নিয়ে এসেছেন তা মেনে নেয়া। এ সব বিষয়ে এজমালিভাবে ঈমান আনা, শাহাদাতাইন যার প্রতিনিধিত্বকারী। অতঃপর যে ব্যক্তি অন্তরে বিশ্বাস করে শাহাদাতাইন উচ্চারণ করবে, সে মূল ঈমান অর্জন করেছে বলে গণ্য হবে। তবে যে ব্যক্তি শাহাদাতাইন এর গভীর অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে, এর বিস্তারিত দাবি সম্পর্কে জানবে সে পূর্বোক্ত ব্যক্তির চেয়ে উত্তম ঈমানের অধিকারী হবে। অনুরূপভাবে মৃত্যুর পরে যা ঘটবে, যেমন ফেরেশতাদের প্রশ্ন, আজাব ও নেয়ামত ইত্যাদি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা সংবাদ দিয়েছেন, তা যে জানবে সে ওই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে যে কেবল সাক্ষ্য দেবে যে মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহর রাসূল। তদ্রূপ, যে ব্যক্তি আখেরাত সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করবে- যেমন পুনরুত্থান, হাশরের ময়দানে একত্র হওয়া, আল্লাহর সম্মুখে পেশ হওয়া, আমলনামা পড়া, হিসাব, কেয়ামতের ভীতি, হাউজ, পুল সিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি- সে ওই ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে যে কেবল এজমালিভাবে এসবের ওপর ঈমান এনেছে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরত এবং তাতে যে পূর্ণতা আছে তা জানবে, সে ওই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে যে কেবল, এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত জ্ঞান রাখে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

الْعُلَمَاءُ عِبَادِهِ مِنْ اللَّهِ يَخْشَى إِنَّمَا

‘বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে’ - (সূরা ফাতির, ২৮)।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, الَّذِينَ يَسْتَوِي هَلْ قُلُ
الْأَلْبَابِ أُولُو يَتَذَكَّرُ إِنَّمَا يَعْلَمُونَ لَا وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ

‘বল, ‘যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?’ বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে’ - (সূরা আয-যুমার, ৯)।

দুই. আমল : ইবাদত-বন্দেগী, নেক-কাজ ইত্যাদি বেশি-বেশি করলে ঈমান-ইয়াকীন বৃদ্ধি পায়। আর ইবাদত-বন্দেগী কমিয়ে দিয়ে প্রবৃত্তির খেয়ালখুশিমতো চলতে শুরু করলে, পাপ-গুনাহ করতে শুরু করলে ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। এমনকি অতিমাত্রায় যারা পাপ-গুনাহ

করে যায়, তাদের কেউ-কেউ- নিজেদের অস্বীকৃতি, পাপ-গুনাহ হালাল মনে করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অমান্য করার পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে, যার অর্থ হবে কুফরিতে প্রবেশ করা। আমলের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি হওয়ার কারণ, ঈমান হলো (আপনি ইতোপূর্বে যেভাবে জেনেছেন) আল্লাহর উলুহিয়াত স্বীকার করে নেয়া সকল ইবাদত ঐকান্তিকভাবে একমাত্র তাঁর জন্যেই নিবেদন করা। এই স্বীকারোক্তি মূলত দু-প্রকার। প্রথমটি বিশ্বাসের মাধ্যমে তাস্বিক স্বীকারোক্তি। আর দ্বিতীয়টি আনুগত্যের মাধ্যমে প্রায়োগিক স্বীকারোক্তি। সে হিসেবে, যে ব্যক্তি কেবল প্রথমটি নিয়েই ক্ষান্ত হলো, তার ঈমান অসম্পূর্ণই থেকে গেল। আর যে ব্যক্তি আনুগত্যের পথে এগুতে থাকল, সে যতটুকু অগ্রসর হলো, সেই অনুপাতে তার ঈমানও বৃদ্ধি করে চলল। অতএব ঈমানের পূর্ণতার জন্য উভয় প্রকার স্বীকারোক্তিই জরুরি।

তিন . জিকির ও ফিকির : জিকির ও ফিকিরের মাধ্যমেও ঈমান বৃদ্ধি পায়।

জিকির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- আল্লাহর গুণাবলি ও তাঁর আযমত-মহত্বের সঙ্গে যা সঙ্গতিপূর্ণ তার মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করা। তাঁর পবিত্র কালাম তিলাওয়াত করা; কেননা তা সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক সতেজ ও কায়েম রাখে। এর বিপরীতের যিকিরের স্বল্পতার অর্থ হলো অন্তরে বিস্মৃতি চলে আসা, আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যাওয়া। যিকিরের মাধ্যমে ঈমান বাড়ানোর জন্য উমর (রাযি.) তাঁর সাথীদের আহ্বান করতেন, এ কথা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

আবু জা'ফর র. তাঁর দাদা উমাইর ইবনে হাবীব (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন, 'ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। প্রশ্ন করা হয়েছে, তা কীভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি পায়? উত্তরে তিনি বলেছেন, 'আমরা যদি আল্লাহর জিকির করি, আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করি, তবে সেটাই হলো ঈমানে বৃদ্ধি পাওয়া। আর যদি উদাসীন হই, ভুলে যাই, তবে সেটাই হলো ঈমানের হ্রাস পাওয়া।'

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযি.) তাঁর সাথীদের কারও হাত ধরে নিয়ে যেতেন এবং বলতেন, চলো, কিছুক্ষণ আমরা ঈমান আনি, যিকিরের মজলিসে বসি। [শারহ কাসিদাতি ইবনিল কাইয়েম ২/১৪০-১৪১]

আর সর্বাবস্থায় জিকির করা মুমিনদের একটি গুণ বলে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

جُنُوبِهِمْ وَعَلَىٰ وَفُؤَادًا قِيَامًا ٱللَّهُ يَذْكُرُونَ ٱلَّذِينَ

'যারা আল্লাহকে স্মরণ করে- দাঁড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে এবং আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে' - (সূরা আলে ইমরান, ১৯১)।

ফিকির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিকর্ম, সৃষ্টিকূল নিয়ে চিন্তাভাবনা করা, তার নিদর্শন ও মুজিয়া নিয়ে ভাবা। এর দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ, আল্লাহর আযমত, কুদরত, গুণমাহাত্ম্য, কর্মমাহাত্ম্য অনুভব করা ঈমানের একটি অংশ। আর এই অনুভূতি আল্লাহর রাজত্ব নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে চিন্তাভাবনার ফল হিসেবে আসে। একটি উদাহরণ থেকে বিষয়টি আপনি আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবেন- কোনো জিনিস তৈরির ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি যদি অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করে থাকে আর ওই ব্যক্তির এ দক্ষতা সম্পর্কে আপনাকে অনেকেই সংবাদ দেয়, তাহলে ওই ব্যক্তির দক্ষতা সম্পর্কে আপনার অনুভূতি বহুগুণে বেড়ে যাবে, যদি আপনি তার তৈরিকৃত জিনিসের নমুনা নিজ চোখে দেখে

নিতে পারেন। আর যদি আপনি আরও কিছু নমুনা দেখতে সক্ষম হন, তাহলে তার দক্ষতা সম্পর্কে আপনার অনুভূতি নিঃসন্দেহে আরও বেড়ে যাবে। আর যদি আপনি তার তৈরিকৃত জিনিসগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, ডিজাইনের বিশ্লেষণসহ দেখার সুযোগ পান, তাহলে আপনার অনুভূতি আরও বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহর তাআলার গুণাবলি, তাঁর সুমহান কর্মসমূহ, এ মহাবিশ্বের পাতায় পাতায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত। তবে মানুষের মধ্যে অনেকেই আছে যারা অন্ধ ও বধির হয়ে চলে। তারা ভোগ-আহ্লাদের সীমানা পেরিয়ে স্রষ্টার নিদর্শন দেখতে পারে না। ওরা অবিশ্বাসী, ওরা দুর্বল ঈমানের অধিকারী। অপর পক্ষে মানুষের মধ্যে এমনও আছে যারা এ মহাবিশ্বে আল্লাহর আযমত ও বড়ত্বকে দেখে, আল্লাহর কুদরত-ক্ষমতা-ব্যবস্থাপনা-রাজত্ব দেখে, অতঃপর তাদের ইয়াকীনে যোগ করে নতুন মাত্রা বাড়িয়ে নেয় তাদের ঈমান। এদের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

‘ وَالْأَرْضُ السَّمَاءَاتِ خَلَقَ فِي وَيَتَفَكَّرُونَ

আর

তারা আকামশন্দলী ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে।’ - (সূরা আলে ইমরান, ১৯১)।

তিনি আরও বলেন,

إِذَا وَالَّذِينَ

وَعُمِّيَانَا صُمًّا عَلَيْهَا يَخْرُؤُوا لَمْ رَبُّهُمْ بِأَيَاتِ دُكُّرُوا

‘আর যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলে অন্ধ ও বধিরদের মত পড়ে থাকে না’ - (সূরা আল ফুরকান, ৭৩)।

পক্ষান্তরে যারা অন্ধ ও বধিরদের মতো পড়ে থাকে তাদের ব্যাপারে বলেছেন, مَثَلُهُمْ بَيْنُورِهِمْ اللَّهُ ذَهَبَ حَوْلَهُ مَا أَضَاءَتْ فَلَمَّا نَارًا اسْتَوْفَدَ الَّذِي كَمَثَلِ رُؤُونُ يُبْصِرُ لَا ظُلُمَاتٍ فِي وَتَرْكَهُمْ

‘তাদের উপমা ঐ ব্যক্তির মতো, যে আগুন জ্বালাল। এরপর যখন আগুন তার চারপাশ আলোকিত করল, আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিলেন এবং তাদেরকে ছেড়ে দিলেন অন্ধকারে। তারা কিছু দেখছে না’ - (সূরা আল বাকারা, ১৭)।

কাফের কখন মুমিন হয়

পেছনের প্রবন্ধগুলোয় আমরা জানতে পেরেছি, একজন মুমিন কি কি বিষয় স্বীকার করে নেবে, যা কখনো অস্বীকার করবে না। ঈমানের হাকিকত অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি ঈমান অভিধার ব্যাপ্তি কি এবং ঈমানের বিষয়বস্তুগুলো এর সঙ্গে কীভাবে যুক্ত হয়। আগত প্রবন্ধগুলোয় আমরা দেখাব কি কি বিষয় ঈমানকে নস্যাত করে দেয় এবং একজন ব্যক্তিকে মুমিনদের দল থেকে বের করে কাফেরদের দলভুক্ত করে ফেলে। তবে এ বিষয়টির বর্ণনা আলাদা একটি অধ্যায়ের দাবি করে যা পরবর্তী অধ্যায়ের মুখবন্ধ হিসেবে কাজ করবে। অর্থাৎ যেখানে ঈমান ও ইসলামের সীমানা নির্ধারণ করা হবে। যে সীমানার অভ্যন্তরে অবস্থানকারীকে মুমিন ও মুসলিম খেতাবে ভূষিত করা হবে। আর যে এর বাইরে অবস্থান করবে তাকে কাফের-ঈমানহারা বলে আখ্যায়িত করা হবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তার ওপর কাফের ব্যক্তি-বিষয়ক হুকুএ আহকাম বাস্তবায়িত করা হবে, যদি সে ঈমানের গন্ডিতে প্রবেশ না করেই কাফের অবস্থায়-ই মারা যায়। ভূমিকাতুল্য এ অধ্যায়টি এ জন্য প্রয়োজন যে, এর মাধ্যমে আমরা ঈমানের গন্ডি ও কুফরের গন্ডি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে পারব, যাতে পরবর্তী অধ্যায়ে, কি কি বিষয় একজন মানুষকে ঈমানের গন্ডি থেকে কুফরের গন্ডিতে নিয়ে যায়, বুঝা সহজ হয়ে যায়। অতএব এ পর্বটি দু-অধ্যায়ে বিভক্ত করা হলো, প্রথম অধ্যায়টি দ্বিতীয়টির মুখবন্ধস্বরূপ। অধ্যায় দুটি হলো, প্রথম অধ্যায়, একজন কাফের কখন মুমিন হয় (অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশের পদ্ধতি) দ্বিতীয় অধ্যায়, একজন মুমিন কখন কাফের হয় (অর্থাৎ ঈমান নস্যাতকারী বিষয়সমূহ) কাফের কখন মুমিন হয় বিগত পর্বে আমরা জানতে পেরেছি যে ঈমানের স্তম্ভসমূহের গুণান দু-পর্যায়ের, একটি অবিল্লিষ্ট বা এজমালি, আরেকটি বিল্লিষ্ট বা তাফসীলি। আবার প্রতিটি স্তম্ভেরই অবিল্লিষ্ট ও বিল্লিষ্ট আকার রয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি ঈমানের স্তম্ভসমূহ বিস্তারিতভাবে জানবে, তাতে বিশ্বাসপোষণ করবে এবং তার দাবি অনুযায়ী আমল করবে সে ওই লোকদের মধ্যে শামিল হবে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

هُمْ أُولَئِكَ
كَرِيمٌ وَرِزْقٌ وَمَغْفِرَةٌ رَبَّهُمْ عِنْدَ ذَرْجَاتٍ لَهُمْ حَقًّا وَهُمْ يَوْمِنُونَ الْم

‘তারাই প্রকৃত

মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট উচ্চ মর্যাদাসমূহ এবং ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয়ক’ - (সূরা আল আনফাল, ৪)।

তবে আল্লাহ তাআলার মহাপ্রজ্ঞা অনুযায়ী তিনি ঈমান গ্রহণের বিষয়টি বান্দাদের ওপর সহজ করে দিয়েছেন এবং অবিল্লিষ্ট আকারে ঈমান আনলেই - যার মধ্যে সংকোচিত আকারে বিস্তারিত ঈমানও প্রবিষ্ট রয়েছে- তিনি একজন মানুষকে মুমিন হিসেবে গণ্য করার ঘোষণা দিয়েছেন। অতঃপর তিনি একজন ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাথমিকভাবে যেটুকু ঈমান কবুল করে নেন, তা হলো জিহবা ও অন্তর দ্বারা এ কথা স্বীকার করে নেয়া যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই তার রব ও সত্য মাবুদ। তিনি ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই, ইলাহ নেই। এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা-কিছু নিয়ে এসেছেন তার সবই সত্য এবং তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। তিনি এই অবিল্লিষ্ট ঈমানের একটা শিরোনাম দিয়েছেন। আর তা হলো কালেমায়ে তাইয়েবা- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। অতএব যে ব্যক্তি এ কালেমা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবে এবং তা অন্তর দিয়ে সত্য বলে জানবে, এর পাশাপাশি ওইসব কাজ, কথা ও বিশ্বাস পরিত্যাগ

করবে যা তার উক্ত স্বীকারোক্তি নস্যাৎ করে দেয়, তবে সে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ এবং কুফরি পরিত্যাগ করেছে বলে ধরা হবে।

[প্রশ্ন হতে পারে- সহিহ হাদীসে ঈমানের স্তম্ভসমূহের যে বর্ণনা এসেছে, তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান ছাড়াও অন্যান্য বিষয়কে শামিল করে। তাহলে শুধু শাহাদাতাইন দ্বারা কীভাবে ঈমানের বলয়ে প্রবেশ করা সম্ভব হবে? এর জবাব হলো- ঈমান মূলত দু-প্রকার। ঈমানে মুজমাল ও ঈমানে মুফাস্সাল। ঈমানে মুজমাল হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যা-কিছু এসেছে তার প্রতি ঈমান- তিনি কি কি নিয়ে এসেছেন সে ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু না বলেই। সে হিসেবে একজন বান্দা যখন এ সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহর ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর রাসূল, তখন সে প্রকারান্তরে, মুহাম্মাদ (সা.) যা-কিছু নিয়ে এসেছেন, ঈমান ও ইসলামের স্তম্ভ হিসেবে যা-কিছু তিনি বলেছেন, সব কিছুকেই সত্য বলে জানার ঘোষণা দেয়, যদিও সে তা বিস্তারিতভাবে জানেনা; কেননা সে যে-শাহাদাতাইনের ঘোষণা দিয়েছে, তার দাবি হলো- যখন তার কাছে এমন কোনো বিষয় পৌঁছবে যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ে এসেছেন তখন সে সঙ্গে সঙ্গে তা সত্য বলে মেনে নেবে, তার প্রতি ঈমান আনবে। আর যে ব্যক্তির কাছে ইতোমধ্যেই সব কিছু বিস্তারিতভাবে পৌঁছেছে, অতঃপর সে তার প্রতি ঈমান এনেছে, এবং সে অনুযায়ী আমল করে যাচ্ছে এ ব্যক্তি অবশ্যই অধিক শক্তিশালী ঈমানওয়ালা এবং আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাবান বলে বিবেচিত। আর যদি এমন হয় যে, কোনো ব্যক্তি ঈমানে মুজমাল ঘোষণা করল ঠিকই, কিন্তু যখন তার কাছে এমন কোনো বিষয় এল, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ে এসেছেন, তখন সে তা প্রত্যখ্যান করল, তা হলে সে শাহাদাতাইনের দাবির বিরুদ্ধে গেল, অতঃপর মুরতাদ হয়ে গেল। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরে আসছে। দেখুন: ইবনে তাইমিয়া, আল ফুরকান বাইনা আওলিয়াইর রাহমান ওয়া আওলিয়াইশ শায়তান পৃ.৫১০]

উল্লিখিত মূলনীতির দলিল ঈমানে মুজমাল আকারে ঈমানের বিষয়গুলো স্বীকার করে নেয়া অর্থাৎ মুখে শাহাদাতাইন উচ্চারণ করা ও অন্তরে তা সত্য বলে জানা, কেবল এতটুকুই যে ঈমান ও ইসলামের গন্ডিতে প্রবেশ করার জন্য প্রয়োজন, এর দলিল হিসেবে আমরা বেশ কয়টি বিশুদ্ধ হাদিস পাই, যা প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি মৌখিক ঘোষণার পাশাপাশি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সে মুমিন ও মুসলিম খেতাবে ভূষিত হবে, জান্নাতে প্রবেশের হকদার হবে এবং তাকে অনন্তকাল জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে থাকতে হবে না। অনুরূপভাবে সীরাতের ঘটনাবলিও প্রমাণ করে যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবৃন্দ এমন যে কোনো ব্যক্তিকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করতেন যে শাহাদাতাইন উচ্চারণ করেছে। শুরুতেই তারা শাহাদাতাইনের সঙ্গে অন্যকিছু যুক্ত করতেন না। নিচে এ বিষয়ক কিছু হাদিস উল্লেখ করছি, এরপর সীরাত থেকে কিছু ঘটনা উল্লেখ করার আশা রাখি। হাদিসের দলিল

১- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, এ দুটোতে কোনো সন্দেহ পোষণ না করে যে বান্দা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ [মুসলিম, আস-সহিহ (নববীর ব্যাখ্যাসহ) ১/২২৪]

অন্য-এক বর্ণনা মতে, ‘যে বান্দা এ দুটো নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সন্দেহকারী না হয়ে, তার জান্নাতে প্রবেশের পথে বাধা থাকবে না।’ [প্রাগুক্ত: ১/৪২৬]

২ - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ‘যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে সে জানে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’

[প্রাণ্ডক্ত:১/২১৮]

৩ - উবাদা ইবনে ছামেত (রাযি.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিলেন।’

[প্রাণ্ডক্ত:১.২২৯] এ অর্থে আরও বহু হাদিস রয়েছে, [প্রাণ্ডক্ত ১/২১৮-২৪০] যা অভিন্ন বক্তব্যকে তাগিদ করে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাওহিদের বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, শাহাদাতাইন সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে সে, আগে হোক পরে হোক, একদিন-না-একদিন জান্নাতে যাবে, সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না, পাপ-গুনাহের জন্য জাহান্নামে তাকে শাস্তি দেয়া হলেও। মূল : ড. মুহাম্মাদ নাঈম ইয়াসিন বাংলা অনুবাদ : ড.

মাওলানা শামসুল হক সিদ্দিক

প্রায়োগিক সুন্নত এবং সীরাতের কয়েকটি ঘটনা

প্রায়োগিক সুন্নত এবং সীরাতের কিছু ঘটনায় আমরা পাই যে, যারা শাহাতাদাইন মেনে নিয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্যই ঈমান ও ইসলামের সাক্ষ্য দিয়েছেন। যেমন,

১- সহিহ মুসলিম, মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, আবু দাউদ ও নাসাঈতে মুয়াবিয়া বিন হাকাম আস সুলামী থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যার ভাষ্য হলো, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুয়াবিয়া বিন হাকামের এক কৃতদাসীকে -যাকে সে কারুফারার জন্য আশাদ করতে চাচ্ছিল-জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আকাশে। তিনি বললেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, ওকে আশাদ করে দাও।' [দেখুন মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক পৃ.৪৮৫-৪৮৬; নাইলুল আওতার ৭/২০৮]

২ - আবু দাউদ ও নাসাঈ শারীদ বিন সাউইদ আছছাকাকী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক কৃতদাসীকে বললেন, 'তোমার রব কে?' সে বলল, 'আল্লাহ।' তিনি বললেন, 'আমি কে?' সে বলল, 'রাসূলুল্লাহ।' তিনি বললেন, 'ওকে আশাদ করে দাও, সে মুমিনা।' [দেখুন নাইলুল আওতার ৭/২০৮]

৩ - সীরাতগ্রন্থসমূহে আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর ইসলামগ্রহণের ঘটনায় এসেছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং বললেন, 'কুরাইশরা আপনার ব্যাপারে যা বলছে, তা কি ঠিক, হে মুহাম্মাদ (সা.)? আপনি নাকি আমাদের ইলাহদের ত্যাগ করে চলেছেন, আমাদের আকল-বুদ্ধি নাকচ করে দিচ্ছেন, আমাদের বাপদাদাদের কাফের বলছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, আমি আল্লাহর রাসূল ও নবি, তিনি আমাকে তাঁর রিসালত পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছেন। হে আবু বকর, আমি তোমাকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আহবান জানাচ্ছি, যার কোনো শরীক নেই, তুমি তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না, সদাসর্বদা তারই আনুগত্য করো।' তিনি তাঁকে কোরান পড়ে শোনালেন। অতঃপর আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) ইসলামে প্রবেশ করলেন এবং সকল মূর্তি অস্বীকার করলেন, আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করা পরিত্যাগ করলেন, ইসলাম যে হক ও সত্য তিনি তার স্বীকারোক্তি দিলেন, তিনি মুমিন ও বিশ্বাসী হয়ে ফিরে এলেন।' [সীরাতে ইবনে কাছীর ১/৪৩৩] আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কথার প্রতি ঈমান আনার আহবান জানিয়েছেন তা ছিল প্রকৃত অর্থে শাহাদাতাইন।

৪ - খালেদ বিন সাইদ (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় এসেছে, তিনি আজয়াদ এলাকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখা পেলেন এবং বললেন, 'হে মুহাম্মাদ, তুমি কিসের প্রতি আহবান কর?' তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে আহবান করছি এক আল্লাহর প্রতি, যার কোনো শরীক নেই, আর মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।' খালেদ বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহর রাসূল।' তার ইসলাম গ্রহণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশি হলেন।' [সীরাতে ইবনে কাছীর ১/৪৪৭]

৫ - আবু যর গিফারী (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় এসেছে, তিনি বলেন, 'আমি ইসলামের চতুর্থ ব্যক্তি। আমার পূর্বে তিনজন ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আর আমি

হলাম চতুর্থ। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলাম এবং বললাম, আস সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারায়ে আনন্দের ঝলক দেখতে পেলাম।’ [সীরাতের ইবনে কাছীর ১/৪৪৭] এটা হলো তার ইসলাম গ্রহণে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। ইমাম বুখারি আবু যর গিফারী (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। সেখানে আছে যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু যর গিফারী (রাযি.)-কে ইসলাম গ্রহণের পর বললেন, ‘তুমি তোমার কাওমের কাছে ফিরে যাও। তাদের দাওয়াত দিতে থাক যতক্ষণ না আমার নির্দেশ আসে।’ তিনি বললেন, ‘যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তার কসম, আমি তাদের অবশ্যই উৎসাহিত করব, এবং তা সকলের সামনেই। অতঃপর তিনি মসজিদে গেলেন ও চিৎকার করে ঘোষণা করলেন, **الله رسول محمد وأن لا إله إلا الله لا أن أشهد** এরপর তার কাওম তার প্রতি ধেয়ে এল। তারা তাকে মেরে মেরে একেবারে ধরাশায়ী করে দিল।’ [বুখারি, আস-সহিহ (ফাতহুল বারীসহ) ৭/১২৯; হায়াতুস সাহাবা ১/২৯০] উল্লিখিত হাদিস এ বিষয়টি খুব স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, সাহাবীগণ শাহাদাতাইনের মাধ্যমেই ইসলামে প্রবেশ করতেন।

৬ - তুফাইল বিন আমর আদ-দুসী (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় এসেছে যে, তিনি দুস এলাকার একজন সম্মানিত ও সর্বমান্য নেতা ছিলেন। তিনি মক্কায়ে এলে কুরাইশ নেতারা তার সঙ্গে মিলিত হন, তারা তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেন। রাসূলুল্লাহর সঙ্গে মিলিত হতে অথবা তাঁর কথা শুনতে তাকে নিষেধ করে দেন। তুফাইল বলেন, ‘আল্লাহর কসম, তারা আমার সঙ্গে লেগেই থাকল যে পর্যন্ত না আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমি তার কোনো কথাই শুনব না, তার সঙ্গে নিজেও কথা বলব না। এমনকি যখন আমি মসজিদে গেলাম, পাছে তার কোনো কথা আমার কানে প্রবেশ করে ফেলে এই আশঙ্কায় আমি আমার কানে তুলা পুতে নিলাম। আমি তার কথা শুনব না এ ব্যাপারে আমার অন্তর শক্ত করে নিলাম। যখন আমি মসজিদে গেলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাবার কাছে নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় পেলাম। আমি নিকটে গিয়ে দাঁড়ালাম। আল্লাহ তাআলা যেন তাঁর কিছু কথা আমাকে শুনিয়ে তবেই ছাড়বেন। তুফাইল (রাযি.) বলেন, অতঃপর আমি সুন্দর কিছু কথা শুনলাম। মনে মনে বললাম, আমার মা সন্তানহারা হোক, আল্লাহর কসম, আমি নিশ্চয় একজন বুদ্ধিমান পুরুষ। ভালোমন্দের পার্থক্য আমি বুঝি। তাহলে এই লোকটির কথা শুনতে আমার সমস্যা কোথায়। যদি সে ভালো কথা বলে, তাহলে তা গ্রহণ করব, আর যদি মন্দ কথা বলে তবে বর্জন করব। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাড়ির দিকে রওনা হওয়া পর্যন্ত আমি সেখানে দাঁড়িয়েই থাকলাম। অতঃপর আমি তার অনুসরণ করলাম। তিনি তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করার পর আমিও প্রবেশ করলাম। আমি তাঁকে লক্ষ্য করে বললাম, হে মুহাম্মাদ, আপনার কাওম তো আমাকে এই এই বলল। তারা আমাকে আপনার ব্যাপারে ভয়ভীতি দেখিয়েই চলল যতক্ষণ না আমি আমার কানে তুলা পুতে নিই, যাতে আপনার কোনো কথা শুনতে না হয়। তবে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার কথা না শুনিয়ে ছাড়লেন না। আমি সুন্দর কথা শুনেছি। অতএব আমাকে আপনার দাওয়াত সম্পর্কে বলুন। তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন ও কোরান তিলাওয়াত করে শোনালেন। আল্লাহর কসম, আমি এর চেয়ে উত্তম কোনো কথা কখনো শুনিনি। এর চেয়ে সরল ও ইনসাফপূর্ণ কথা কখনো শুনিনি। অতঃপর আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং সত্যের সাক্ষ্য

দিলাম।’ [সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৪০৮] সত্যের সাক্ষ্য হলো ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, এই সাক্ষ্য দেয়া।

৭ - খালেদ ইবনে ওয়ালীদে (রাযি.) ইসলাম গ্রহণের কাহিনীতে এসেছে, তিনি মদীনায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। মদীনায়ে এসে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আল ওয়ালীদ বিন ওয়ালীদ তাকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন। খালেদ (রাযি.) বলেন, আমার ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে বললেন, দ্রুত চলো। তোমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সংবাদ দেয়া হয়েছে। তিনি খুশি হয়েছেন। তিনি এখন তোমাদের অপেক্ষায় আছেন- তখন তার সঙ্গে আমার ইবনুল আস ও উসমান বিন তালহাও ছিলেন। অতঃপর আমরা যথাসম্ভব দ্রুত গেলাম, দূর থেকে তাকে তাকিয়ে দেখলাম। তাঁর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ানোর পূর্ব পর্যন্ত তিনি মৃদুভাবে হাসতেই থাকলেন। আমি তাঁকে সালাম জানালাম, তিনি হাসিমুখে সালামের উত্তর দিলেন। আমি বললাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, এসো। এরপর বললেন, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তোমাকে হিদায়েত দিয়েছেন। আমি জানতাম, তোমার বুদ্ধি আছে, যা তোমাকে ভালো ছাড়া অন্য কিছুতে সোপর্দ করবে না।’ [সীরাতে ইবনে কাছীর ২/৪০৮]

আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ-প্রক্রিয়া শাহাদাতাইনের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়, উল্লিখিত হাদিসসমূহ ও ঘটনাপঞ্জি আহলে সুন্নতের ঐকমত্যপূর্ণ এ মূলনীতিটিকেই নির্দেশ করছে। অতএব এ সব টেক্সটের আলোকে, কোনো ব্যক্তি মুসলমান হয়েছে বলে ততক্ষণ পর্যন্ত বলা যাবে না যতক্ষণ না সে জিহবা ও অন্তর দ্বারা শাহাদাতাইনের স্বীকারোক্তি দেয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি শাহাদাতাইনের স্বীকারোক্তি দেবে, তাকে কাকের বলে আখ্যা দেয়া যাবে না, যতক্ষণ না তার দ্বারা এমন বিষয় সংঘটিত হয়, যা উল্লিখিত দু-বিষয়ের অথবা দুটোর যেকোনো একটির স্বীকারোক্তিকে নস্যাত করে দেয়।

আরেকটি বিষয় হলো, ইসলামে প্রবেশের জন্য শুধু এক বিষয়ে স্বীকারোক্তি দিলে হবে না, বরং দু-বিষয়ে একসঙ্গে স্বীকারোক্তি দিতে হবে। প্রশ্ন হতে পারে, উল্লিখিত কিছু হাদিসে এবং অন্যান্য হাদিসে শুধু এক বিষয়ে স্বীকারোক্তির কথা আছে, অর্থাৎ لا إله إلا الله । এর জবাব, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ দ্বারা দু-বিষয়ের স্বীকারোক্তিই উদ্দেশ্য; কেননা অন্যান্য হাদিস যেখানে শাহাদাতাইন পুরোটা রয়েছে তা উল্লিখিত হাদিসের ব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য। [নববী প্রণীত সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ১/২১৯] শাহাদাতাইন উচ্চারণ করা এবং অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা, ইসলাম ও ঈমানে প্রবেশ করা এবং জাহান্নামের স্থায়ী আবাস থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, যদি এর সঙ্গে উভয় বিষয়ের স্বীকারোক্তি অথবা যেকোনো একটির স্বীকারোক্তি নস্যাতকারী কোনো কিছু সম্পৃক্ত থাকে- এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে কোনো বিতর্ক নেই। অতএব যদি কেউ বলে, আমি স্বীকার করছি, আল্লাহর ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, তবে আমি স্বীকার করি না যে জাকাত ও হজ্জ ফরজ; ব্যভিচার, হত্যা, রিবা এবং অন্যান্য ইসলামের বিধানাবলি যা আল-কোরানে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসে এসেছে এবং যা দ্বীনের স্বতঃসিদ্ধ বিষয় হিসেবেও খ্যাত, আমি এসব মানি না, অথবা যদি বলে, আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত স্বীকার করে নিচ্ছি, তবে আমি মনে করি, তা ছিল বিশেষ জাতি বা বিশেষ প্রজন্ম বা বিশেষ যুগের জন্যে নির্দিষ্ট, অথবা যদি শাহাদাতাইনের স্বীকারোক্তি দেওয়ার পাশাপাশি, এর সঙ্গে নিজস্ব ব্যাখ্যা যুক্ত করে নেয়, যার ফলে আল্লাহ তাআলার গুণাবলি ও নাম বিষয়ক কিছু তাওহিদ বাতিল হয়ে যায়, অথবা শাহাদাতাইনের স্বীকারোক্তি দিল ঠিকই কিন্তু আল-কোরানের কোনো কিছু অস্বীকার করল, হোক তা একটি আয়াত কি একটি শব্দ, তা হলে এ স্বীকারোক্তির আদৌ

কোনো মূল্য থাকবে না; কারণ এ ক্ষেত্রে উল্লিখিত স্বীকারোক্তির সঙ্গে-সঙ্গে কুরআনের প্রতি অস্বীকৃতি, রাসুলের প্রতি অস্বীকৃতিও যুক্ত করা হয়েছে। [কাশফুশ্শুবুহাত পৃ. ১৪১-১৪২]

অনুরূপভাবে, যদি কোনো ব্যক্তি অন্যকোনো সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, তাহলে সে সম্প্রদায়ের আকীদা-বিশ্বাস, নীতি-আদর্শ, শাহাদাতাইন দ্বারা ততক্ষণ পর্যন্ত নাকচ হবে না যতক্ষণ না শাহাদাতাইনের সঙ্গে সে সব আকীদা-বিশ্বাস, নীতি-আদর্শ বর্জন করার ঘোষণা না দেওয়া হবে। অতএব যদি কোনো ব্যক্তি তাওহিদে বিশ্বাসী হয় এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নেয়, কিন্তু এই ভাবনা নিয়ে যে তাঁর রিসালত ছিল সুনির্দিষ্ট একটি জাতির জন্য, অথবা সুনির্দিষ্ট একটি কালের জন্য, তাহলে এ ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার জন্য শাহাদাতাইনের স্বীকারোক্তি যথেষ্ট হবে না। বরং এর সঙ্গে তাকে এ ব্যাপারেও স্বীকারোক্তি দিতে হবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত মানুষের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। [দেখুন: নববী প্রণীত সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ১/১৪৯; শারহুসসিয়্যার আল কাবীর ১/১৫০; ইবনে কদাম, আল মুগনী ৯/২১] এ বিষয়ে আলেমদের কেউ-কেউ একটি সাধারণ নীতির কথা বলেছেন। নীতিটি হলো, শাহাদাতাইনের স্বীকারোক্তি কেবল তখনই একজন মানুষকে মুসলিম খেতাবে ভূষিত হওয়ার যোগ্য করে তোলে, যখন তার এ স্বীকারোক্তি সকল বাতিল আকীদা-বিশ্বাসকে নস্যাকারী হিসেবে যথেষ্ট হবে যা সে পূর্ব থেকে ধারণ করে এসেছে। আর যদি এর অন্যথা হয়, তাহলে সে-বাতিল বিশ্বাসগুলো থেকে পবিত্র হওয়ার ঘোষণাও উচ্চারণ করতে হবে; কারণ তা নস্যাকারী কোনো বক্তব্য শাহাদাতাইনের আওতায় শামিল হয়নি। [দেখুন শারহুসসিয়্যার আল কাবীর ১/১৫০]

উল্লেখ্য যে, ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই’ এ ঘোষণা, আল্লাহ সম্পর্কে, তাঁর রুবুবিয়াত ও উলুহিয়াত সম্পর্কে সকল বাতিল আকীদা-ধারণা নস্যাকার করে দেয়। কেননা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর দাবি হলো আল্লাহ তাআলাকে তাঁর সত্তায়, গুণাবলিতে, নামে ও কর্মে অদ্বিতীয় ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করা এবং যা-কিছু তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না, তা থেকে তাঁকে পবিত্র করা। অতএব যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ উচ্চারণ করে, সে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে সকল বাতিল আকীদার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। আর দ্বিতীয় সাক্ষ্যটি-অর্থাৎ ‘মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল’- মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থান বিষয়ক অধিকাংশ বাতিল আকীদা নস্যাকার করে দেয় এবং তিনি যেসব অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন, তার সবগুলোর প্রতি স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করে। তবে এ স্বীকারোক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থান বিষয়ক কিছু বাতিল আকীদাকে নস্যাকার করে না। যেমন তাঁর রিসালতকে বিশেষ জাতি বা বিশেষ যুগের জন্য সুনির্দিষ্ট মনে করা। যারা এরূপ মনে করে তাদের শাহাদাতাইনের স্বীকারোক্তির পাশাপাশি এ বিষয়েও স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করতে হবে যে, তাঁর রিসালত হলো ব্যাপক, অর্থাৎ সকল জাতির জন্য এবং তাঁর প্রেরিত হওয়ার সময় থেকে কেয়ামত পর্যন্তের জন্য। যারা শুরু থেকেই ঈমানহারা তথা কাফের, ইতোপূর্বে যারা আল্লাহর দ্বীনে দাখেল হয়নি তাদের ইসলাম গ্রহণের পদ্ধতি কি, তা আমরা ওপরের পৃষ্ঠাগুলোয় আলোচনা করলাম।

আর যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়েছে, ঈমানের যে বিষয়গুলো অস্বীকার করার কারণে সে মুরতাদ হয়েছে, তা মেনে নেওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে মুসলমান হিসেবে গণ্য করা হবে না। এর সঙ্গে শাহাদাতাইনের স্বীকারোক্তিও তাকে নতুনভাবে দিতে হবে। অতএব যদি তাওহিদ অস্বীকার করা অথবা রিসালত অস্বীকার করার কারণে মুরতাদ হয়ে থাকে, তবে এ দুটোর স্বীকারোক্তি দেওয়াই পুনরায় ইসলামে ফিরে আসার জন্য যথেষ্ট হবে। পক্ষান্তরে, যদি অন্যকিছু অস্বীকার করার কারণে মুরতাদ হয়ে থাকে, তাহলে নতুনভাবে শাহাদাতাইনের স্বীকারোক্তির পাশাপাশি যে বিষয়টি সে অস্বীকার করেছে তারও স্বীকারোক্তি

দিতে হবে। [ইবনে কুদামা, আল মুগনী ৯/২১; হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদীন: ৩/৩৯৭]
উদাহরণত যদি কেউ জাকাত ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করে, অথবা সুদ ও ব্যভিচার
হারাম হওয়াকে অস্বীকার করে, তবে সে ততক্ষণ পর্যন্ত নতুনভাবে মুসলমান হতে পারবে
না, যতক্ষণ না সে সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.)
তাঁর রাসূল এবং যা ফরজ হওয়া অথবা হারাম হওয়া অস্বীকার করেছে, তা ফরজ হওয়া
অথবা হারাম হওয়া স্বীকার করে নেবে। শাহাদাতাইনের মৌখিক স্বীকারোক্তি দিলেই একজন
মানুষ মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে, আলেমদের কেউ এ ব্যাপারে দ্বিমত করেননি, ঈমানের
হাকিকত অধ্যায়ে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। তবে মৌখিক স্বীকারোক্তি দাতাকে মুসলমান
হিসেবে গণ্য করার বিষয়টি একটি ইহলৌকিক ব্যাপার। অর্থাৎ তা পার্থিব হকুএ আহকাম
আরোপিত হওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। পরকালীন মুক্তি ও চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে অবস্থান করা
থেকে নাজাতের জন্য মৌখিক স্বীকারোক্তির সঙ্গে অন্তরের স্বীকৃতিও অবশ্য প্রয়োজন। অতএব
যে ব্যক্তি, উল্লিখিত শর্তগুলো বাস্তবায়নপূর্বক শাহাদাতাইনের মৌখিক স্বীকারোক্তি দেবে,
ইহকালীন জীবনে ইসলামের দাবি অনুযায়ী আমল করবে, তাকে মুসলমান হিসেবে গণ্য করা
হবে, যদিও সে অন্তরে মুনাকফ থাকে। কারণ বাহ্য অবস্থার ওপর ভিত্তি করেই ইহকালীন
হকুএ আহকাম আরোপ করার নির্দেশ আমাদের দেওয়া হয়েছে। আর অন্তরের বিষয়টি
আল্লাহর জন্য ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে। কারণ একমাত্র আল্লাহর তাআলাই অন্তর্জামী, অন্য
কারও পক্ষে অন্তরের সংবাদ জানা সম্ভবপর নয়। উসামা (রযি.) একব্যক্তির বাহ্যিক
স্বীকারোক্তি গ্রহণ না করে, এই ভেবে তাকে হত্যা করে ফেলেন যে, লোকটি অন্তর থেকে
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এ আমলকে নাকচ
করে দিয়েছেন, বিষয়টি ওপরে আলোচিত হয়েছে।

মুমিন কখন কাফের হয়

আল্লাহর দ্বীনে কীভাবে প্রবেশ করতে হয়, তা আমরা জানতে পারলাম। আর যারা ঈমানের গন্ডিতে প্রবেশ করে তারা কয়েক ধরনের- তাদের কাউকে আল্লাহ তাআলা ঈমানের ওপর স্থির রাখেন, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল এ বিশ্বাস অন্তরে ধারণ করে এবং মুখে স্বীকার করে তারা মৃত্যুবরণ করে। আর তাদের মধ্যে কেউ ঈমানের কোনো বিষয়ের প্রতি অস্বীকৃতিজ্ঞাপন করে মুরতাদ হয়ে যায়। প্রথম প্রকারের মুমিনদের আবার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ মুহসিন, কেউ মুকতাসিদ, আবার কেউ নিজেদের ওপর জুলুমকারী। তাদের মধ্যে কেউ বিনা-হিসাবে জান্নাতে যাবে, কেউ অতি সহজ হিসাবের পর জান্নাতে যাবে, আবার কেউ শাস্তি ভোগ করার পর, আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুকম্পায় জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাবে।

এবার আসা যাক ইসলাম গ্রহণের পর মানুষ কীভাবে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, সে আলোচনায়। এ ব্যাপারে প্রথমে একটি মূলনীতি উল্লেখ করব, যার ব্যাপারে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সবাই একমত। এরপর এ বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যাব, ইনশা আল্লাহ-মূলনীতি এ ক্ষেত্রে ইমাম তাহাবী র. এর একটি কথা আলোচ্য মূলনীতির ভাষ্য হিসেবে উল্লেখ করব।

ইমাম তাহাবী তার আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ আল আকীদা আত-তাহাবিয়ায় বলেন, ‘আমাদের কেবলকে যারা কেবলা হিসেবে মানে তাদের আমরা মুসলিম ও মুমিন বলে ডাকব যতক্ষণ তারা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা-কিছু নিয়ে এসেছেন, তা স্বীকার করে যাবে, তিনি যা-কিছুর সংবাদ দিয়েছেন, তা অন্তর থেকে স্বীকার করে যাবে। গুনাহের কারণে কোনো আহলে কেবলাকে আমরা কাফের বলব না, যতক্ষণ না সে তা হালাল মনে করবে। আমরা বলব না, ঈমান থাকাবস্থায় গুনাহ করলে কোনো ক্ষতির কারণ নয়...। আর কোনো মুমিন, যা স্বীকার করে ঈমান লাভ করেছে, তা অস্বীকার করা ছাড়া ঈমান থেকে বের হয়ে যায় না। [দেখুন শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ পৃ. ২৫০, ২৫১, ২৭২]

উল্লিখিত মূলনীতির ব্যাখ্যা হলো এই- শরীয়ত প্রবর্তক ঈমান ও ইসলামে প্রবেশের জন্য একটি দরজা রেখেছেন, যেখান দিয়ে ইমান ও ইসলাম নামক ঘরে প্রবেশ করতে হবে। দরজাটি হলো শাহাদাতাইনের মৌখিক স্বীকারোক্তি ও আন্তরিক স্বীকৃতি। অতএব যে ব্যক্তি এই দরজা দিয়ে ইসলাম নামক ঘরে প্রবেশ করে সে তা থেকে বের হয়ে যায় না, যদি না সে এমন কোনো কথা-কাজ-বিশ্বাস ধারণ করে যা তার উল্লিখিত স্বীকারোক্তি-স্বীকৃতির বিপরীত। আর ওপরে আমরা জেনেছি যে, ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই’ এ সাক্ষ্যের অর্থ আল্লাহ তাআলাকে তাঁর রুবুবিয়াত, উলুহিয়াত, নামসমগ্র, গুণসমগ্র ও তাঁর কর্মসমূহের ক্ষেত্রে এক ও অদ্বিতীয় বলে স্বীকার করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য কোনো প্রকার ইবাদত নির্দিষ্ট না করা। আর ‘মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল’ এ সাক্ষ্যের অর্থ হলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরীয়ত হিসেবে যা-কিছু নিয়ে এসেছেন, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন তা জিহবা ও অন্তর দ্বারা স্বীকার করে নেওয়া। পাশাপাশি নবুওতের যেসব আখলাক ও গুণাগুণ তিনি বহন করেছেন যেমন সত্যবাদিতা, আমানতদারী, বিচক্ষণতা, তাবলীগে দ্বীন, গুনাহ থেকে মাসুম থাকা ইত্যাদির প্রতিও স্বীকৃতি-স্বীকারোক্তি প্রদান করা।

এর পর যদি কোনে ব্যক্তি এমন কোনো কথা বলে বা কাজ করে যা উল্লিখিত স্বীকারোক্তির বিরুদ্ধে, তাহলে সে এ স্বীকারোক্তি নস্যাত্ন করে দিল, আল্লাহর দ্বীন থেকে বের হয়ে গেল। আর যদি তার কথা ও কাজের সঙ্গে অন্তরের নিয়ত ও বিশ্বাসেরও মিল থাকে, অর্থাৎ সে যা বলল বা করল, তা অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করেই বলল বা করল, তাহলে সে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানেই কাফের বলে গণ্য হবে। দুনিয়াতে কাফেরদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে যেসব বিধান প্রযোজ্য সে সব বিধান তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। তার ওপর রিদ্দত- এর হুকুম আরোপ করা হবে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তাওবা করার নির্দেশ দেয়া, তাওবা করতে অস্বীকার করলে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা।

[মুর্তাদকে মৃত্যুদন্ড দেয়ার শর্ত হলো ইসলামী রাষ্ট্র কায়ম থাকা এবং স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান বা তার নিয়োগকৃত বিচারকের নির্দেশে তা বাস্তবায়িত হওয়া। বেসরকারি বা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বা উদ্যোগে কোনো মুর্তাদকে হত্যা করা ইসলামের বিধানবহির্ভূত। ইসলামী শরীয়ার রাষ্ট্রীয় অনুশীলনের অনুপস্থিতি সাধারণ মুমিনদের যা করণীয় তা হলো মুর্তাদকে মুর্তাদ হিসেবে বিশ্বাস করা এবং তাকে ইসলামের গন্ডিতে ফিরিয়ে আনার জন্য দাওয়াতী মেহনত চালিয়ে যাওয়া। মুর্তাদ ব্যক্তি কেন মৃত্যুদন্ডের মুখোমুখি হবে, সে তো স্বাধীন ইচ্ছায় ইসলাম ত্যাগ করেছে? এ প্রশ্নের উত্তর হলো- ইসলাম সর্বোচ্চ সত্য, আল্লাহ তাআলার একমাত্র দ্বীন। এ দ্বীনকে পরিত্যাগ করার অর্থ সর্বোচ্চ সত্যকে পরিত্যাগ করা, যার পরকালীন শাস্তি অনন্ত জাহান্নাম। আর যেহেতু একজন মুর্তাদকে দেখে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে আরও অনেকে বিপথগামী হতে পারে, অনন্ত নরকের পথে চলমান হতে পারে, সে জন্য অন্যদের নিরুৎসাহিত করতে এ কঠিন বিধান রাখা হয়েছে। আরেকটি বিষয় হলো, ইসলাম কাউকে জোর করে মুসলমান বানাতে নির্দেশ দেয় না। নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস ধরে রাখার স্বাধীনতা ইসলামে স্বীকৃত, যদিও সকল জাতিগোষ্ঠী-সম্প্রদায়কে ইসলামের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসার প্রাণান্তকর দাওয়াতী মেহনত- যাকে এক আয়াতে বড় জিহাদ বলা হয়েছে- চালাতে বলে। তবে যদি কেউ সব কিছু ভালো করে বুঝার পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে সে ইসলামের বিধিবিধানের আওতায় চলে আসে। যার মধ্যে একটি হলো ইসলাম এবং ইসলামের কোনো বিধান অস্বীকার না করা, আর যদি কেউ তা করে তবে তাকে সরকারি উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় তাওবার নির্দেশ দেয়া, যদি তাওবা না করে তবে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া।

[অনুবাদক]

যদি সে মুর্তাদ অবস্থায়ই মারা যায়, তবে চিরস্থায়ীভাবে সে জাহান্নামে থেকে যাবে, যেমন থাকবে কাফের-মুশরিকরা। কিন্তু যদি কোনো মুমিন গুনাহ করে- এমন কোনো কথা বলে বা কাজ করে, যা ইসলামী শরীয়ে গুনাহ হিসেবে পরিগণিত, তবে শুধু এতটুকুই তাকে ঈমানের গন্ডি থেকে বের করে দেবে না, যদিও সে ওই গুনাহ থেকে তাওবা না করে। তবে শর্ত হলো এমন কোনো বিষয় না করা, যা ঈমানের দুই সাক্ষ্য অথবা দুটির মধ্যে যে কোনো একটি নস্যাত্নকারী বলে পরিগণিত। উল্লিখিত গুনাহগার মুমিন ক্ষমা পাবে কি পাবে না, তা আল্লাহর হাতে ন্যস্ত। তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেবেন, আবার ইচ্ছা করলে জাহান্নামে শাস্তি দেবেন এবং পরিশেষে জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দেবেন। আর এ ব্যাপারে বহু হাদিস রয়েছে যে, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে তাকেই জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। আর যদি আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেন তবে, মুমিন ব্যক্তির গুনাহ যাই হোক না কেন, তিনি তাকে জাহান্নামে আজাব না দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَشَاءُ لِمَنْ ذَلِكَ دُونَ مَا وَيَغْفِرُ بِهِ يُشْرِكُ أَنْ يُغْفِرَ لَا اللَّهُ إِنَّ

‘নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করেন না তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে এবং এ ছাড়া যাকে চান ক্ষমা করেন’ – (সূরা আন্-নিসা, ১১৬)।

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৬১ : ঈমান নস্যাকারী বিষয়সমূহের প্রকার : প্রথম প্রকার

ঈমান নস্যাকারী বিষয়সমূহের প্রকার

ঈমান নস্যাকারী বিষয়গুলো কয়েক ধরনের হতে পারে, উল্লিখিত মূলনীতি এ কথাই নির্দেশ করে। আবার প্রতিটির ধরন বহু ব্যাখ্যা ও আকারপ্রকৃতি शामिल করে, যা হিসেব করা কঠিন। তবে মৌলিকভাবে ঈমান নস্যাকারী বিষয়গুলোর চারটি ধরন নির্ণয় করা যায়। তা হলো,

- ১ - আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়াত অস্বীকার করা অথবা রুবুবিয়াতের বিশ্বাস আহত করা।
- ২ - আল্লাহর নাম ও গুণাবলির বিশ্বাস আহত করা।
- ৩ - আল্লাহর উলুহিয়াত অস্বীকার করা অথবা এ বিশ্বাস আহত করা।
- ৪ - রিসালত অস্বীকার করা অথবা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বিশ্বাসকে আহত করা।

এ হলো চার ধরন, যার প্রতিটির আওতায় शामिल রয়েছে কথা, কর্ম ও বিশ্বাসের নানা আকার-প্রকৃতি, যার সবগুলোই শাহাদাতাইনের স্বীকারোক্তি নস্যাকারী এবং ব্যক্তিকে ইসলামের বলয় থেকে বহিষ্কারকারী। আল্লাহর কাছে আমরা এসব বিষয়ের সংশ্লিষ্টতা থেকে পানাহ চাই। নিচে প্রতিটি ধরনের ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট হলো, প্রথম প্রকার আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি যে তাওহীদের একটি প্রকার হলো রুবুবিয়াত ও রাজহ্বের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাকে অদ্বিতীয় হিসেবে বিশ্বাস করা। এ বিশ্বাস ধারণ করা যে, আল্লাহ তাআলাই সব কিছুর রব ও মালিক, সব কিছুর স্রষ্টা ও রিয়িকদাতা, একমাত্র তিনিই সব কিছুর ব্যবস্থাপক ও নিয়ন্তা- তার ইচ্ছা, ইলম ও হিকমত অনুযায়ী। অতএব এমন প্রত্যেক বিশ্বাস বা কথা যাতে উল্লিখিত রববানী বৈশিষ্ট্যের সবগুলোর প্রতি অথবা কোনো একটির প্রতি অস্বীকৃতি রয়েছে, তা কুফর ও রিদ্দত বলে পরিগণিত হবে। এর মধ্যে शामिल হবে সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করা, আল্লাহ ছাড়া অন্যকোনো বিষয়কে অনাদি তথা আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেননি বলে বিশ্বাস করা, অথবা সৃষ্টি ও পরিচালনা আল্লাহ ছাড়া অন্যকোনো উৎস থেকে হয় বলে ভাবা, যেমন প্রকৃতি, আকস্মিকতা ইত্যাদি, অথবা সকল সৃষ্টির মালিক যে একমাত্র আল্লাহ তাআলা, তা অস্বীকার করা। অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্যকেউ রিয়িকের ব্যবস্থা করেন বলে বিশ্বাস করা। অথবা এ ক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে অন্য-কাউকে শরীক করা, অথবা আল্লাহ শুধু সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয়েছেন, তিনি তা পরিচালনা, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করছেন না, এ বিশ্বাস পোষণ করা। এ জাতীয় আরও অন্যান্য বিশ্বাস যা আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়াতের বৈশিষ্ট্যকে স্পর্শ করে। অনুরূপভাবে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের কোনো একটি যদি কোনো ব্যক্তি নিজের জন্য দাবি করে তবে সেও কাফের ও মুরতাদ বলে পরিগণিত হবে। যেমন কেউ নিজের জন্য রুবুবিয়াত দাবি করল, যেমনটি করেছিল ফের'আউন, সে বলেছিল '

الْأَعْلَى رَبُّكُمْ أَنَا

আমি তোমাদের সর্বোচ্চ রব'। [সূরা আন্-নাযিআত:২৪]

অথবা সে দাবি করল, সে মহাবিশ্বের কোনো-কিছুর মালিক বা রিয়িকদাতা অথবা পরিচালক। এরূপ দাবিদারকে যে বিশ্বাস করবে সেও কাফের হয়ে যাবে।

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৬২ : ঈমান নস্যাকারী বিষয়সমূহের প্রকার : দ্বিতীয় প্রকার

ঈমান নস্যাকারী বিষয়সমূহের প্রকার : দ্বিতীয় প্রকার

আর তা হলো তাওহিদের দ্বিতীয় প্রকারের কোনো-কিছু আহত করা। অর্থাৎ আল্লাহর নাম ও গুণাবলি-বিষয়ক কোনো বিশ্বাসকে আহত করা। আল্লাহর তাআলা তাঁর নিজের জন্য কিছু নাম ও গুণাবলি সাব্যস্ত করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর জন্য কিছু নাম ও গুণাবলির সংবাদ দিয়েছেন, এবং কিছু গুণাবলি অ-সাব্যস্ত করেছেন। অতএব সাব্যস্তকৃত গুণাবলিগুলো যে অস্বীকার করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যে অ-সাব্যস্তকৃত গুণাবলির কোনো একটি আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করবে সেও কাফের হয়ে যাবে। সে হিসেবে গুণাবলির প্রতি কুফরি করা দু-প্রকার---

অ-সাব্যস্তকরণমূলক কুফরি এবং

সাব্যস্তমূলক কুফরি।

যেসব বিষয় প্রথম প্রকারের আওতায় আসে, তা হলো, আল্লাহ তাআলার কোনো গুণ অ-সাব্যস্ত করা, যেমন আল্লাহ তাআলার পূর্ণ ইলম, তাঁর কুদরত, তাঁর জীবন, তাঁর অবিদ্যমানতা, তাঁর শ্রবণ, তাঁর দৃষ্টি, তাঁর আরশের উপর ইস্তিওয়া, তাঁর কথা, তাঁর রহমত, তাঁর জাবারুত, তাঁর বড়াই ইত্যাদি গুণাবলি যা কোরান সুন্নাহ অনুযায়ী আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত। এর আওতায় আরও शामिल রয়েছে, তাঁর নাম ও গুণসমূহের এমন তাবীল করা যা তার ব্যাপকতাকে হ্রাস করে দেয়, অথবা তার পূর্ণতাকে সীমিত করে দেয়। যেমন, আল্লাহর তাআলার ইলম আছে, এ কথা কেউ স্বীকার করল, কিন্তু সে বলল যে আল্লাহর ইলম হলো এজমালি তথা অবিশ্লিষ্ট ইলম, তিনি বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি ইলম রাখেন না। অথবা আল্লাহ তাআলার কোনো গুণকে মাখলুকের কোনো গুণের সদৃশ করে উল্লেখ করল, বলল যে আল্লাহ তাআলা শোনে যেন মানুষ শোনে, তিনি দেখেন যেন মানুষ দেখে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ সাব্যস্তকরণমূলক কুফরের মধ্যে পড়ে, আল্লাহর জন্য এমন গুণ সাব্যস্ত করা যা তিনি নিজের জন্য অ-সাব্যস্ত করেছেন, অথবা তাঁর রাসূল তাঁর রবের জন্য অ-সাব্যস্ত করেছেন। যেমন আল্লাহর জন্য ছেলে সাব্যস্ত করা, মেয়ে সাব্যস্ত করা, সঙ্গিনী সাব্যস্ত করা, নিদ্রা-তন্দ্রা-উদাসীনতা-মৃত্যু সাব্যস্ত করা, অথবা এমন কোনো অপূর্ণতা সাব্যস্ত করা যা কেবল মাখলুকের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলার কোনো গুণ যে ব্যক্তি নিজের জন্য সাব্যস্ত করবে, অথবা অন্যকোনো সৃষ্টিজীবের জন্য সাব্যস্ত করবে, সেও কাফের হয়ে যাবে। আর এ সাব্যস্তকারীর দাবিকে যে মেনে নেবে সেও কাফের হয়ে যাবে। যেমন, কেউ বলল, আমি আল্লাহর ইলমের মতো ইলম রাখি, অথবা অমুক ব্যক্তির এমন প্রজ্ঞা রয়েছে, যা আল্লাহর প্রজ্ঞার মতো। যে ব্যক্তি এরূপ বলবে সে কাফের হয়ে যাবে, অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি এমন দাবিদারের কথা সত্য বলে বিশ্বাস করবে সেও কাফের হয়ে যাবে; কারণ আল্লাহর গুণাবলির ক্ষেত্রে অন্য-কাউকে তাঁর সঙ্গে শরীক হিসেবে সাব্যস্ত করা হলো আল্লাহ তাআলার সঙ্গে বেয়াদবি করা। আর আল্লাহ তাআলার সঙ্গে বেয়াদবি অথবা তাঁর গুণাবলির সঙ্গে বেয়াদবি করা কুফর ও রিদ্দত।

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৬৩ : ঈমান নস্যাংকারী বিষয়সমূহের প্রকার : তৃতীয় প্রকার

ঈমান নস্যাংকারী বিষয়সমূহের প্রকার : তৃতীয় প্রকার

তৃতীয় প্রকার হলো এমন প্রত্যেক কথা, কর্ম ও বিশ্বাস যা তাওহিদের তৃতীয় প্রকারকে আহত করে অর্থাৎ তাওহিদে উলুহিয়াতকে আহত করে। আর তা হলো এ সাম্ফ্য দেয়া যে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সত্য মাবুদ, তিনি ছাড়া অন্যকেউ কোনো প্রকার ইবাদত পাবার হকদার নয়। অতএব যে ব্যক্তি এমন কোনো কথা বলবে বা কাজ করবে বা এমন কোনো বিশ্বাস পোষণ করবে, যাতে আল্লাহর এ অধিকারের প্রতি অস্বীকৃতিপ্রাপন শামিল থাকে, অথবা খর্বকরণ শামিল থাকে, অথবা ইবাদতের কোনো কিছু গায়রুল্লাহর জন্য নিবেদন করা হয়, সে কাফের হয়ে যাবে, আল্লাহর দ্বীন থেকে মুরতাদ হয়ে যাবে। মানুষের অধিকাংশ ধর্মচ্যুতি ও কুফরি এই তৃতীয় প্রকারের সঙ্গে জড়িত। অধিকাংশ মানুষ, অতীতে যেমন বর্তমানেও তেমনি, আল্লাহ তাআলাকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করে, তাদের অনেকেই আল্লাহর জন্য রুবুবিয়াতের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি সাব্যস্ত করে, যেমন- কুদরত, ব্যবস্থাপনা, রিয়িক, জীবন দান ও জীবন নাশ ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা আল-কোরানে উল্লেখ করেছেন যে, যেসব মুশরিক জাতির কাছে আল্লাহ তাআলা রাসূল পাঠিয়েছিলেন, তারা স্বীকার করত যে, আল্লাহ তাআলা তাদের স্রষ্টা। ইরশাদ হয়েছে,

‘لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُمْ مَنْ سَأَلْتَهُمْ وَلَئِنْ

‘আর তুমি যদি তাদের জিজ্ঞাসা কর, কে তাদের সৃষ্টি করেছেন, তারা নিশ্চয় বলবে, আল্লাহ।’ - (সূরা আয-যুখরুফ, ৮৭)।

অন্য-এক জায়গায় এসেছে,

الْعَزِيزُ خَلَقَهُنَّ لَيَقُولُنَّ وَالْأَرْضُ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ مَنْ سَأَلْتَهُمْ نَّوَلَّيَ الْعَلِيمُ

‘আর তুমি যদি তাদের জিজ্ঞাসা কর, আসমানসমূহ ও জমিন কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, মহাপরাক্রমশালী সর্বশক্তিই কেবল এগুলো সৃষ্টি করেছেন।’ - (সূরা আয-যুখরুফ, ৯)।

অধিকাংশ কাফেরদের কুফরের কারণ, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই যে ইবাদত পাবার উপযোগী, তা অস্বীকার করা- হোক তা অন্তরাশ্রিত, যেমন বিশ্বাসকেন্দ্রিক অস্বীকৃতি, বা এমন কথা ও কর্ম-আশ্রিত যা এ অস্বীকৃতি নির্দেশ করে- অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্যকেউ ইবাদতের হকদার, এ কথা অন্তর দিয়ে স্বীকার করে নেওয়া, অথবা এমন কথা বলা বা কাজ করা, যা তা স্বীকার করে নেওয়াকে নির্দেশ করে। বস্তুত এ প্রকৃতির কুফরি উল্লিখিত দু-ধরনের কুফরিতেও প্রবেশ করিয়ে নেয়। কারণ যে ব্যক্তি স্বীকার করল আল্লাহ তাআলাই সবকিছুর স্রষ্টা, সবকিছুর পরিচালক এবং সকল পূর্ণাঙ্গ গুণসহ তাঁকে মেনে নিল, এমতাবস্থায় এ মেনে নেয়ার দাবি হলো, একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই ইলাহ হিসেবে মেনে নেওয়া, একমাত্র তিনিই যে ইবাদতের হকদার, তা মেনে নেওয়া। অতএব যে তা অস্বীকার করল এবং আল্লাহর সঙ্গে অন্যকারও ইবাদত করল, তার আল্লাহ তাআলাকে রব হিসেবে মান্য করা অর্থহীন হয়ে পড়ল।

সানআনী বলেন, ‘আল্লাহ তাআলাই একমাত্র রব, যে ব্যক্তি এ কথা স্বীকার করল, তার এ স্বীকারোক্তি দাবি করে যে, একমাত্র তাঁর প্রতিই সে সকল ইবাদত নিবেদন করবে। আর

যদি না করে, তাহলে প্রথম স্বীকারোক্তি বাতিল বলে গণ্য হলো। এ কারণেই ইবাদতকেন্দ্রিক একস্ববাদ দুনিয়ার জীবনে বান্দাকে পরীক্ষা করার মাধ্যম হিসেবে থেকেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لِيَعْبُدُونِ إِلَّا وَالْإِنْسَ الْجِنَّ خَلَقْتُ مَا وَ

‘আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদত করবে’ - (সূরা আয-যারিয়াত, ৫৬)।

অতএব ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-বিষয়ে সাক্ষ্য দু-জিনিস দ্বারা নস্যাৎ হয়ে যায়, প্রথমত : ইবাদতমাত্রেরই সৃষ্টিকর্তার প্রাপ্য, এ কথা অস্বীকার, বা অ-সাব্যস্ত করা। দ্বিতীয়ত : আল্লাহর যে-কোনো সৃষ্টিজীব বা সৃষ্টিবস্তু জন্ম ইবাদতপ্রাপ্তির অধিকার সাব্যস্ত করা। অতএব উল্লিখিত দু-জিনিসকে শামিল করে এমন কথা, কাজ, বিশ্বাসমাত্রেরই ব্যক্তিকে কুফরি ও ধর্মচ্যুতির বলয়ে প্রবিষ্ট করিয়ে দেবে। আর যে ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য নিবেদন করা যায় না, তা হলো- হীনতা, দীনতা, আনুগত্য ও আদেশ-নির্দেশ মান্য করা। মহববত করা, ভয় করা, সাহায্য চাওয়া, ডাকা, তাওয়াস্কুল করা ও আশা রাখা, রুকু-সিজদা করা, রোজা পালন করা, যবেহ করা, তাওয়াফ করা ইত্যাদি।

অতএব যদি কেউ আল্লাহ তাআলাকে ভয়ের পাত্র হিসেবে বিশ্বাস না করে, ডাকার পাত্র হিসেবে বিশ্বাস না করে, সাহায্য চাওয়ার পাত্র হিসেবে বিশ্বাস না করে, রুকু-সিজদা পাওয়ার পাত্র হিসেবে বিশ্বাস না করে, আশার পাত্র হিসেবে বিশ্বাস না করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি এমন ব্যক্তিকে নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করে যে আল্লাহর ইবাদত করে, আল্লাহকে ডাকে, আল্লাহর সাহায্য চায়, দোয়া ও সাহায্য চাওয়ার বিনিময়ে আল্লাহর রহমতপ্রাপ্তির আশা করে, আল্লাহর জন্য নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, তাওয়াফ করে, এককথায় শরীয়ত যা যা চায় তা করে, তবে এ ঠাট্টাকারী ব্যক্তিও কাফের হয়ে যাবে; কেননা উল্লিখিত বিষয়গুলোর সবগুলো, অথবা কোনো একটি নিয়ে তুচ্ছ-তাম্বিল করা, ঠাট্টা করা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা যে এ সব ইবাদতের হকদার সে ব্যাপারে লোকটির বিশ্বাস নেই। অনুরূপভাবে যদি কেউ এ বিশ্বাস রাখে যে আল্লাহ তাআলা আনুগত্য পাবার হকদার নন, তাঁর নির্দেশ মান্য করা হবে ও তাঁর নিষেধাজ্ঞাসমূহ পালন করা হবে তিনি এর উপযোগী নন, তবে সেও কাফের হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য সুনির্দিষ্ট শরীয়ত দিয়েছেন, যা তিনি আল-কোরানে সন্নিবিষ্ট করেছেন এবং রাসুলকে এ ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছেন, অতএব যদি কেউ দাবি করে যে, এ শরীয়ত পালনযোগ্য নয়, অথবা বাস্তবায়ন-উপযোগী নয়, অথবা বর্তমান যুগের সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ নয় তাহলেও সে ঈমানের দাবিকে অস্বীকার করল, ফলে কাফের হয়ে গেল; কারণ উলুহিয়াতের বৈশিষ্ট্যগত একটি দাবি হলো নির্দেশ, হুকুম ও শরীয়ত প্রদান করা যা অনুসরণ করে বান্দারা ইলাহ-এর ইবাদত আনুগত্য প্রকাশ করবে। ইরশাদ হয়েছে,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

‘হুকুম একমাত্র আল্লাহরই’ - (সূরা ইউসুফ, ৪০)।

এর বিপরীতে যে ব্যক্তি উল্লিখিত ইবাদতসমূহের মধ্যে কোনো একটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্যে নিবেদন করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি নিজেকে এইসব ইবাদত পাওয়ার উপযোগী বলে ভাবে, অথবা তাকে উদ্দেশ্য করে ইবাদত নিবেদন করার

জন্য অন্যদের বলবে, সেও কাফের হয়ে যাবে। সঙ্গে-সঙ্গে যারা এই লোকের মিথ্যা দাবিকে সত্য বলে মেনে নেবে, অথবা তাঁর কথামতো ওইসব ইবাদত তার জন্য নিবেদন করবে তারাও কাফের হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি উল্লিখিত ইবাদতগুলো দ্বারা পূজিত হওয়ার বাসনা পোষণ করবে, তাকে ইবাদত করার জন্য অন্য মানুষকে নির্দেশ না দিলেও সে কাফের হয়ে যাবে। যেমন, কেউ এ বাসনা পোষণ করল যে মানুষ আল্লাহকে যেভাবে ভয় পায়, তাকেও সেভাবে ভয় পাক, যে বিষয়গুলোতে আল্লাহর কাছে সাহায্য চায় সে বিষয়গুলোতে তাঁর কাছে সাহায্য চাক, তার ওপর তাওয়াক্কুল করুক, দোয়ার মাধ্যমে তার অনুকম্পা পাওয়ার আশা করুক, অথবা তাকে সিজদা করুক, তার জন্য রুকু করুক, তার সম্মুখে হীনতা-দীনতা প্রকাশ করুক যেভাবে আল্লাহর সামনে প্রকাশ করা হয়, তবে এ ব্যক্তিও কাফের হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি দাবি করবে যে, আল্লাহর অনুমোদনের বাইরে আইন ও বিধান প্রণয়ন করার অধিকার তার রয়েছে, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করার অধিকার তার রয়েছে, যা হালাল করেছেন তা হারাম করার অধিকার তার রয়েছে, তাহলে সেও কাফের হয়ে যাবে। এর মধ্যে शामिल হবে ওইসব আইন ও বিধান যা ব্যভিচার, সুদ, পর্দাহীনতা ইত্যাদি বৈধ বলে ঘোষণা করে, অথবা ইত্যাদির যে শরীয়ানির্ভর শাস্তি রয়েছে তা পরিবর্তন করে দেয়, অথবা শরীয়ত-নির্ধারিত যাকাতের পরিমাণ, সম্পত্তি বন্টনপদ্ধতি, অথবা ইবাদত, কাফকারা ইত্যাদির শরীয়তনির্ধারিত পরিমাণ পরিবর্তন করে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

الطَّاعُونَ وَاجْتَنِبُوا اللَّهَ! اُعْبُدُوا اَنْ رَّسُولًا اُمَّةٍ كُلِّ فِي بَعَثْنَا وَلَقَدْ

‘আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং পরিহার কর তাগুতকে’ – (সূরা আন্-নাহল, ৩৬)।

اَسْتَمْسَكَ فَقَدِ يَاللَّهِ وَيُؤْمِنُ بِالطَّاعُونَ يَكْفُرُ فَمَنْ اَسْتَمْسَكَ فَقَدِ يَاللَّهِ وَيُؤْمِنُ بِالطَّاعُونَ يَكْفُرُ فَمَنْ اَسْتَمْسَكَ فَقَدِ يَاللَّهِ وَيُؤْمِنُ بِالطَّاعُونَ يَكْفُرُ فَمَنْ

‘অতএব, যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ’ – (সূরা আল বাকারা, ২৫৬)।

‘মজবুত রশি’ হলো, ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই’ এ সাক্ষ্য দেয়া। অর্থাৎ গায়রুল্লাহর জন্য সকল ইবাদত অস্বীকার করা এবং তা অদ্বিতীয় আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা। [আল জামেউল ফারীদ পৃ.৩৬৬] اَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ الَّذِينَ اِلَى تَرَّ اَلَمْ اَتَّبِعُوا اَتَّبِعُوا اَتَّبِعُوا اَتَّبِعُوا অতএব যদি কোনো শাসক কোরান-সুন্নাহয় থাকা বিধিবিধানের বিপরীতে কোনো বিধান প্রণয়ন করে, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা যা হারাম করেছেন তা হালাল বলে ঘোষণা করে, অথবা আল্লাহ তাআলা যা হালাল করেছেন তা হারাম বলে ঘোষণা করে, তবে সে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যাবে; কেননা সে তার উক্ত কর্মের দ্বারা এ বিশ্বাস প্রকাশ করল যে, মানুষের জন্য বিধান প্রণয়নের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়ত থেকে বের হয়ে যাওয়া তার অধিকারভুক্ত। অতএব যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস ধারণ করল সে কাফেরদের দলভুক্ত হল। [আল জামেউল ফারীদ পৃ.২৭৮]

তবে কোরান-সুন্নাহর অনুবর্তিতায় আইন ও বিধান প্রণয়ন করা, অথবা এমন আইন করা, যার ব্যাপারে কোরান-সুন্নাহ নীরব, অথবা আলেমদের মতানৈক্য আছে এমন হুকুম আহকাম আইন ও বিধান হিসেবে প্রণয়ন করা উল্লিখিত নীতিমালার আওয়াতাভুক্ত হবে না। অতএব মিনা-ব্যভিচার, সুদ ও যেসব বিষয় ইসলামী শরীয়তে হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই, তা বৈধ করে যদি কেউ আইন পাশ করে, তবে সে কাফের বলে গণ্য হবে। পাশাপাশি যারা এ ধরনের আইন প্রণয়নের পক্ষে সন্তুষ্টি ও রায় দিয়ে অংশ নেবে, তারাও

কাফের হয়ে যাবে। তবে যদি কেউ কোরান সুন্নাহয় অনুল্লিখিত কোনো আইন পাশ করে, যেমন ট্রাফিক আইন, দ্রব্যমূল্য-নিয়ন্ত্রণ আইন, তবে সে কাফের বলে গণ্য হবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কোরান-সুন্নাহ বিরোধী আইন ও বিধান প্রণয়ন-প্রবর্তনকারী তাগুতদের জন্য এ অধিকার স্বীকার করে নেবে যে, তারা কোরান-সুন্নাহ বিরোধী আইন ও বিধান প্রণয়ন-প্রবর্তন করতে পারে, এবং এ সব তাগুতদের নিয়ে সে সন্তুষ্টচিত্ত থাকে, তাদের কাছে বিচার ফয়সালার জন্য যায়, তাদের প্রণীত ইসলাম বিরোধী বিধানের শরণাপন্ন হয় তবে এরূপ ব্যক্তিরও কাফের বলে গণ্য হবে।

[বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় নেই। অতএব যেসব বিষয়ে শরয়ী বিধান রয়েছে সে সব বিষয়ে বিচার ফয়সালার জন্য একজন মুমিন অনিসলামী আদালতে যেতে পারবে না, যদি তার সামনে ইসলামী আদালতে যাওয়ার সুযোগ উন্মুক্ত থাকে। আর যদি সুযোগ না থাকে এবং বাধ্য হয়ে তাকে যেতে হয়, তবে সে কাফের বলে গণ্য হবে না। এটা হবে জান বাঁচানোর জন্য মৃতের গোশত প্রয়োজন মৃত্যুবক খাওয়ার মতো। আল্লাহ তাআলা বলেন: اسْتَطَعْتُمْ مَا أَلَّاهُ فَاتَّقُوا - 'অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর' - (সূরা আত-তাগাবুন:১৬)। সাথে-সাথে ঈমান ও কুফর সম্পর্কে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবাইকে সচেতন করে তোলা, ইহ-পরকালীন মুক্তির পথ কি তা সবার সামনে স্পষ্ট করে তোলা তথা কুরআন সুন্নাহ বিরোধী আইন ও বিধান প্রণয়নের প্রবণতা বিলুপ্ত করার জন্য বিশ্বময় চিন্তাগত ও ভাবগত আন্দোলন চালানো প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। যার যার অবস্থান থেকে, শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে, সাধ্যমতো সবাইকে এ দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। (অনুবাদক)]

ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, وَقَدْ الطَّاعُونَ إِلَى يَتَحَاكَمُوا أَنْ الشَّيْطَانُ وَيُرِيدُ بِهِ يَكْفُرُوا أَنْ أَمْرُوا 'তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবি করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার ওপর, যা নাজিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাজিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে' - (সূরা আন-নিসা, ৬০)।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, لَمْ مَا الَّذِينَ نَمِ لَهُمْ شَرَعُوا شُرَكَاءَ لَهُمْ أَمْ اللَّهُ بِهِ يَأْذَنُ 'নাকি তাদের রয়েছে অংশীদারবৃন্দ যারা তাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছে এমন দ্বীন যার অনুমতি আল্লাহ তাআলা দেননি' - (সূরা আশ-শূরা, ২১)।

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৬৪ : ঈমান নস্যাকারী বিষয়সমূহের প্রকার : চতুর্থ প্রকার

ঈমান নস্যাকারী বিষয়সমূহের প্রকার : চতুর্থ প্রকার

ঈমান নস্যাকারী চতুর্থ প্রকার বিষয়টি হলো, এমন কথা, কর্ম অথবা বিশ্বাস যা রিসালতকে আঘাত করে অথবা খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্বকে আঘাত করে। এরূপ কথা, কর্ম ও বিশ্বাস এ জন্য ঈমান নস্যাকারী যে তা 'মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল' এ সাক্ষ্যকে নস্যাক করে দেয়; কেননা এ সাক্ষ্যের অর্থ হলো- যা-কিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত, তা হক ও সত্য বলে বিশ্বাস করা। পাশাপাশি এ কথার প্রতিও বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলা রিসালত গ্রহণের জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বোচ্চ যোগ্যতায় ভূষিত করেছেন, তিনি তাঁকে এমন সব গুণবৈশিষ্ট্য দিয়েছেন যা তাঁকে পরিপূর্ণরূপে রিসালত পৌঁছে দিতে সমর্থ করবে। অতএব যে দুটি বিষয় এ সাক্ষ্যকে নস্যাক করে দেয় তা হলো,

প্রথমত : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্ব আঘাত করা।

দ্বিতীয়ত : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা-কিছুর সংবাদ দিয়েছেন, তা থেকে কোনো কিছু অস্বীকার করা। সে হিসেবে যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যবাদিতা, আমানতদারী, পুতপবিত্র চরিত্রের অধিকারী হওয়া, সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া ইত্যাদিতে আঘাত হানল, সে কাফের হয়ে গেল। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালাগাল করল, তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করল, অথবা তাঁর কোনো আচরণকে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করল, সে কাফের হবে গেল।

আর দ্বিতীয় বিষয়ের মধ্যে शामिल হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, তার কোনো একটি অস্বীকার করা। অতএব যেসব বিষয়ের সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত, তা যদি কেউ অস্বীকার করে তবে সে কাফের হয়ে যাবে। যেমন- পুনরুত্থান, হিসাব, মীযান, পুল সিরাত, জান্নাত ও জাহান্নামসহ অন্যান্য গায়েবি বিষয়, যা বিশুদ্ধ বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত। অতএব যে ব্যক্তি আল কোরান থেকে কিছু অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে; কারণ আল-কোরানের সকল আয়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সংবাদ আমাদের দিয়েছেন। অতএব যে ব্যক্তি আল-কোরানের কোনো কিছু অস্বীকার করে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর মিথ্যা আরোপ করবে। তদ্রূপভাবে আল কোরান ও সুন্নাহয় প্রতিষ্ঠিত কোনো হুকুমকে যে অস্বীকার করবে, সেও কাফের হয়ে যাবে। অতএব যে নামাজ, জাকাত ইত্যাদি ফরজ হওয়া, ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদি হারাম হওয়াকে অস্বীকার করবে, অথবা কোনো নামাজে এক রাকাত বাড়িয়ে দেওয়ার দাবি করবে, অথবা ওয়ু ছাড়াই নামাজ হয় বলে দাবি করবে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, যদি এমন কোনো বিষয় অস্বীকার করে, যা কেবল বিশেষজ্ঞ আলেমরাই জানে, সাধারণ মানুষ জানে না অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মধ্যে তা প্রসিদ্ধ নয়, তবে এতে কাফের হবে না। ইজতেহাদ-উদ্বৃত- অর্থাৎ যা কোরান-সুন্নাহর সরাসরি নস দ্বারা প্রমাণিত নয়, ইসলামী জ্ঞানগবেষণার নীতিমালা অনুসরণ করে আলেমগণ চিন্তাভাবনা করে বের করেছেন- এমন কোনো বিষয়কে অস্বীকার করলেও ব্যক্তি কাফের হবে না, যদি না তার ওপর ইজমায়ে উম্মত হয়ে থাকে।

ইমাম নববী র. বলেন, 'অনুরূপভাবে, দ্বীনের যেসব বিষয়ের ওপর উস্মাতের ইজমা হয়েছে (সকল উস্মাত একমত হয়েছে) যদি এরূপ বিষয়ের জ্ঞান জনসাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ থাকে, যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রমজানের রোজা, শরীর নাপাক হলে গোসল করা, ব্যভিচার, মদ, মাহরাম নারীদের বিবাহ করা হারাম হওয়া এবং এ জাতীয় অন্যান্য আহকাম অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে, যদি না সে নও-মুসলিম হয়ে থাকে, যে ইসলামের সীমানা সম্পর্কে এখানো সঠিক ধারণা অর্জন করতে পারেনি অতঃপর সে অজ্ঞতাবশত কোনো কিছু অস্বীকার করে বসেছে, এমতাবস্থায় সে কাফের হবে না। তবে উস্মাতের ইজমা-হওয়া বিষয়টির ইলম যদি আলেমদের বিশেষ মহলেই কেবল সীমিত থাকে যেমন কোনো নারীর সঙ্গে তার খালা ও ফুফুকেও বিবাহ করা, ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারী ব্যক্তির, নিহত ব্যক্তির সম্পদের ওয়ারিশ হতে না পারা, উত্তরাধিকারসূত্রেপ্রাপ্ত সম্পদে দাদীর অংশ এক-ষষ্ঠাংশ হওয়া ইত্যাদি। এসব বিষয় যে অস্বীকার করবে তাকে কাফের বলা হবে না, বরং তাকে মা'যুর মনে করা হবে; সাধারণ মানুষের পর্যায়ে এসব বিষয়ের জ্ঞান ব্যাপক নয়। [নববী প্রণীত সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যা ১/২০৫]

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল-কোরানের কোনো আয়াত অস্বীকার করবে, অথবা আল কোরান যেসব অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দিয়েছে, তা অস্বীকার করবে, অথবা আল-কোরানে থাকা অতীতের কোনো ঘটনার সংবাদ বা ভবিষ্যৎ বিষয়ে কোনো সংবাদকে অস্বীকার করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে আল্লাহ তাআলা নবি-রাসূল পাঠিয়েছিলেন, এ কথা যে অস্বীকার করবে, অথবা ওইসব নবি-রাসূলগণের যেসব কাহিনী আল-কোরানে উল্লিখিত হয়েছে, তা অস্বীকার করবে, সেও কাফের হয়ে যাবে। সৃষ্টির শুরু সম্পর্কে আল্লাহ যা-কিছু উল্লেখ করেছেন, তা যে অস্বীকার করবে, অথবা আল-কোরানের বর্ণনার বিপরীত কোনো বর্ণনায় বিশ্বাস করবে, সেও কাফের হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি জ্বিন, শয়তান ইত্যাদির অস্তিত্ব অস্বীকার করবে, আরশ-কুরসি-লাওহ-কলম যে অস্বীকার করবে এবং যে ব্যক্তি এমন ব্যক্তিকে অস্বীকার করবে যার কথা আল-কোরানে এসেছে, তাহলে সেও কাফের হয়ে যাবে। তদ্রূপভাবে আল-কোরানে বর্ণিত কোনো নবির অথবা কোনো রাসূলের রিসালত যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে, সেও কাফের হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি এমন কোনো কথা বলবে যা নবি-রাসূলগণের আল্লাহ কর্তৃক চয়নকৃত হওয়ার খেলাফ, অথবা বলবে যে আল্লাহ তাআলা যাদের নাম আল-কোরানে উল্লেখ করেছেন, তারা ছাড়া তিনি অন্যকোনো রাসূল পাঠাননি, তাহলে সেও কাফের হয়ে যাবে; কেননা আল্লাহ তাআলা আল-কোরানেই বলেছেন যে, তিনি যাদের নাম উল্লেখ করেছেন তারা ব্যতীত আরও রাসূল তিনি প্রেরণ করেছেন। তদ্রূপভাবে যে ব্যক্তি ইজায-অলৌকিকতা অস্বীকার করল, যা আল্লাহ তাআলার কথা দ্বারাই প্রমাণিত, সেও কাফের হয়ে গেল। একইভাবে যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর নবুওত দাবি করবে, অথবা কোনো নবুওতদাবিদারকে সত্য বলে জানবে, সেও কাফের হয়ে যাবে; কেননা আল কোরান দ্ব্যর্থহীনভাষায় বলেছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবি।

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৬৫ : কুফরের প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত হওয়া এবং ইসলামের প্রতি অসন্তুষ্টচিত্ত হওয়াও কুফরি

কুফরের প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত হওয়া এবং ইসলামে প্রতি অসন্তুষ্টচিত্ত হওয়াও কুফরি

শাহাদাতাইনের সঙ্গে সম্পৃক্ত যেসব বিষয়ের উদাহরণ ওপরে বর্ণিত হলো, তা কেবলই কয়েকটি নমুনা, এর সঙ্গে এ জাতীয় আরও বহু বিষয় যোগ করা সম্ভব। এখানে আরেকটি বিষয়ে আমি পাঠকমহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যা কেউ-কেউ উল্লিখিত ঈমান নস্যাকারী বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত বলে নাও ভাবতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা শাহাদাতাইনকে নস্যাকারী এবং এতে রয়েছে তওহীদ ও রিসালতের প্রতি অস্বীকৃতি। আর তা হলো কুফরের প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত হওয়া এবং ইসলামের প্রতি অসন্তুষ্টচিত্ত হওয়া। [মুল্লা আলী কারী: শারহুল ফিকহিল আকবার পৃ.১৫৬] অতএব যদি কেউ বলে, শাহাদাতাইন অস্বীকারকারীর কথা আমি মানি, অথবা বলে শাহাদাতাইন উচ্চারণকারীর কথা আমি মানি না, তাহলে এরূপ ব্যক্তির কাকের হয়ে যাওয়া সম্পর্কে কেউ সন্দেহ করবে না।

অনুরূপভাবে এমন অনেক কথা, কর্ম ও অবস্থা রয়েছে, যা শরীয়ত প্রবর্তকের রীতি, মানুষের রীতি এবং ভাষাগত রীতি অনুযায়ী (যে কুফরি করল, তাকে সত্য বলে জানি, আর যে ইসলাম গ্রহণ করল, তাকে মিথ্যা বলে জানি) এ কথার চাইতে কোনো অংশে কম কুফরিপূর্ণ নয়। ব্যক্তি যেভাবে কুফরের প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত হয় নাস্তিক, মুরতাদ, মুশরিক এদেরকে কাকের হিসেবে গণ্য না করা, অথবা এরা কাকের হলো কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ করা, অথবা এদের কোনো কুফরি মতবাদকে শুদ্ধ হিসেবে জানা। [আল জামেউল ফারীদ পৃ.২৭৭] অতএব যদি কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, মতবাদ, দল, সম্প্রদায়, ধর্মীয় গোষ্ঠী স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন কোনো কুফরিতে রয়েছে বলে নিশ্চিতরূপে জানা যায়, এরপর এদের কাকের হিসেবে বিশ্বাস না করা হয়, অথবা এদের মতবাদকে বিশুদ্ধ বলে জ্ঞান করা হয়, তাহলে এরূপ বিশ্বাসকারী ইসলাম থেকে বের হয়ে এদের কুফরিতে ঢুকে যাবে এবং এদের মতোই ঈমানহারা হয়ে যাবে। তবে এ নীতিটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরি এবং তা বিশ্লেষণ দাবি রাখে, আর তা হলো এই যে- যে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, মতবাদ, দল, সম্প্রদায়, ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে স্পষ্ট কুফরি রয়েছে, এদের কাকের হিসেবে আখ্যায়িত করার পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে, যেসব বিষয়ের বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তি-স্বীকৃতি একজন মানুষকে ইসলামের গন্ডিতে রাখে, সে সব বিষয় সম্পর্কে এদের প্রকৃত ধারণা আছে কি না। যদি না থাকে তাহলে প্রথমেই এদের কাকের-মুরতাদ বলে ঘোষণা করা বৈধ হবে না। বরং এরা যেসব বিষয়ে অজ্ঞ সে সব বিষয়, বয়ান-বিশ্লেষণের যথার্থ পথ-পদ্ধতি ব্যবহার করে এমনভাবে বুঝতে হবে, যাতে এদের সকল সন্দেহ-সংশয় দূর হয়ে যায়। এর পরেও যদি এরা ফিরে না আসে, তবে অবশ্যই এদের কাকের-মুরতাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা আবশ্যিক হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি এদের কাকের-মুরতাদ হওয়াকে অস্বীকার করবে, সেও এদের দলভুক্ত হবে; কারণ এদের কাকের-মুরতাদ না বলার অর্থ এদের চিন্তাধারা, মতাদর্শ আপন করে নেয়া, তা শুদ্ধ বলে স্বীকার করা।

অবশ্য যেসব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কুফরি সবার কাছে জানা, যেমন ইহুদি, নাসারা ও অগ্নিপূজারী সম্প্রদায়- এদের শুরুতেই কাকের হিসেবে গণ্য করতে হবে। অতএব যে ব্যক্তি শুরু থেকেই এদের কাকের বলবে না সেও কাকের হয়ে যাবে। [ইহুদি নাসারারা 'কাকের'। তবে তাদের মধ্যে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার সময়, তাদের ধর্মীয় বা জাতীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে সম্বোধন করা বাঞ্ছনীয়। যেমন, 'আহলে কিতাব' 'বনী ইসরাঈল' ইত্যাদি। আল কুরআনের দাওয়াতি খেতাবগুলো এ কথাই নির্দেশ করে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

نَعْبُدُ إِلَّا وَبَيْنَكُمْ بَيْنُنَا سَوَاءٌ كَلِمَةٍ إِلَى تَعَالَوْا الْكِتَابَ أَهْلُ يَا قُلْ
فَإِنَّ اللَّهَ دُونَ مِنْ أَرْبَابًا بَعْضًا بَعْضًا يَتَّخِذُ وَلَا شَيْئًا بِهِ نُشْرِكُ وَلَا لِلَّهِ إِلَّا
مُسْلِمُونَ بَأْنَا أَشْهَدُوا فَقُولُوا تَوَلَّوْا

‘বল, ‘হে কিতাবীগণ, তোমরা এমন কথার দিকে আস, যেটি আমাদের মধ্যে ও
তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা একমাত্র আল-াহ ছাড়া কারো ইবাদত না করি। আর
তার সাথে কোন কিছুকে
শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ছাড়া রব হিসাবে গ্রহণ না করি’।
তারপর যদি তারা বিমুখ হয় তবে বল, ‘তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা
মুসলিম’ - (সূরা আলে ইমরান: ৬৪)। (অনুবাদক)] পক্ষান্তরে অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠী ও
সম্প্রদায়, যারা এত বেশি প্রসিদ্ধ নয়, এবং যাদের চিন্তা-চেতনা ও মতাদর্শে কুফরের কি
কি অনুশঙ্গ আছে তা ভালো করে জানা নেই, তাদের কাফের বলার ক্ষেত্রে সময় নিতে
হবে, তাদের কুফরের বিষয়গুলোর ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে সে ব্যাপারে তাদের বুঝাতে হবে।
তাদের সন্দেহ সংশয় দূর করতে হবে। [মাজমুআতুত তাওহিদ, পৃ: ১২৬] বিশেষ করে এ
সব ধর্মীয় গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদেরকে ইসলামের নামেই প্রচার করে থাকে,
জনসাধারণের সামনে তারা এমন ভান ধরে যে, ইসলামের কোনো কিছুই তারা অস্বীকার
করে না, তারা ওইসব বিষয় গোপন রাখে যেগুলো মানুষকে তাদের থেকে সরিয়ে দেবে-
যাতে রয়েছে ইসলামী মতাদর্শে ও বিশ্বাসের স্পষ্ট অস্বীকৃতি। অনুরূপভাবে এই প্রকৃতির
মানুষদের কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করার জন্য প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে যে, তাদের
কুফরিটা এমন বিষয়ে, যার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য সকল মুসলিম আলেমই একমত। অতএব
যদি তাদের কুফরিটা এমন বিষয়ে হয়, যা আলেমদের কেউ কেউ ঈমান নস্যাকারী বলে
গণ্য করেন, আবার কেউ কেউ করেন না, তাহলে তাদের কাফের বলা বৈধ হবে না।
যেমন খারেজী সম্প্রদায় ও অন্যান্য কিছু সম্প্রদায়কে কাফের বলার ব্যাপারে আলেমগণ
একমত নন। এর মধ্যে शामिल হবে ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ তরককারীর বিষয়টি, নামাজ যে
একটি ফরজ আমল এ ব্যাপারে যদি তার বিশ্বাস থাকে। এ প্রকৃতির ব্যক্তি কাফের কি না,
সে ব্যাপারে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন। অতএব খারেজী ও অন্যান্য সম্প্রদায় যাদের
কাফের হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন এবং নামাজ তরককারী ব্যক্তিকে যদি
কেউ কাফের না বলে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে না। আর যদি উল্লেখিত শর্তসমূহ
পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায় এবং কোনো মুসলমান কাফেরদের কাফের বলতে অস্বীকৃতি জানায়,
তারা যেসব বাতিল আকীদা বিশ্বাসে রয়েছে যেগুলো সে শুদ্ধ বলে মনে করে, তবে সে ওই
কাফেরের মতোই হয়ে গেল, যে অন্তরে বিশ্বাস করে মুখে কুফরি বাক্য উচ্চারণ করল।
অতঃপর সে শাহাদাতাইনকে নস্যাক করে দিল। অন্যদিকে সে কোরান সুন্নাহর ওইসব
বানীকেও অস্বীকার করল যেগুলো ওইসব লোকদের কাফের বলে আখ্যায়িত করেছে। অতএব
সে এ কারণেও কাফের হয়ে গেল।

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৬৬ : কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং তাদের ধর্মের প্রতি সম্মতিপ্তাপন

কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং তাদের ধর্মের প্রতি সম্মতিপ্তাপন

আমরা জেনেছি যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কোনোরূপ ইবাদত অর্পণ করব না, এ কথার স্বীকারোক্তি প্রদান। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র এ অর্থনির্দেশের তাগিদ আমরা অন্য একটি আয়াতেও পাই। তা হলো আল্লাহ তাআলার বাণী-

الطَّاعُونَ وَاجْتَنِبُوا اللَّهَ أَعْبُدُوا أَنْ
পরিহার কর তাগুতকে' - (সূরা আন-নাহল, ৩৬)।

এ আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই' - এ সাক্ষ্য ততক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে না, যতক্ষণ না আল্লাহর ইবাদত করার পাশাপাশি অন্যান্যদের ইবাদত পরিহার করা হবে, অন্যকোনো মাথলুক কোনো প্রকার ইবাদত পেতে পারে তা অস্বীকার করা হবে। এ বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ, তর্কাতীত। এ ক্ষেত্রে আরেকটি তর্কাতীত বিষয় হলো, কাফেরদের প্রকাশ্যতম বৈশিষ্ট্য হলো- তারা আল্লাহ তাআলাকে যেভাবে ইবাদত করা উচিত সেভাবে ইবাদত করে না। অথবা তারা আল্লাহর ইবাদত করার ক্ষেত্রে, আল্লাহর সঙ্গে অন্যদের ইবাদতকেও শরীক করে। এর ওপর তারা রিসালাতকেও অস্বীকার করতে পারে, রাসুলের ব্যক্তিত্বে আঘাত হানে এমন কথা ও আচরণ প্রকাশ করতে পারে, যা ইসলামের বিপরীত, শহাদাতাইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এ দুটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় সামনে রেখে, শাহাদাতাইনের দাবি মোতাবেক, যারা আল্লাহর শত্রু, আল্লাহর দ্বীনের শত্রু- যেমন কাফের, মুশরিক ও মুর্তাদ - এদের সঙ্গে একজন মুসলিম কী ধরনের সম্পর্ক রাখবে, এদের সঙ্গে সম্পর্ক চর্চার সর্বশেষ সীমানা কী, যা অতিক্রম করলে একজন মুসলমানের ঈমান বিপর্যস্ত হয়ে যাবে, কুফরের ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করা হবে, তা নির্ণয় করা যাবে। আর যে সীমানার মধ্যে অবস্থান করলে ব্যক্তি যে কুফরের সন্তুষ্টিচিহ্ন নয়, তা বোঝা যাবে। আর যদি মুসলমান, এ সীমানা অতিক্রম করে কাফেরদের আনুগত্যের বলয়ে ঢুকে যায়, তাদের বাতিল দ্বীনের ওপর সম্মতি প্রকাশ করে, তাদের বাতিল দ্বীনের ব্যাপারে অর্থ, সমর্থন ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করে, তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সম্পর্ক কয়েম করে, মুসলমানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছেড়ে দেয়, কাফেরদের সঙ্গে সম্পর্কে মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্কের চাইতে অধিক মর্যাদা দেয়, কাফেরদের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্য মুসলমানদের সঙ্গে থাকা সম্পর্কে জলাঞ্জলি দেয়, তাহলে সে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে, মুর্তাদ বনে তাদের দলভুক্ত হয়ে যায় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে ঘোর শত্রুতাকারী কাফেরে পরিণত হয়। ব্যতিক্রম শুধু ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যে এরূপ করতে বাধ্য হয়েছে, অর্থাৎ যে কাফেরদের আধিপত্যের আওতায় বসবাস করে, যারা তাকে তাদের বাতিলের আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়, আনুগত্যে অস্বীকৃতি জানালে তাকে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয় অথবা তাকে নানারূপ শাস্তিতে নিপতিত করে। যদি অবস্থা এই হয়, তাহলে অন্তরে ঈমানের দৃঢ়তা বজায় রেখে কেবল ওপরে ওপরে সম্মতি প্রকাশ করা বৈধ রয়েছে। কাফেরদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব না রাখার বিষয়টি শাহাদাতাইনের অর্থভুক্ত হওয়ার পাশাপাশি এ ব্যাপারে বহু আয়াত রয়েছে, যা কাফেরদের সঙ্গে এ জাতীয় সম্পর্ক চর্চা না-করাকে ফরজ করে, তাদের ধর্মে সম্মতিপ্তাপনমূলক যে কোনো পদক্ষেপ থেকে শতক্রোশ দূরে থাকতে নির্দেশ দেয়। শুধু তাই নয়, বরং কিছু আয়াতের আপাত-অর্থ কাফেরদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব চর্চাকারী ব্যক্তি কাফের ও মুর্তাদ হয়ে যাওয়ার কথা বলে। যদি শাহাদাতাইনের অর্থ ও এ আয়াতসমূহের ভাষ্য একত্র করা হয়, তাহলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এরূপ ব্যক্তি কাফের-মুর্তাদ হয়ে যাওয়া প্রকৃত অর্থেই, এ ক্ষেত্রে কোনো তাবিল বা দূর ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। নিচে, এ সংক্রান্ত আল-কোরানের কয়েকটি আয়াত ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করছি,

ক-আল্লাহ তাআলা বলেন, *دُونَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْكَافِرِينَ الْمُؤْمِنُونَ يَتَّخِذُ لَا مِنْهُمْ تَتَّقُوا أَنْ إِلَّا شَيْءٍ فِي اللَّهِ مَنْ فَلَيْسَ ذَلِكَ يَفْعَلُ وَمَنْ الْمُؤْمِنِينَ ثَقَاةٌ* 'মুমিনরা যেন মুমিনদের ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধু না বানায়। আর যে কেউ এরূপ করবে, আল্লাহর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে যদি তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকে' - (সূরা আলে ইমরান, ২৮)। মুমিনদের ছাড়া কাফিরদের অন্তরঙ্গ বন্ধু, সঙ্গী-সাথী না-বানানোর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে নিষেধাঙ্গা দিয়েছেন। যারা এ নিষেধাঙ্গা অমান্য করে তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু, সঙ্গী-সাথী হিসেবে গ্রহণ করবে, আল্লাহর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না বলে এ আয়াতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। ইমাম তাবারী র. 'মুমিনরা যেন মুমিনদের ছাড়া কাফিরদের বন্ধু না বানায়' -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'এর অর্থ হলো, হে মুমিন সকল, তোমরা কাফিরদের সাহায্য-সহযোগিতাকারীরূপে গ্রহণ করো না, যাদের সঙ্গে তাদের দ্বীনের ইস্যুতে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব রাখবে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যাদের সাহায্য করবে, যাদের কাছে মুসলমানদের গোপন বিষয়গুলো বলে দেবে। যে এরূপ করবে আল্লাহর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এ ব্যক্তির দায়দায়িত্ব থেকে পবিত্রতা ঘোষণা করলেন এবং এ ব্যক্তিও আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলল, সে ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেল এবং কুফরিতে প্রবেশ করল।' [তাফসিরে তাবারী ৬/৩১৩ [অনুবাদকের টিকা) - ইমাম তাবারীর ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, যে প্রকৃতির বন্ধুত্ব নিষেধ করা হয়েছে, তা হলো অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব যাতে থাকে ইসলামের বিরুদ্ধে গিয়ে হলেও বন্ধুর মর্জিকে প্রাধান্য দেয়া, বন্ধুর কাছে মুসলমানদের গোপন বিষয়গুলো বলে দেয়া। এ প্রকৃতির সম্পর্কেই 'ওয়ালা' বলা হয়। এর বিপরীতে যারা ইসলাম বিদ্রোহী বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত নয় এমন অমুসলিমদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করার অনুমতি রয়েছে যাকে আল কুরআনে 'বির' বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

مَلِ الَّذِينَ عَنْ اللَّهِ يَنْهَائُمْ لَا وَتَقَسَّطُوا تَبَرُّوهُمْ أَنْ دِيَارَكُمْ مِنْ يُخْرِجُوكُمْ وَلَمْ الَّذِينَ فِي يُقَاتِلُوكُمْ فِي قَاتِلُوكُمْ الَّذِينَ عَنْ اللَّهِ يَنْهَائُمْ إِنَّمَا . الْمُفْسِطِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنْ إِلَيْهِمْ وَمَنْ تَوَلَّوْهُمْ أَنْ إِخْرَاجَكُمْ عَلَى هَرَوَاوْطَ دِيَارَكُمْ مِنْ وَأَخْرَجُوكُمْ الَّذِينَ الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ يَتَوَلَّوْهُمْ

দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ী-ঘর থেকে বের করে দিয়েছে ও তোমাদেরকে বের করে দেয়ার ব্যাপারে সহায়তা করেছে। আর যারা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, তারাই তো 'যালিম' - (সূরা আল মুমতাহিনা: ৮-৯)।

অমুসলিমদের সঙ্গে আরেক প্রকার সম্পর্ক হলো দাওয়াত ও নসীহতকেন্দ্রিক সম্পর্ক, যার উদ্দেশ্য তাবলীগে দ্বীন ও মানুশের ওপর আল্লাহর হুকুম (প্রমাণ) প্রতিষ্ঠা করা, যা সকল নবি রাসূলের দায়িত্ব ছিল এবং প্রত্যেকেই যার যার কাওমকে বলেছেন- *رِسَالَاتٍ أَبْلَغُكُمْ* 'আমি তোমাদের নিকট পৌঁছাচ্ছি আমার রবের রিসালাতসমূহ এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করছি। (সূরা আল আরাক: ৬২)।

(অনুবাদক)] আর আল্লাহ তাআলার বাণী, 'তবে যদি তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের কোনো ভয়ের আশঙ্কা থাকে' - এর ব্যাখ্যা আমরা অন্য একটি আয়াতাংশ থেকে আরও স্পষ্টরূপে বুঝতে পারি। আর তা হলো

‘তবে যাকে বাধ্য করা হয় (কুফরি করতে) অথচ তার অন্তর থাকে ঈমানে পরিতৃপ্ত।’ [সূরা আন-নাহল: ১০৬]

অর্থাৎ মুসলমান যদি তাদের দ্বারা দমিত থাকে এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদে অপারগ থাকে, তাহলে তাদের সঙ্গে আপাত-আচরণে বৈরিতা প্রকাশ করবে না, তবে হৃদয়ের গভীরে জাগ্রত রাখবে আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আর কুফরি ও আল্লাহর শত্রুদের জন্য পরিপূর্ণ ঘৃণা ও বৈরিতা। ইমাম ইবনে জারীর আত-তাবারী বলেন, ‘তবে যদি তোমরা ভয় কর এবং অন্তরে তাদের জন্য বৈরিতা রাখ, তারা যে কুফরিতে আছে, তার সঙ্গে তাল না-মিলাও, এবং তারা যদি মুসলমানের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করে তবে তাদের সাহায্য না করা।’ [তাফসিরে তাবারী ৬/৩১৩] কি পরিমাণ বাধ্য হলে তাদের সঙ্গে তাল মেলানো যাবে, এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে আসছে, ইনশাআল্লাহ।

খ-আল্লাহ তাআলা বলেন, الْيَهُودَ تَتَّخِذُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أُيُّهَا يَا مِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ يَتَوَلَّوْهُمْ وَمِنْ بَعْضِ أَوْلِيَاءِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ وَالنَّصَارَى مَرْضُ قُلُوبِهِمْ فِي الَّذِينَ فَتَرَى. الظَّالِمِينَ الْقَوْمَ يَهْدِي لَا اللَّهُ إِنَّ يَأْتِي أَنْ اللَّهَ فَعَسَى ذَائِرَةٌ تُصِيبُنَا أَنْ نَخْشَى يَقُولُونَ فِيهِمْ يُسَارِعُونَ نَادِمِينَ أَنْفُسِهِمْ فِي أَسْرُوا مَا عَلَى فَيُصِخُّوا عِنْدَهُ مِنْ أَمْرٍ أَوْ يَالْفَجَحِ

হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদি ও

নাসারাদেরকে তোমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের অন্তরঙ্গ বন্ধু, আর তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ জালেম কাওমকে হিদায়েত দেন না। সুতরাং তুমি দেখতে পাবে, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা কাফেরদের মধ্যে (বন্ধুত্বের জন্য) ছুটছে। তারা বলে, ‘আমরা আশঙ্কা করছি যে, কোনো বিপদ আমাদেরকে আক্রান্ত করবে। অতঃপর হতে পারে আল্লাহ দান করবেন বিজয় কিংবা তাঁর পক্ষ থেকে এমন কিছু, যার ফলে তারা তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছে, তাতে লজ্জিত হবে’ - (সূরা আল মায়েদা, ৫১-৫২)।

এখানে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট বলেছেন যে, আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান রাখা, কাফেরদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করার সঙ্গে জড়িত। অতএব, যদি কাফেরদের সঙ্গে কারও অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব প্রমাণিত হয়, তবে তা ঈমানকে অবশ্যই নস্যাত করে দেবে; কেননা কাফেরদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব না-রাখা ঈমানের একটি আবশ্যিক দাবি। যদি এ দাবি অনুযায়ী আমল না করা হয় তবে মূল ঈমানই নস্যাত হয়ে যায়। উপরন্তু, যে ব্যক্তি কাফেরদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব রাখে, সে আল্লাহ তাআলার রাগ-রোষের পাত্র এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামি বনে যায় বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, কোনো মুমিন থেকে এ ধরনের আচরণ প্রকাশ পেতে পারে না, মুমিন ব্যক্তি বরং আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে শত্রুতা রাখে, বন্ধুত্ব রাখে না। এরপর দেখুন, আল্লাহ তাআলা কীভাবে কাফেরদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব না-রাখাকে শাহাদাতাইনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তিনি এটাকে আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও তাঁর ওপর যা নাজিল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান বলে আখ্যায়িত করেছেন। কাফেরদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব রাখা ও তাদের দ্বীনে সম্মতি জ্ঞাপন বিষয়ক যে নীতিমালা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, তা আল-কোরানের এ বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করে।

গ-আল্লাহ তাআলা বলেন, الَّذِينَ . أَلِيمًا عَذَابًا لَهُمْ بِأَنَّ الْمُتَنَافِقِينَ بَشَرٌ الْعِزَّةُ عِنْدَهُمْ أَيْبَتُغُونَ الْمُؤْمِنِينَ دُونَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْكَافِرِينَ يَتَّخِذُونَ جَمِيعًا اللَّهُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ

মুনাফিকদের সুসংবাদ দাও যে, নিশ্চয়

তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব। যারা মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে অন্তরঙ্গ

বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে সম্মান চায়? অথচ যাবতীয় সম্মান আল্লাহর' - (সূরা আন-নিসা, ১৩৮-১৩৯)।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন, এমন কোনো মুমিন থাকতে পারে না, যে কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, যদি করে তবে সে কাফের, মুমিন নয়। আল্লাহ তাআলা যদি ইসলামদ্রোহী কাফের পিতা, ভাই, ও স্বগোত্রের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে জড়িত ব্যক্তির ঈমানকে নাকচ করে দেন, তাহলে দূরবর্তী কাফেরদের সঙ্গে এরূপ সম্পর্কে জড়িত ব্যক্তির ঈমান নাকচ হওয়ার ব্যাপারে আদৌ সন্দেহ থাকতে পারে না।

ঘ-আল্লাহ তাআলা বলেন, مَا بَعْدَ مِنْ أَذْبَارِهِمْ عَلَىٰ اَرْتُدُّوا اِلَيْهِمْ اِنْ قَالُوا هُمْ بِاَنَّ ذٰلِكَ . لَهُمْ وَاَمَلَىٰ لَهُمْ سَوَّلَ الشَّيْطَانُ الْهُدَىٰ لَهُمْ تَبَيَّنَ . اِسْرَارُهُمْ يَعْلَمُ وَاللّٰهُ الْاَمْرَ بَعْضُ فِي سَنُطِيعُكُمْ اَللّٰهُ نَزَلَ مَا كَرِهُوا لِلَّذِينَ بَاْنَهُمْ ذٰلِكَ . وَاَذْبَارُهُمْ وُجُوْهُهُمْ يَضْرِبُوْنَ الْمَلَائِكَةَ تَوَفَّتْهُمْ اِذَا فَكَيْفَ اَعْمَالُهُمْ فَاَحْبَطَ رِضْوَانَهُ وَكَرِهُوا اَللّٰهُ اَسْحَطَ مَا اتَّبَعُوا

‘নিশ্চয় যারা হিদায়েতের পথ সুস্পষ্ট

হওয়ার পর তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক মুখ ফিরিয়ে নেয়, শয়তান তাদের কাজকে চমৎকৃত করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দিয়ে থাকে। এটি এ জন্য যে, আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা তারা অপছন্দ করে। তাদের উদ্দেশ্যে, তারা বলে, ‘অচিরেই আমরা কতিপয় বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব’। আল্লাহ তাদের গোপনীয়তা সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন’ - (সূরা মুহাম্মাদ, ২৫-২৬)।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা যাদের মুরতাদ হওয়ার ঘোষণা করেছেন, তাদের মুরতাদ হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তাদের এ কথা যে, ‘অচিরেই আমরা কতিপয় বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব’। অতএব এরূপ কথা যে বলল এবং কিছু বিষয়ে কাফেরদের আনুগত্যের ওয়াদা দিল, হিদায়েত ও সত্য ধারণ করে থাকার দাবি সত্ত্বেও তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল।

ঙ-আল্লাহ তাআলা বলেন, اٰیٰتٍ سَمِعْتُمْ اِذَا اَنَّ الْكِتٰبِ فِي عَلَیْكُمْ نَزَلَ وَقَدْ حَدِیْثٍ فِي يَخُوْضُوْا حَتّٰی مَعَهُمْ تَقْعُدُوْا فَلَا بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا يُكْفَرُ اَللّٰهُ مِثْلُهُمْ اِذَا اِنَّكُمْ غَيْرِهِ

আর তিনি তো কিতাবে তোমাদের প্রতি

নাজিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং সেগুলো নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, তাহলে তোমরা তাদের সঙ্গে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় নিবিষ্ট হয়, তা না হলে তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফেক ও কাফেরদের সকলকে জাহান্নামে একত্রকারী।’ - (সূরা আন-নিসা, ১৪০)।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন, মুমিনরা যখন শোনে- আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে, সেগুলো নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, তখন তারা তাদের সঙ্গে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় নিবিষ্ট হয়। আর যদি বসে, তাহলে তারা তাদের মতোই হয়ে যাবে। অতএব একজন মুমিনকে এ ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে, যেসব মজলিসে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করার কার্যক্রম চলে, আল্লাহর আয়াতসমূহ উপহাসের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়, সে সব মজলিসে একজন মুমিন কখনো বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য প্রসঙ্গে আলাপচারিতায় নিবিষ্ট হয়।

কাফেরদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব রাখা বলতে যা বুঝায়

কাফের মুশরিকদের সঙ্গে যারা অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখে, তারা যে মুরতাদ হয়ে যায়, উল্লিখিত আয়াতগুলোর প্রত্যেকটিই এ কথা নির্দেশ করছে। আর যদি সবগুলো আয়াত একত্র করা হয় এবং এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আয়াতও উল্লেখ করা হয়, তাহলে কাফেরদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের বিষয়টি যে শাহাদাতাইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, তা অধিক মাত্রায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদি কেউ প্রশ্ন করে বলে, মুওয়ালাত বলতে যা বুঝায়, তা অনির্দিষ্ট, এর মধ্যে অনেক কিছুই প্রবেশ করতে পারে, অতএব আমরা- কে কুফরি করল আর কে করল না, তা নির্ণয়ের জন্য বিষয়টিকে মানদণ্ড হিসেবে দাঁড় করাতে পারি না; বিশেষ করে, আল্লাহ তাআলা এমন কোনো বিষয়ের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দেন না, যা অনির্দিষ্ট এবং যার সীমানা নির্ধারণ করে স্পষ্টরূপে জানা সম্ভব নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন কোনো বিষয়ে প্রবেশ করবে, যা অস্পষ্ট, অবিশ্লিষ্ট, সে ব্যক্তি মুরতাদ হয়েছে বলে ধারণা করা যাবে না। অন্যথায় আল্লাহর আদেশ-নিষেধ এক প্রকার ক্রীড়ায় পরিণত হবে, যা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। আসলে আল্লাহর ও তাঁর গুণাবলির প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তি এ কথা কখনো বলতে পারে না; কেননা মুওয়ালাতের সুনির্দিষ্ট অর্থ ও ভাব আছে, যা বুঝা কঠিন কিছু নয়।

তাহলে আসুন, মুওয়ালাত-এর অর্থ কি, তা সুনির্দিষ্টভাবে বুঝে নেই। موالاة

(মুওয়ালাত) শব্দটি (ولاء) থেকে উৎকলিত। যার অর্থ হলো والتقرب الدنو
'ঘনিষ্ঠ হওয়া ও নৈকট্য অর্জন করা। আদাওয়াত তথা শত্রুতার বিপরীত শব্দ বিলায়াত তথা বন্ধুত্ব। ওলী হলো 'আদুউ (শত্রু) এর বিপরীত শব্দ। মুমিনরা হলো রহমানের ওলীবন্দ আর কাফেররা হলো তাগুত ও শয়তানের ওলীবন্দ; কেননা প্রথম দল ইবাদত-আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটতা অর্জন করে, এবং দ্বিতীয় দল আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে চলে গিয়ে, আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়ে এবং শয়তানের আনুগত্য করে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়। অতএব বুঝা গেল, কাফেরদের সঙ্গে মুওয়ালাত বলতে বুঝাবে, তাদের নৈকট্য অর্জন, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরোধিতাকারী তাদের জন্য হৃদয়তা প্রকাশ করা - কথায়, কাজে ও মনোবৃত্তিতে। আল-কোরানের বহু আয়াতে এ প্রকার বহু বিষয়ের কথা রয়েছে যা মানুষকে কাফেরদের সঙ্গে মুওয়ালাতের সম্পর্কে প্রবেশ করিয়ে দেয়। যেমন,

এক. কাফেরদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করা, যা আল্লাহ তাআলা নিষিদ্ধ করেছেন।
ইরশাদ হয়েছে,

حَتَّى النَّصَارَى وَلَا الْيَهُودَ عَنْكَ تَرْضَى وَلَنْ
الَّذِي بَعْدَ أَهْوَاءِهِمْ أَتَّبَعْتُ وَلَيْنَ الْهُدَى هُوَ اللَّهُ هُدًى إِنَّ قُلْ مِلَّتُهُمْ تَتَّبِعُ
'نَصِيرٍ وَلَا وَلِيٍّ مِنْ اللَّهِ مِنْ لَكَ مَا الْعِلْمُ مِنْ جَاءَكَ
আর ইহুদি ও নাসারারা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট

হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ কর। বল, 'নিশ্চয় আল্লাহর হিদায়েতই হিদায়েত' আর যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তারপর, তাহলে আল্লাহর বিপরীতে তোমার কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না' - (সূরা আল বাকারা, ১২০)।

দুই. তাদের আদেশ-নির্দেশের আনুগত্য করা। ইরশাদ হয়েছে,

طِيعُوا إِنْ أَمَرُوا الَّذِينَ أُيُّهَا يَا
'خَاسِرِينَ فَتَثْقَلُوا أَعْقَابَكُمْ عَلَىٰ مِرْدُوكٍ كَفَرُوا الَّذِينَ

হে মুমিনগণ, যদি তোমরা কাফেরদের আনুগত্য কর, তারা তোমাদেরকে তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরে যাবে’ - (সূরা আলে ইমরান, ১৪৯)।

ذِكْرِنَا عَنْ قَلْبِهِ أَغْفَلْنَا مَنْ تُطِيعُ وَلَا
فُرْطًا أَمْرُهُ وَكَانَ هَوَاهُ وَاتَّبَعَ
আর ওই ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার অন্তরকে আমি আমার যিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে’ - (সূরা আল কাহফ, ২৮)।

أُولِيَائِهِمْ إِلَى لِيُؤْخُونَ الشَّيَاطِينَ وَإِنْ
لَمْ تُشْرِكُوا إِنَّكُمْ أَطَعْتُمُوهُمْ وَإِنْ لِيُجَادِلُوكُمْ
এবং শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্ররোচনা দেয়, যাতে তারা তোমাদের সঙ্গে বিবাদ করে। আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে নিশ্চয় তোমরা মুশরিক’ - (সূরা আল আনআম, ১২১)।

فَتَمَسَّكُمُ ظَلُمُوا الَّذِينَ إِلَى تَرْكُوا وَلَا
النَّارِ
আর যারা জুলুম করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না; অন্যথায় আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে’ - (সূরা হুদ, ১১৩)।

ثُمَّ لَوْ وَدُّوا
তুমি তোমাদের জন্য তোষামোদ-খোশামোদ প্রদর্শন। ইরশাদ হয়েছে, ‘তারা কামনা করে, যদি তুমি তোষামোদকারী হও, তবে তারাও তোষামোদকারী হবে’ - (সূরা আল কালাম, ৯)।

চার. তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরোধিতাকারী তাদের জন্য হৃদয়তা প্রকাশ করা। ইরশাদ হয়েছে,

وَالْيَوْمَ بِاللهِ يُؤْمِنُونَ قَوْمًا تَجِدُ لَا
أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبَاءَهُمْ أَنْوَكَ وَلَوْ وَرَسُولَهُ اللهُ حَدَّ مَنْ يُؤَادُّونَ الْآخِرِ
. عَشِيرَتَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ

যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে তুমি এমন জাতিকে পাবে না এমন লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরোধিতা করে, যদি সেই বিরুদ্ধবাদীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয় তবুও’ - (সূরা আল মুজাদালা, ২২)।

উল্লিখিত বিষয়গুলোর সঙ্গে যুক্ত হবে, কাফেরদের শ্রদ্ধা দেখানো, বিশেষ করে যদি তারা শাসক হয়; মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের পরামর্শ নেওয়া; মুমিনদের রেখে একান্ত পরামর্শদাতা হিসেবে কাফেরদের চয়ন করা; জুলুম অন্যায়ে কাফেরদের সহায়তা করা; কাফেরদের কাজকর্ম, আদত-অভ্যাসের সাদৃশ্য অবলম্বন করা; জীবনের বিভিন্ন ময়দানে কাফেরদের অনুকরণ-অনুসরণ করা এবং তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করার জন্য জাতিকে উৎসাহিত করা, কখনো প্রলোভন এবং কখনো ভয়ভীতি দেখানোর মাধ্যমে; কাফেরদের আইন ও বিধান পন্থা-পদ্ধতি প্রশাসন পরিচালনা ও শিক্ষা-ক্ষেত্রে আমদানি করা। এর মধ্যে আরও शामिल হবে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে কাফেরদের সহায়তা দেওয়া; তাদের মুসলিম বিদ্বেশী পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন করা, তাদের স্বার্থে গুপ্তচরবৃত্তি করা, মুসলিম জাতির গোপন বিষয়গুলো তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায় কাফেরদের সঙ্গ দেওয়া। এর মধ্যে আরও शामिल রয়েছে, কাফেরদের বিশ্বস্ত মনে করা, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর দায়িত্ব তাদের হাতে ন্যস্ত করা, বিশেষ করে সামরিক বাহিনী ও জনসাধার্মূলক অন্যান্য প্রশাসনিক বিভাগসমূহে। কাফেরদের চিন্তাধারা, পথ-পদ্ধতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি উত্তম মনে করা এবং তার প্রতি মানুষদের আহবান জানানো, কাফেরদের জ্ঞানীদের মুসলমানদের জ্ঞানীদের ওপর প্রাধান্য

দেওয়া। অতএব, যে ব্যক্তির মধ্যে উল্লিখিত সকল বিষয় অথবা কিছু বিষয় একত্র হল
এবং তা তার অভ্যাস ও চরিত্রে পরিণত হল, তাহলে সে কাফেরদের কুফরিতে সন্তুষ্টচিত্ত
থাকার দলিল পেশ করল, অতঃপর সে তাদের মতো হয়ে গেল, বরং তাদের দলভুক্ত
হলো। তাওয়া করে ঈমান নবায়ন করা এবং কাফেরদের সঙ্গে মুওয়ালাতের সম্পর্ক পরিত্যাগ
করা ছাড়া এই কুফরি থেকে সে মুক্ত হতে পারবে না।

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৬৮ : কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ও
অগ্রহণযোগ্য ওজর
priyo.Islam
০৭ মার্চ ২০১৪, সময় - ০৪:৫২

কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য ওজর
কাফেরদের সঙ্গে মুওয়ালাতের সম্পর্ক চর্চাকারীদের কেউ কেউ এই ওয়র পেশ করতে পারে
যে, কাফেরদের সঙ্গে এ ধরনের সম্পর্ক বজায় না রাখলে, তারা ক্ষমতাচ্যুত হবে,
অর্থসম্পদ, পদমর্যাদা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হবে। এ জাতীয় ওয়র পেশ করা অসিদ্ধ,
আল্লাহর কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এ জাতীয় আশঙ্কার কারণে তাদের মায়ুর মনে
করা হবে না। তা বরং শয়তানের কুমন্ত্রণা যা সে শোভিত করে কারও অন্তরে ঢুকিয়ে
দেয়, তা বরং দুনিয়াপ্রেম এবং দুনিয়ার শোভন- সৌন্দর্যে লোভাতুর হওয়া। আসলে আল্লাহ
তাআলা- কাফেরদের আনুগত্য করা, তাদের জন্য মুওয়ালাত প্রদর্শন করা, তাদের ধর্মের
প্রতি সম্মতি দেখানো ইত্যাদির ক্ষেত্রে একটি মাত্র ওয়র কবুল করেন, আর তা হলো ‘
إِكرَاهٍ’ তথা ‘বাধ্যকরণ’। অর্থাৎ জবরদস্তিমূলক পরিস্থিতিতে নেহাৎ বাধ্য হয়ে
কাফেরদের সঙ্গে মুওয়ালাতের সম্পর্ক চর্চা করা ওয়র হিসেবে গণ্য হবে। ইরশাদ হয়েছে,

كَفَرَ مَنْ
مَنْ وَلَكِنْ بِالْإِيمَانِ مُطْمَئِنُّ وَقَلْبُهُ أَكْرَهُ مَنْ إِلَّا إِيْمَانِهِ بَعْدَ مِنْ بِاللَّهِ
بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ عَظِيمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ اللَّهُ مِنْ غَضَبٍ فَعَلَيْهِمْ صَدْرًا بِالْكَفْرِ شَرَحَ
الْكَافِرِينَ الْقَوْمَ يَهْدِي لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا الْحَيَاةِ اسْتَحَبُّوا

যে ঈমান

আনার পর আল্লাহর সঙ্গে কুফরি করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফরি দ্বারা উন্মুক্ত
করেছে, তাদের উপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাআজাব। ঐ ব্যক্তি
ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় (কুফরি করতে) অথচ তার
অন্তর থাকে ঈমানে পরিতুষ্ট। এটা এ জন্য যে, তারা আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে
পছন্দ করেছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফির কওমকে হিদায়েত করেন না’ - (সূরা আন্-
নাহল, ১০৬-১০৭)।

অন্য এক আয়াতে এসেছে,

الْمُؤْمِنُونَ يَتَّخِذُوا
فِي اللَّهِ مِنْ فَلَيْسَ ذَلِكَ يَفْعَلُ وَمَنْ الْمُؤْمِنِينَ دُونَ مِنْ أَوْلِيَاءَ الْكَافِرِينَ
ثِقَاةً مِنْهُمْ تَثْقُوا أَنْ إِلَّا شَيْءٍ

মুমিনরা যেন মুমিনদের ছাড়া

কাফিরদেরকে বন্ধু না বানায়। আর যে কেউ এরূপ করবে, আল্লাহর সঙ্গে তার কোন
সম্পর্ক নেই। তবে যদি তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকে’ - (সূরা
আলে

ইমরান, ২৮)।

তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, বাধ্য হয়ে যেটুকু করার অনুমতি আছে তা হলো
বাহ্যিক আমল। কাফেরদের প্রতি অন্তরগত সন্তুষ্টি ও হৃদয়ের টান রাখার ক্ষেত্রে (বাধ্য
হওয়ার) নীতি প্রযোজ্য হবে না। এর দলিল আল্লাহ তাআলার কথা ‘অথচ তার অন্তর
থাকে ঈমানে পরিতুষ্ট’। আর একব্যক্তির অন্তরে অন্যব্যক্তি আধিপত্য চালাতে পারে না। এ
কারণেই, যেসব ক্ষেত্রে একজন অন্য জনকে বাধ্য করতে পারে, কেবল সে ক্ষেত্রে ওয়র
গ্রহণ করা হবে, যেমন- মুখ দিয়ে কোনো কিছু বলানো অথবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা কোনো
কাজ করানো। অতএব, যদি কেউ অন্তরের সন্তুষ্টি ও টানসহ কাফেরদের সঙ্গে মুওয়ালাতের
সম্পর্ক রাখে, তবে সে সর্বাবস্থায় কাফের। আর যদি অন্তরের সন্তুষ্টির পাশাপাশি মুখে বা
অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তা প্রকাশ করে, তবে ইহকালে কাফেরদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়, তার

সঙ্গেও সে আচরণ করা হবে, আর পরকালে সে ভোগ করবে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আজাব। আর যদি কাফেরদের প্রতি অন্তরের সন্তুষ্টিকে অন্তরেই রেখে দেয়, কথা ও কাজে তা প্রকাশ না করে, বরং বাহ্যিকভাবে ইসলামের বিধিবিধানের ওপর আমল করে যায়, তবে সে দুনিয়াতে মুসলিমসুলভ আচরণ পাবে, কিন্তু সে যেহেতু মুনাক্কক অতএব মৃত্যুর পর তার স্থান হবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে।

বাধ্য হওয়ার সীমানা

কি পর্যায়ে বাধ্য হলে ওয়র হিসেবে গণ্য হবে? এ প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. বলেন, ‘আমি বিভিন্ন মায়হাব ঘেঁটে দেখে যে ফলাফলে পৌঁছেছি তা হলো, যাকে বাধ্য করা হচ্ছে তার অবস্থার বিভিন্নতার নিরিখে বাধ্য হওয়ার মাত্রা নির্ধারিত হয়। যেমন কোনো কিছুর মালিকানাশ্ব অন্য কাউকে প্রদানের জন্য যে মাত্রায় বাধ্য হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে, কুফরি-বাক্য উচ্চারণের ক্ষেত্রে সে মাত্রায় বাধ্য হলে, তা গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আহমদ র. একাধিক জায়গায় বলেছেন যে, কুফরের ওপর বাধ্য হওয়া কেবল তখনই বিবেচিত হবে যখন এর জন্য দৈহিক শাস্তি অথবা গ্রেফতারির মুখোমুখি হতে হবে। শুধু মুখের কথা বাধ্যকর বলে বিবেচিত হবে না। তিনি বলেছেন, যদি কোনো স্ত্রী তার স্বামীর ঘরে থাকাবস্থায় তার মোহরানা স্বামীকে দান করে দেয়, তাহলে সে এ দান থেকে সরে আসার অধিকার রাখে, যদি স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেবে অথবা তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে, এ ভয় না-থাকে। ইমাম আহমদ তালাক অথবা দুর্ব্যবহারের আশঙ্কাকে এখানে ‘বাধ্য হওয়া’ বলে সাব্যস্ত করেছেন। তবে এইরূপ বাধ্য হওয়া কুফরি-বাক্য উচ্চারণের জন্য যথেষ্ট হবে না। অতএব কাফেরদের কাছে বন্দি কোনো মুসলিম যদি এ ভয় করে যে, কুফরি-কথা উচ্চারণ না-করলে কাফেররা তাকে বিয়ে করার অনুমতি দেবে না অথবা তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের অনুমতি দেবে না, তবে এইটুকুকে কুফরি-কথা উচ্চারণ করতে বাধ্যকারী বিষয় বলে ধরা হবে না। [দেখুন: মাজমুয়াতুত তাওহিদ, পৃ:২৯৭]

আর এভাবেই ইমাম আহমদ র. ও ইবনে তাইমিয়া র., যে মাত্রায় বাধ্য হলে কুফরি-বাক্য উচ্চারণ করা যায় অথবা কাফেরদের সঙ্গে মুওয়ালাত করা যায় বলে মতামত দিয়েছেন, তা হলো দৈহিক শাস্তি মৃত্যুদন্ড ইত্যাদি। এ ছাড়া নেতৃত্বে থাকার লোভ, পদমর্যাদার লোভ, যাতে অধিষ্ঠিত হতে এবং টিকে থাকতে কাফেররা তাকে সহায়তা দেবে, অথবা অর্থসম্পদ, পরিবার-পরিজন, দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয় ইত্যাদি কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমামদ্বয় যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তার পক্ষে দলিল হলো ইতোপূর্বে পেশকৃত আয়াতসমূহ, যা কাফেরদের সঙ্গে মুওয়ালাতের সম্পর্ক করা নিষিদ্ধ করেছে এবং যে তা করবে তাকে কাফের ও মুরতাদ বলে আখ্যা দিয়েছে। দুনিয়াপ্ৰীতি, দুনিয়ার যশ-খ্যাতির লোভ ইত্যাদি যে বান্দার কোনো উপকারে আসবে না এবং বান্দা যদি এমন কিছু করে যা কুফরির কারণ হয়, তাহলে এসব ধনরত্ন যে আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না, সে বিষয়টিকেই ব্যক্ত করে আল্লাহ বলেছেন ,

ذَلِكَ
الْقَوْمَ يَهْدِي اللَّهُ وَأَنَّ الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا الْحَيَاةِ اسْتَحْبُّوا بِأَنَّهُمُ
الْكَافِرِينَ

‘এটা এ

জন্য যে, তারা আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে পছন্দ করেছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফির কওমকে হিদায়েত করেন না’ - (সূরা আন্-নাহল, ১০৭)।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ওইসব লোকদের হুঁশিয়ার করেছেন, যারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের কুফরি-পছন্দকারী পিতা অথবা ভাইকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করে।

وَإِخْوَانَكُمْ أَبَاءُكُمْ تَتَّخِذُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ يَتَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ الْإِيمَانِ عَلَى الْكُفْرِ اسْتَحْبُّوا إِنْ أَوْلِيَاءُ
الظَّالِمُونَ هُمْ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজদের পিতা ও ভাইদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরিকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাই জালেম' - (সূরা আত্-তাওবা, ২৩)।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, আত্মীয়তা-সম্পর্ক যতই শক্তিশালী হোক, তা কাফেরদের সঙ্গে মুওয়ালাত প্রকাশের জন্য গ্রহণযোগ্য ওয়র নয়। যদি পিতা-ভাই-সন্তানের ভালোবাসা কাফেরদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে জড়াতে ওয়র হিসেবে গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে কীভাবে নেতৃত্বের লোভ, অর্থসম্পদ ও দুনিয়ার চাকচিক্যের লোভ এ ক্ষেত্রে ওয়র হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। বরং আল্লাহ মানুষের পেশ-করা আট ধরনের ওয়র নাকচ করে দিয়েছেন, মানুষ যা সাধারণত পেশ করে থাকে। ইরশাদ হয়েছে,

كُمُ وَإِخْوَانُ وَأَبْنَاؤُكُمْ أَبَاؤُكُمْ كَانَ إِنْ قُلْ كَسَادَهَا تَخْشُونَ وَتِجَارَةُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَأَمْوَالُ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ فَتَرْبُصُوا سَبِيلَهُ فِي وَجْهِهِ وَرَسُولِهِ اللَّهُ مِنْ إِلَيْكُمْ أَحَبُّ تَرْضَوْنَهَا وَمَسَاكِينُ الْفَاسِقِينَ الْقَوْمِ يَهْدِي آلُ اللَّهِ بِأَمْرِهِ اللَّهُ يَأْتِي حَتَّى

বল, 'তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত'। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন না' - (সূরা আত্-তাওবা, ২৪)।

আর এটা নিঃসন্দেহ যে, কাফেরদের সঙ্গে মুওয়ালাত করায় তাদের প্রতি ভালোবাসা ও প্রীতিপ্রকাশ করা হয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের মহব্বতের ওপর তাদের মহব্বতকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং আল্লাহর পথে জিহাদের ওপর তাদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

الْآخِرُ وَمُؤَالِيَّ بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ قَوْمًا تَجِدُ لَا أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبَاءَهُمْ كَانُوا وَلَوْ وَرَسُولُهُ اللَّهُ خَادَّ مَنْ يُؤَادُّونَ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ

যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে এমন জাতিকে তুমি পাবে না এমন লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরোধিতা করে, যদি সেই বিরুদ্ধবাদীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয় তবুও' - (সূরা আল মুজাদালা, ২২)।

অতএব সম্পদ, স্ত্রী-সন্তান, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ইত্যাদির যে ওয়র মানুষ পেশ করে থাকে, তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অন্য-এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ওইসব লোকদের ওয়র নাকচ করে দিয়েছেন, যারা ইহুদি নাসারাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিল, এই ভয়ে যে অন্যথায় তাদের বিপদ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

يَهُودَآل تَتَّخِذُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ يَتَوَلَّوهُمْ وَمَنْ بَعْضُ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ وَالنِّصَارَى مَرْضُ قُلُوبِهِمْ فِي الَّذِينَ فَتَرَى . الظَّالِمِينَ الْقَوْمِ يَهْدِي لَا اللَّهُ إِنْ يَأْتِي أَنْ اللَّهُ فَعَسَى ذَائِرَةُ يَبْنَأْتُمْ أَنْ تَخْشَى يَقُولُونَ فِيهِمْ يُسَارِعُونَ نَادِمِينَ أَنْفُسِهِمْ فِي أَسْرُوا مَا عَلَى فَيُصْخِخُوا عِنْدَهُ مِنْ أَمْرِ أَوْ بِالْفَتْحِ

হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদি ও নাসারাদেরকে তোমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের অন্তরঙ্গ বন্ধু, আর তোমাদের মধ্যে

যারা তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ জালেম কাওমকে হিদায়েত দেন না। সুতরাং তুমি দেখতে পাবে, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা কাফেরদের মধ্যে (বন্ধুত্বের জন্য) ছুটছে। তারা বলে, ‘আমরা আশঙ্কা করছি যে, কোনো বিপদ আমাদেরকে আক্রান্ত করবে। অতঃপর হতে পারে আল্লাহ দান করবেন বিজয় কিংবা তাঁর পক্ষ থেকে এমন কিছু, যার ফলে তারা তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছে, তাতে লজ্জিত হবে’ – (সূরা আল মায়েদা, ৫১-৫২)

বর্তমান ফেতনার যুগে অনেক মুসলমানই এ জাতীয় ওয়র পেশ করে থাকে। গত কালের কাফেরদের ওয়রের সঙ্গে আজকের কাফেরদের কতোই না মিল রয়েছে। তারা অভিন্ন ওয়র পেশ করে। পূর্বের লোকেরা যে বিষয়কে ওয়র হিসেবে পেশ করেছিলে এরাও অভিন্ন বিষয়কে ওয়র হিসেবে পেশ করে। ওরা যে বিপদের ভয় করেছিল, এরাও সে বিপদের আশঙ্কার কথা বলে। তারা বলে যে আমরা কীভাবে অমুক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে হৃদ্যতা রাখব না? আমরা কীভাবে তাদের জন্য প্রীতি, তোষামোদ-খোশামোদ প্রকাশ করব না- যদিও ধর্মের বিনিময়ে হয় তবু-, কেননা তারা তো এমন এমন বৃহৎ শক্তির করুণা ও সুরক্ষাপ্রাপ্ত, যাদের সামনে দাঁড়ানোর ক্ষমতা আমাদের নেই। যাদের কামনা-বাসনা বাস্তবায়ন না-করলে এক লহমাও টিকে থাকা সম্ভব হবে না। আল্লাহর কসম, এটা এমন এক ভয়, যা একমাত্র আল্লাহকেই পাওয়া উচিত। অন্য কাউকে নয়। যারা এরূপ বলে, তারা দু-বার কুফরি করেছে, এক বার কাফেরদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব করে, আর একবার ভয়ের মাধ্যমে তাদের ইবাদত করে, যা কেবল আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট রাখতে হয়। এ আয়াত ও এ বিষয়ক অন্যান্য আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কাফেরদের সঙ্গে মুওয়ালাত করার জন্য যে প্রকৃতির ওয়র আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য, তা হতে হবে আশ্মার ইবনে ইয়াসের (রাযি.) এর ওয়রের মতো, যিনি বাধ্য হয়ে কুফরি-বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন এবং তার প্রতি করুণা করেই আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের ওয়রের বিধান দিয়ে বলেন, ‘তবে যাকে বাধ্য করা হয়েছে, অথচ তার অন্তর ঈমানে পরিতুষ্ট।’ আর এটা তখনই ঘটা সম্ভব, যখন কাফেররা মুসলমানদের ওপর ক্ষমতাবান থাকে, মুসলমানরা কাফেরদের আধিপত্যের আওতায় থাকে। এ পরিস্থিতিতে রুখসত-অনুমতি কেবল তখনই হবে যখন কুফরি প্রকাশে বাধ্য হতে হবে। তবে শাস্তি যখন দূরীভূত হবে তখন আবার ইসলাম প্রকাশ করতে হবে। তারা যদি আবারও শাস্তি প্রদানে ফিরে আসে, তবে আবারও অনুমোদন ফিরে আসবে।

আশ্মার ইবনে ইয়াসের (রাযি.) কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **عَدَاوَاتِي** (তারা যদি ফিরে আসে, তবে তুমিও ফিরে যাও)। ইবনে কুদামা র. বলেন, ‘যদি বাধ্যকৃত ব্যক্তি অন্তরে কুফরি না করে থাকে, তবে যখন ওয়র চলে যাবে, তখন আবার ইসলাম প্রকাশ করতে হবে। আর যদি ইসলাম প্রকাশ না করে কুফরি প্রকাশে অব্যাহত থাকে তাহলে যে-সময় থেকে কুফরি-বাক্য উচ্চারণ করেছে সে-সময় থেকে কাফের বলে গণ্য হবে; কেননা পরবর্তীতেও অব্যাহত থাকার অর্থ হল, সে কুফরি করার প্রতি আন্তরিক এবং নিজ ইচ্ছায় তা প্রকাশ করেছে। [আল মুগনী : ৯/২৪]

তবে কুফরি-বাক্য উচ্চারণ করতে বাধ্য হওয়া, অথবা কাফেরদের সঙ্গে মুওয়ালাত ও তাদের ধর্মে সম্মতি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে বাধ্য হওয়ার ক্ষেত্রেও ধৈর্যধারণ করা এবং তাদের কথামতো কাজ না করা উত্তম। যদিও এর জন্য তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয় তবু। খাববাব (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ‘তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তাদের একজনকে ধরে নেওয়া হতো, অতঃপর মাটিতে গর্ত করে তাকে সেখানে রাখা হতো, এরপর করাত এনে তার মাথায় রাখা হতো। তাকে দ্বিখন্ডিত করে ফেলা হতো। লোহার চিরুনি দিয়ে তার চামড়া ও গোশত উঠিয়ে নেওয়া

হতো, কিন্তু এসব তাকে তার স্বীন থেকে ফেরাতে পারত না। [বুখারি] এর আরেকটি প্রমাণ হলো আসহাবে উখদুদের ঘটনা। এ ঘটনার ভাষ্য অনুযায়ী ঈমান থেকে ফেরানোর জন্য প্রস্তুত অগ্নিগহবরে মুমিনদের নিষ্ক্ষেপ করা হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ঈমানের ওপর দৃঢ় থেকেছেন, আল্লাহর পথে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। এটাই হলো আল্লাহ তাআলার নিম্নবর্তী বাণীর ব্যাখ্যা,

الْأَخْدُودِ أَصْحَابُ قُتِلَ
يَفْعَلُونَ مَا عَلَى وَهُمْ . فَعُودٌ عَلَيْهَا هُمْ إِذْ . الْوَقُودِ ذَاتِ النَّارِ
الْعَزِيزِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُوا أَنْ إِلَّا مِنْهُمْ نَقَمُوا وَمَا . شُهُودٌ بِالْمُؤْمِنِينَ
الْحَمِيدِ

ধ্বংস হয়েছে গর্তের

অধিপতিরা, (যাতে ছিল) ইন্ধনপূর্ণ আগুন। যখন তারা তার কিনারায় উপবিষ্ট ছিল। আর তারা মুমিনদের সঙ্গে যা করছিল তার প্রত্যক্ষদর্শী। আর তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধুমাত্র এ

কারণে যে,

তারা মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল’ - (সূরা আল বুরূজ, ৪-৮)।

ইমাম কুরতুবী বলেছেন, ‘আলেমগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন যে, যাকে কুফরি করতে বাধ্য করা হলো সে যদি নিহত হওয়াকে বেছে নেয়, তবে তাই হবে অধিকতর ছাওয়াবের কাজ ওইব্যক্তির তুলনায় যে রুখসত-অনুমোদনের সুযোগ নিল। [তাকসিরে কুরতুবী: ১/১৮৮]

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৭০ : ইসলামের প্রতি অসন্তুষ্টচিত্ততার কিছু নিদর্শন

ইসলামের প্রতি অসন্তুষ্টচিত্ততার কিছু নিদর্শন

ইসলামের প্রতি অসন্তুষ্টচিত্ত হলে একজন মানুষ কাফের-মুর্তাদ হয়ে যায়, যদিও সে শাহাদাতাইন উচ্চারণ করে এবং নিজেকে মুসলমান হিসেবে দাবি করে। নিদর্শন দুটি হলো,

প্রথমত : ইসলামের এমন কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করা, যা ইসলামের অঙ্গীভূত বলে সর্বজনবিদিত। যেমন আল্লাহ, রাসূল, কোরান ইত্যাদি নিয়ে ঠাট্টা করা, ঈমান রাখার কারণে মুমিন ব্যক্তিকে নিয়ে ঠাট্টা করা। এরূপ ঠাট্টাকারী ব্যক্তি কাফের হয়ে যাওয়ার দলিল

لا . تَسْتَهْزِئُونَ كُنْتُمْ وَرَسُولِهِ وَأَيَاتِهِ أَيْلَهُ قُلْ تُعَذِّبُونَكُمْ بِغَدِ كَفَرْتُمْ قَدْ تَعْتَذِرُونَ
'مُجْرِمِينَ كَانُوا بِأَنَّهُمْ طَائِفَةٌ

বল, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে'? তোমরা ওয়র পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফরি করেছ। যদি আমি তোমাদের থেকে একটি দলকে ক্ষমা করে দেই, তবে অপর দলকে আজাব দেব। কারণ, তারা হচ্ছে অপরাধী' - (সূরা আত্-তাওবা, ৬৫-৬৬)।

উল্লিখিত আয়াতটি নাজিল হওয়ার কারণ হলো, তাবুকযুদ্ধের সময় এক ব্যক্তি বলল, 'আমরা আমাদের এই ঋণীদের চাইতে উদরপূর্তিতে অধিক আগ্রহী, কথা বলায় অধিক মিথ্যাবাদী এবং শত্রুর সম্মুখীন হলে অধিক ভীর্ণ অন্য কাউকে দেখিনি।' ঋণী দ্বারা সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করেছিল। এ কথার জবাবে আউফ বিন মালেক (রাযি.) লোকটিকে বললেন, 'তুমি মিথ্যা বলেছ, তুমি মুনাকফ। আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ব্যাপারে অবহিত করব।' আউফ বিন মালেক (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে গিয়ে হাজির হলেন। তিনি দেখলেন যে, তাঁর যাওয়ার পূর্বেই ব্যাপারটি নিয়ে ইতোমধ্যেই কুরান নাজিল হয়েছে। এরপর ওই লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এল। সে চলে যাওয়ার জন্য রওনা হয়েছিল এবং তার উটের ওপর আরোহিত ছিল। সে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমরা খোশগল্প ও খেল-তামাশা করছিলাম, যাত্রী-কাফেলায় যে ধরনের খোশগল্প হয়, পথ অতিক্রমের সুবিধার্থে আমরা সে ধরনের কথা বলছিলাম। ইবনে উমর (রাযি.) বলেন, আমার চোখে এখনো ভাসছে যে, লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটের রশি ধরে আছে, আর পাথর তার পা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। লোকটি বলছে, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা খোশগল্প ও খেল-তামাশা করছিলাম, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে'? তিনি লোকটিকে তাকিয়ে দেখেন না, এবং এ কথার অতিরিক্ত কিছু বলেন না।' [তাফসিরে তাবারী:২/৩৬৭]

বিদ্রূপ করার আকার-আকৃতি বহু, তা গণনা করে শেষ করা যাবে না। তবে সব কিছুকে যা একসূত্রে গাঁথে, তা হলো, ইসলাম নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, পুরো ইসলাম অথবা ইসলামের কোনো একটি বিষয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট প্রকাশ করা। হতে পারে তা কথার মাধ্যমে, কাজের মাধ্যমে অথবা ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে। ইশারার মাধ্যমে বিদ্রূপ করার উদাহরণ, কেউ কোরান তিলাওয়াতকালে, হাদিস পাঠকালে, ইসলামী আকীদা আলোচনাকালে, অথবা

সবার কাছে জ্ঞাত ইসলামের কোনো বিধান নিয়ে চোখ টিপ দিয়ে, চিহ্না বের করে, ঠোঁট বাঁকিয়ে, হাত দ্বারা কাউকে চিমটিকেটে ইশারা করল।

দ্বিতীয়ত : আল্লাহর নাম, রাসূলের নাম, কোরান তিলাওয়াত অথবা ইসলামের সুপরিজ্ঞাত কোনো বিষয় উল্লেখের সময় অথবা ইসলামের দাওয়াত প্রচারের সময় রাগ-রোষ ও ঘৃণা প্রকাশ করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন, **وَجُوهٌ فِي تَعْرِفٍ بَيِّنَاتٍ آيَاتُنَا عَلَيْهِمْ تُتْلَى وَإِذَا آيَاتُنَا عَلَيْهِمْ يَتْلُونَ بِالَّذِينَ يَسْطُونَ يَكَادُونَ الْمُتَكِرَّ كَفَرُوا الَّذِينَ وَبِئْسَ كَفَرُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَعَدَهَا النَّارُ ذَلِكَ مِنْ بَشَرٍ أَفْأَنبُتْكُمْ قُلُ الْمَصِيرُ** ۝

আর তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূপে তিলাওয়াত করা হলে যারা কুফরি করে তাদের মুখমন্ডলে তুমি অসন্তোষ লক্ষ্য করবে; তাদের কাছে যারা আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। বল, তাহলে কি আমি তোমাদের এর চেয়েও খারাপ কিছু সংবাদ দেব? সেটা আগুন। যারা কুফরি করে, আল্লাহ এর ওয়াদা তাদের দিয়েছেন। আর এটা কত নিকৃষ্ট ঠিকানা!'- (সূরা হাশ্ব, ৭২)।

অন্য-এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, **اللَّهُ أَنْزَلَ مَا كَرِهُوا بِأَنَّهُمْ لَكَذُ** ۝ **أَعْمَالُهُمْ فَأَحْبَطَ** ۝ তা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। অতএব তিনি তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছেন'- (সূরা মুহাম্মাদ, ৯)।

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৭১ : মুসলমান যখন মুরতাদ হয়ে যায় : কয়েকজন বিজ্ঞ আলোমের মন্তব্য

মুসলমান যখন মুরতাদ হয়ে যায়, কয়েকজন বিজ্ঞ আলোমের মন্তব্য এ অধ্যায়টি শেষ করার পূর্বে অতীতের অভিজ্ঞ আলোমগণ- যেসব কথা, কাজ ও বিশ্বাসের কারণে একজন মুসলমান ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় বলে মতামত দিয়েছেন, তা উল্লেখ করা ভালো হবে বলে মনে করলাম; যাতে পাঠক মহোদয়ের কাছে বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে যায়, যাতে কোনোদিন তিনি এতে পতিত না হন, নিজের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের কাছে যাতে বিষয়টি পরিষ্কার করে ব্যক্ত করতে সক্ষম হন। আর আলোমগণ যা উল্লেখ করেছেন তার ব্যাপারে তাঁরা সবাই একমত। আর যেসব বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন তা কারও কাছেই কবির গুনাহ থেকে নিচে নয়।

এক. ইমাম ইবনে হাজার আল হায়ছামী বলেন, কুফর ও শিরকের একটি প্রকার হলো, দূর অথবা নিকট ভবিষ্যতে কুফরি কাজ করার জন্য কেউ দৃঢ়প্রত্যয়ী হলো, অথবা কুফরের কোনো কিছু তার জিহবা অথবা অন্তরে ঝুলিয়ে রাখল; যদিও তা আপাত-দৃষ্টে এমন কাজ হয় আকল-বুদ্ধির বিবেচনায় যা সংঘটিত হওয়ার আদৌ সম্ভাবনা নেই। এমন হলেও সে তৎক্ষণাৎ কাফের হয়ে যাবে। অথবা একগুঁয়েমি প্রকাশ করল, বা বিদ্রূপ করল, যেমন মহাবিশ্ব অনাদি বলে বিশ্বাস করল, অথবা আল্লাহ তাআলার জন্য সর্বসম্মতভাবে প্রমাণিত কোনো সিফাত-গুণ, অস্বীকার করল। যেমন ইলম, কুদরত, অথবা আল্লাহ তাআলা যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় জানেন তা অস্বীকার করল, অথবা আল্লাহর জন্য এমন বিষয় সাব্যস্ত করল যা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত নয়, যেমন রঙ । এ কথা বলে ইমাম ইবনে হাজার আল হায়ছামী, বহু বিশ্লেষণ ও উদাহরণ পেশ করে বলেন, 'এর মধ্যে शामिल রয়েছে, মুসলমান দাবি করা সত্ত্বেও এমন কোনো কাজ করা, যা কাফের ভিন্ন মুসলমান দ্বারা সংঘটিত হয় না। যেমন খ্রিষ্টানদের পোশাক-আশাক, ক্রস ইত্যাদি পরিহিত অবস্থায় গির্জায় গমন করা। অথবা আল-কোরানের কোনো আয়াত-লিখিত কাগজ, আল্লাহর নাএ লিখিত কাগজ নাপাক ময়লায় ফেলে দেওয়া। অথবা এমন কোনো নবির নবুওতে সন্দেহ করা, যার নবুওতের ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। অথবা আল্লাহ তাআলা যেসব কিতাব ও সহীফা নাজিল করেছেন তা নাজিল হয়নি বলে সন্দেহ করা, যেমন তাওরাত, যাবুর, ইনজীল, ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সহীফা। অথবা আল-কোরানের কোনো আয়াতের ব্যাপারে সন্দেহ করা। অথবা এমন ব্যক্তির কাফের হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ করা যার কথা উস্মতকে গুমরাহকারী। অথবা সাহাবায়ে কেরামকে কাফের বলা, মক্কা-কাবা-মাসজিদুল হারাম ইত্যাদিতে সন্দেহ করা, হজ্বের বর্ণনা, হজ্বের ধরণ, নামাজ, রোজা ইত্যাদিতে সন্দেহ করা। অথবা কোনো হারামকে হালাল মনে করা, যেমন ওয়ু ছাড়া নামাজ পড়া, মুসলমানকে কষ্ট দেয়া, কোনো যিম্মী কাফেরকে শরঈ অনুমোদন ছাড়া কষ্ট দেয়া। অথবা কোনো হালালকে হারাম করা, যেমন বেচাকেনা, বিবাহ। অথবা আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলা যে, তিনি কালো ছিলেন, অথবা দাঁড়ি উঠার আগেই তিনি মারা গেছেন, বা তিনি কুরাইশী নন, আরবী নন, মানুষ নন ইত্যাদি বলা; কেননা তিনি গুণ-বৈশিষ্ট্যে যেরূপ ছিলেন তা ছাড়া অন্যকোনো গুণ-বৈশিষ্ট্য যুক্ত করে তাঁকে উল্লেখ করার অর্থ তাঁর ওপর মিথ্যা আরোপ করা। এই মূলনীতি থেকে এটাও বের হচ্ছে যে, প্রত্যেক এমন গুণ যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে, তা অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি কেউ সন্দেহ করে বলে, জানি না, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই কি মক্কায় জন্ম নিয়েছিলেন এবং মদীনাতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, না অন্য কেউ? অথবা বলল যে নবুওত বিষয়টি চেষ্টার্জিত; অথবা নবুওত এমন একটি পর্যায় যেখানে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে পৌঁছানো সম্ভব। অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে, ওলী নবির চাইতে উত্তম; অথবা কেউ দাবি করল যে তার কাছে ওহী আসে,

তবে নবুওত দাবি না করলেও সে কাফের হয়ে যাবে; অথবা যদি বলে যে সে মৃত্যুর পূর্বেই জাল্লাতে প্রবেশ করবে; অথবা আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর কোনো দোষত্রুটি আরোপ করে, অনুরূপ অন্যান্য নবি এমনকি ফেরেশতাদের ওপর যদি দোষত্রুটি আরোপ করে; অথবা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লানত করে, গালমন্দ করে, তাঁকে নিয়ে বিদ্রূপ করে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, তাঁর সত্তায়, বংশ পরিক্রমায়, দ্বীনে দোষত্রুটি আরোপ করে, এ ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত দেয়, মস্করার উদ্দেশে তাঁকে গালি দেয়, তাঁর শানকে ছোট করে উল্লেখ করে, তাঁর শানের সঙ্গে বেয়াদবি হয় এমন কথা বলে, তাঁর জন্য অপমান প্রত্যাশা করে, তাঁর পদমর্যাদার সঙ্গে মিলে না এমন বিষয় তাঁর সঙ্গে যুক্ত করে, তাঁর সম্মানিত সত্তাকে নির্বোধ ও খারাপ কথা ও মিথ্যা বাক্য দ্বারা আহত করে; অথবা তিনি যেসব বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছেন, তার মাধ্যমে তাকে দোষারোপ করে; অথবা মানুষের যেসব রোগ-ব্যাদি হয়ে থাকে তার জন্য কোনো ব্যঙ্গোক্তি প্রকাশ করে। উল্লিখিত বিষয়ের কোনো একটি যে ব্যক্তি করবে, তাকে উস্মানের ইজমা-ঐকমত্য অনুযায়ী কাফের হিসেবে ঘোষণা করা হবে। অতএব [রাষ্ট্রপ্রধান অথবা তার পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির ফয়সালায়] তাকে হত্যা করা হবে। এমনকি অধিকাংশ আলেমদের মতানুযায়ী তার তাওবাও কবুল করা হবে না।

খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রাযি.) এক ব্যক্তিকে এই কারণে মৃত্যুদন্ড দেন যে সে বলেছিল, (صاحبكم عند) তোমাদের সাথীর কাছে)। এ কথাকেই তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে বেয়াদবি হিসেবে বিবেচনা করেন। এরপর ইবনে হাজার র. বলেন, 'অথবা সে কুফরের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে, যদিও তা পরোক্ষভাবে হয়। যেমন কোনো কাফেরকে ইঙ্গিতে বলল সে যেন মুসলমান না হয়, যদিও কাফের লোকটি তার পরামর্শ চায়নি; অথবা কোনো মুসলমানকে কোনো তাবিল ছাড়াই বলল, হে কাফের! যেহেতু সে ইসলামকে কুফরি মনে করে; অথবা সে আল্লাহর নাম নিয়ে বিদ্রূপ করল, নবিকে তুচ্ছ করে উপস্থাপন করল; অথবা আল্লাহর নির্দেশ, তাঁর নবির নির্দেশ, আল্লাহর ওয়াদা ও হুঁশিয়ারি তুচ্ছ জ্ঞান করল, যেমন বলল, আমাকে যদি অমুক বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হতো তবে আমি অমান্য করতাম, এই দিকে যদি কিবলা দেওয়া হতো তবে এ কিবলার দিকে নামাজ পড়তাম না, আমাকে যদি জাল্লাত দেওয়া হয়, তবে তাতে প্রবেশ করব না- বিদ্রূপ ও একগুঁয়েমিবশত এরূপ বলল। অথবা বলল, আমার যে অসুস্থতা ও কঠিন অবস্থা এর কারণে নামাজ পরিত্যাগ করলে যদি আমাকে শাস্তি দেওয়া হয়, তবে আমার প্রতি জুলুম করা হবে; অথবা কোনো অত্যাচারী অত্যাচারিতকে বলল- যে বলেছে, এই জুলুম আমার তাকদিরে লেখা- আমি তোমার ভাগ্যের বিরুদ্ধে কাজ করছি; অথবা বলল, নবি যা বলেছেন, তা যদি সত্য হয় তাহলে তো নাজাত পেয়ে গেলাম; অথবা তাকে বলা হলো, নখ কাটো, এটা নবির সুন্নত, উত্তরে সে বিদ্রূপ করে বলল, সুন্নত হলেও আমি কাটব না; অথবা বলল, লা হাওলা ওয়া লা কুউআতা ইল্লা বিল্লা' এ কথা ক্ষুধা নিবারণের জন্য যথেষ্ট নয়, অনুরূপ কথা অন্যান্য দোয়ার ক্ষেত্রেও বলল; অথবা মুযাজ্জিনকে বলল, সে মিথ্যা বলছে; অথবা আযানকে কুফরের ঘন্টা বলে আখ্যা দিল, আযান নিয়ে বিদ্রূপ করল; অথবা তাচ্ছিল্যবশত বিসমিল্লাহ বলল; অথবা বিদ্রূপ করে বলল, আমি কেয়ামতকে ভয় পাই না; অথবা আল্লাহর সঙ্গে অক্ষমতা জুড়ে দিয়ে বলল, তিনি তো চোরকে অনুসরণ করেন না...; অথবা আল্লাহ তাআলা যেসব জিনিস হারাম করেছেন তার কারণে আল্লাহর সঙ্গে জুলুম নিসবত করল; অথবা কাফেরদের পোশাক পরল তাদের ধর্মের প্রতি অন্তরের ঝোঁক নিয়ে; অথবা বলল, ইহুদীরা মুসলমানদের চেয়ে উত্তম; অথবা তাকে বলা হলো, ঈমান কী? এর উত্তরে সে তাচ্ছিল্য করে বলল, জানি না। অথবা আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) এর সাহাবীত্ব অস্বীকার করল; অথবা আয়েশা রাযি-কে অপবাদ দিল, এ করে সে আল কোরান অস্বীকার করল; অথবা বলল, আমি আল্লাহ, যদিও তা ঠাট্টাচ্ছলে হয়; অথবা ওয়াজিবগুলো অস্বীকার করে বলল, আমি জানি না আল্লাহর হক কী; অথবা বিদ্রূপ করে বলল, আমি কোরান, নামাজ, যিকির ইত্যাদির

দ্বারা পরিতুষ্ট হয়েছি, আমার আর এ সবার প্রয়োজন নেই; অথবা বলল, হাশর আবার কী? জাহান্নাম আবার কী? অথবা বলল, আল্লাহ প্রত্যেক আলেমের ওপর লা'নত করুন, সে আলেম শব্দটি ব্যাপক অর্থে নিল যার মধ্যে নবি ও ফেরেশতাগণও शामिल রয়েছেন; অথবা বলল, এটা কেমন শরীয়ত? অথবা বলল, যখন রুবুবিয়াত প্রকাশ পায় তখন উবুদিয়াত চলে যায়, অর্থাৎ তখন আর শরীয়তের আহকাম অনুযায়ী আমল করতে হয় না; অথবা বলল, সে তার মানবিক গুণাবলি পরিত্যাগ করে আল্লাহতে ফানা হয়ে গিয়েছে; অথবা সে দুনিয়াতেই আল্লাহকে দেখে, তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলে; অথবা আল্লাহ সুন্দর আকৃতি ধারণ করে আসেন; অথবা আল্লাহ তার ওপর থেকে শরীয়তের বিধান উঠিয়ে নিয়েছেন; অথবা বলল, ইবাদতের পথ ছাড়াও অন্য পথে বান্দা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে; অথবা বলল, রুহ হলো আল্লাহর নূর, অতঃপর যখন নূরে নূরে সংযোগ ঘটে তখন এক হয়ে যায়।' [ইবনে হাজার মাক্কী, আয্যাওয়াজের আন ইকতিরাফিল কাবায়ের: ১/২৮-৩০; এর কাছাকাছি বক্তব্য দেখা যাবে মুগনীল মুহতাজে, পৃ: ১৩৫-১৩৬; হাশিয়াতুল বাজুরী: ২/২৫৭]

দুই. ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. সূরা আল মায়েদার ৪৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

الْكَافِرُونَ هُمْ فَأَوْلَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمُ لَمْ وَمَنْ
করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার-ফয়সালা করল না, তারা কাফের' - (সূরা আল মায়েদা, ৪৪)।

ইবনে তাইমিয়া র. বলেন, 'এটা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের ওপর যা নাজিল করেছেন সে অনুযায়ী যে বিচার-ফয়সালা করা ওয়াজিব বলে বিশ্বাস করে না, সে কাফের। আর এমন কোনো জাতি পাওয়া যাবে না, যারা ইনসারূপর্ণ বিচার-ফয়সালা নির্দেশ দেয় না, হতে পারে যে তাদের কাছে ইনসারূপ হলো তাদের গুণীব্যক্তির যা বলেছেন তাই, বরং মুসলমান নামধারী অনেকেই তাদের সমাজ বা গোত্রের আচার-অভ্যাস অনুযায়ী-যা আল্লাহ নাজিল করেননি- বিচার-ফয়সালা করে থাকে, যেমন বেদুইন সাওয়ালিফরা, তারা মনে করে যে, কোরান-সুন্নাহ বাদ রেখে তাদের ঐ আচার-অভ্যাস অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করা উচিত। এটা কুফরি। মানুষের মধ্যে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু তারা তাদের আচার অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে থাকে, যার নির্দেশ তাদের গণ্যমান্য ব্যক্তির দেয়। এরা যখন জানবে, আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা ব্যতীত বিচার-ফয়সালা করা যাবে না, যদি তখন তা আঁকড়ে না ধরে, বরং আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তার বিপরীতে বিচার-ফয়সালা করা বৈধ মনে করে, তবে তারা কাফের হয়ে যাবে।'

[মাজমুয়াতুত-তাওহিদ পৃ. ১৯৩]

একই বিষয়ে আকীদায়ে তাহাবিয়ার ব্যাখ্যাকার বলেন, 'এখানে একটি বিষয় রয়েছে, যা ভালো করে বুঝা উচিত, তা হলো আল্লাহ যা নাজিল করেননি সে অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করলে, তা এমন কুফরি হতে পারে যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়, এটা শাসকের অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। শাসক যদি বিশ্বাস করে, আল্লাহ যা নাজিল করেছেন সে অনুযায়ী শাসন করা ওয়াজিব নয়, বরং সে এ ব্যাপারে স্বাধীন; অথবা সে আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর তা তুচ্ছ জ্ঞান করে, তাহলে এটা হবে বড় কুফরি।'

[শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ পৃ. ৩৬৩-৩৬৪]

হাফেয ইবনে কাছীর র. (بُغُؤْنَ يَ الْجَاهِلِيَّةِ أَفْخُكُم) - তারা কি জাহেলী যুগের হুকুম অনুসন্ধান করে [সূরা আল মায়েদা পৃ. ৫০] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

'যারা আল্লাহর তাআলার সুসংহত, সর্বকল্যাণকর ও সকল অকল্যাণ থেকে বারণকারী বিধান থেকে বের হয়ে গেল এবং এর পরিবর্তে এমন অভিমত, খেয়াল ও পরিভাষার আশ্রয় নিল, যা মানুষের তৈরি, ও শরীয়ত-সমর্থিত নয়- ঠিক জাহেলী যুগের লোকদের

মতো, যারা তাদের খেয়াল-খুশিজাত মূঢ়তা-ভ্রষ্টতা অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করত, অথবা তাদের মতো, যারা তাদের রাজা চেঙ্গিস খান প্রণীত 'আল ইয়াসেক' অনুযায়ী তাদের শাসনকর্ম পরিচালনা করত। 'আল ইয়াসেক' একটি গ্রন্থ যা ইহুদিবাদ, খৃষ্টবাদ, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম থেকে বিভিন্ন বিধান উদ্ধৃত করে রচনা করা হয়েছে, এতে আরও ছিল নিছক খেয়ালখুশিজাত বিভিন্ন বিধান। আল ইয়াসেক তাতারি সম্প্রদায়ে অনুসরণীয় বিধান হিসেবে মান্য যা তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের ওপর অগ্রাধিকার দেয়। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে কাফের।

শায়খ আহমদ শাকের ইবনে কাছীর র. এর উক্ত কথা পর্যালোচনা করে বলেন , 'আমি বলব- এতদসত্ত্বেও- এটা কি আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী শুদ্ধ হবে যে, মুসলমানরা তাদের দেশে এমন আইন ও বিধান দ্বারা বিচার-ফয়সালা করবে যা ইউরোপের পৌত্তলিক আইন ও বিধান থেকে উৎকলিত? বরং তা এমন এক আইন ও বিধান যাতে বহু বাতিল অভিমত ও কামনা-বাসনা অনুপ্রবিষ্ট রয়েছে, যা তারা যথেষ্ট পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে যায়, যার প্রণেতারা আদৌ কোনো তোয়াক্কা করে না, তা কি ইসলামী শরীয়ার অনুগামী হলো না বিপক্ষে গেল? মুসলমানরা এই ধরনের অবস্থায় নিপতিত হয়নি তবে কেবল তাতারিদের যুগেই। সে-যুগ ছিল মুসলমানদের জন্য ঘোর অন্ধকার ও জুলুমসঙ্কুল যুগ। তা সত্ত্বেও সে আইন ও বিধানের সম্মুখে তারা নত হয়নি, বরং ইসলামই তাতারদের পরাজিত করেছে, নিজেতে তাদের মিশ্রিত করে নিয়েছে, নিজের শরীয়তে তাদের প্রবিষ্ট করে নিয়েছে, অতঃপর মুসলমানরা তাদের দ্বীন ও শরীয়তে অবিচল থাকার কারণে তাতারদের কীর্তিকলাপের প্রভাব দূরীভূত হয়েছে। যেহেতু এই কুৎসিত-অন্যায়পূর্ণ আইন ও বিধানের উৎস ছিল সে-সময়কার শাসকগোষ্ঠী, যা-তে শাসিত মুসলিম জনসাধারণের কেউ অংশগ্রহণ করেনি, তারা তা শিখেনি, তাদের সন্তানদেরকেও শেখায়নি, অতএব তার প্রভাব কত দ্রুতই না দূরীভূত হয়েছিল।'

ইবনে কাছীর র. হিজরী অষ্টম শতাব্দীতে, সে মানবরচিত আইনের কত শক্তিশালী বর্ণনাই না দিয়েছেন, যে মানবরচিত আইন প্রণয়ন করেছিল ইসলামের শত্রু চেঙ্গিস খান। ইমাম ইবনে কাছীরের (র.) বর্ণনা বর্তমান যুগের, হিজরী চৌদ্দশ শতকের মুসলমানদের অবস্থার সঙ্গে মিলে যায়, তবে এক ক্ষেত্রে পার্থক্যসহ, আর তা হলো যে, পূর্বেরটা ছিল কেবল শাসকগোষ্ঠীর বলয়ে- মুসলমানদের ঈমানী ঝাপটায় যা স্বল্প সময়েই নিশ্চি" হয়ে যায় এবং শাসকগোষ্ঠীও মুসলিম উম্মার সঙ্গে একাকার হয়ে যায়, মুছে যায় তাদের কীর্তিকলাপের সকল প্রভাব। এরপর মুসলমানরা নিপতিত হয় আরও ঘোরতর দূরাবস্থায়, অধিকতর আঁধারে; কারণ বর্তমান যুগের প্রায় অধিকাংশ মুসলিম উম্মাহ শরীয়তবিরোধী এসব আইন ও বিধানের স্রোতে ভেসে চলেছে। এই সব আইন ও বিধান, যা পূর্বের সেই আল ইয়াসেকতুল্য, যা প্রণয়ন করেছিল এক প্রকাশ্য নিঃসংশয় কাফের। এই সব আইন ও বিধান যা ইসলামের নামধারী ব্যক্তিরাই বানায়, পরে তা মুসলিম সন্তানরা পড়ে, পিতা-সন্তান সবাই তা নিয়ে গর্ব করে, তারা তাদের শাসন পরিচালনা ও বিচার-ফয়সালার দায়দায়িত্ব এই আধুনিক 'ইয়াসেক' আপনকারীদের হাতে তুলে দেয়। শুধু তাই নয়, বরং যারা এর বিপরীত কথা বলে তাদের তারা অবজ্ঞার চোখে দেখে, যারা দ্বীন আঁকড়ে ধরার উপদেশ দেয় তাদের তারা পশ্চাৎপন্থী বলে, অনগ্রসর ও যত সব খারাপ ভাষায় তাদের উল্লেখ করে। যতটুকু ইসলামী বিধান অবশিষ্ট আছে, তারা তাও পরিবর্তন করে দিতে চায়, তাদের নব 'ইয়াসেক' দিয়ে- কখনো প্রলোভন, বিনম্র আচরণ, ধীরস্থিরতার মাধ্যমে, আবার কখনো ষড়যন্ত্র, ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিয়ে, তাদের হাতে যে ক্ষমতা আছে তা ব্যবহার করে, বার বার। তারা ঢাকঢোল পিটিয়েই বলে, বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ না করে, যে তারা ধর্ম ও রাষ্ট্র এ দুটোকে আলাদা করতে চায়। এতৎসত্ত্বেও কী কোনো মুসলমান পারে এই নতুন দ্বীন তথা আইন ও বিধানকে মেনে নিতে? এই সব মানবরচিত বিধানের বিষয়টি মধ্যাকাশের সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল, তা পরিষ্কার কুফরি, এতে কোনো অস্পষ্টতা বা মারপেঁচ

নেই। অতএব যে মুসলমান হিসেবে দাবি করে, সে যেই হোক না কেন, তার পক্ষে এই মানবরচিত বিধান অনুযায়ী কাজ করার, তা স্বীকার করে নেয়ার পক্ষে কোনো ওয়র নেই। অতএব প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়ে এ ভয় থাকা উচিত যে সে নিজেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের হিসাব নিজেই করতে পারে।’ [উমদাতুত-তাকসির, ইখতিবার ও তাহকীক আহমদ মুহাম্মদ শাকের ৪/১৭১-১৭২]

তিন. শায়খ আহমদ শাকের- যারা চোরের কোরানিক শাস্তি অস্বীকার করে তাদের ব্যাপারে বলেন, ‘এটা চোরের ব্যাপারে আল্লাহর তাআলার বিধান যা শব্দে ও অর্থে অকাটা। এর প্রামাণিকতা ও অর্থনির্দেশ, কোনো ক্ষেত্রেই সন্দেহ নেই, এটা হলো রাসূলের হুকুম যিনি আল্লাহ তাআলার হুকুম বাস্তবায়নমূলক, তাঁর নির্দেশের আনুগত্যমূলক প্রদান করেছেন, অর্থাৎ চোরের হাত কাটা, হোক সে নারী বা পুরুষ। বিষয়টি সকল সন্দেহের উর্ধ্বে, এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যদি মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতেমাও চুরি করে, তবে তার হাতও কাটা হবে।’ দেখুন, আমাদের শত্রু খ্রিস্টানমিশনারী ও ঔপনিবেশিক শক্তি আমাদের নিয়ে কি ছিনিমিনি খেলছে। তারা আমাদের দ্বীনকে ক্রীড়নক বানিয়েছে, তারা আমাদের ওপর অভিশপ্ত পৌত্তলিক বিধান চাপিয়ে দিয়েছে, যার মাধ্যমে তারা আল্লাহর বিধানকে বাতিল করে দিয়েছে, রাসূলের বিধানকে বাতিল করে দিয়েছে। এরপর তারা আমাদের মধ্যে এমন মানুষ দীক্ষিত করেছে, যারা আমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু তাদের অন্তরে ইসলামী বিধানের বিরুদ্ধে ঘৃণা ঢুকিয়ে দিয়েছে, তাদের জিহবা দিয়ে কুফরি-বাক্য উচ্চারণ করিয়েছে। বলিয়েছে- এ বিধান রুঢ়, কঠিন, এ বিধান আধুনিক যুগের নয়, যে যুগ উন্মত্ততার যুগ, বেলেলা সভ্যতার যুগ। তারা শরীয়াকেন্দ্রিক আইন ও বিধানকে বিদ্রূপের পাত্র বানিয়েছে, হাসি-তামাশার পাত্র বানিয়েছে, ফলে তাদের জেলখানাগুলো হাজার হাজার চোর দিয়ে ভরে গিয়েছে, কারণ তারা যে অশাস্ত্যাকর শাস্তির বিধান করেছে তা চোরকে চুরি থেকে বারণ করতে পারে না, কখনো পারবেও না, তা সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা এ ব্যাধির এলাজ হতে পারে না। এরপর তারা উচ্চশিক্ষিতদের পর্যায়ে, বিশেষ করে এ সব আইন ও বিধান যাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রণীত ও বিধিবদ্ধ হয়, তাদের মনোবিজ্ঞানের নামের একটি অ-বিজ্ঞান ঢুকিয়ে দিয়েছে, যা কেবলই দ্বন্দ্বিকতার দোষে দুষ্ট নানা জনের খেয়ালখুশির নামান্তর। কুফরির ইমামদের এক এক জনের এ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রয়েছে নিজস্ব বক্তব্য যা অন্যের বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। এরপর তারা প্রয়োগে এসে চোরদের পক্ষে মনোবিজ্ঞান থেকে ওয়র তালাশ করায় লিপ্ত হয়েছে। এরপর সঙ্কট আরও ঘোরতর হয়েছে, যখন চোরদের এমন কথা লিখতে বলেছে, যার দ্বারা তাদের অপরাধের পক্ষে ওয়র তালাশ করা হবে। যারা চোরদের পক্ষে কথা বলে, তারা অবশ্যই জানে যে চুরির অপরাধ প্রতিষ্ঠিত, অতঃপর তারা তা অস্বীকার করে না, বরং তার সঙ্গীনতা লাঘব করার চেষ্টা করে, চোরের মনোজগৎ ও পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে গবেষণা করে!! আমি এই ক্ষেত্রের বাধা-বাধা লোকদের সঙ্গে বিতর্ক করেছি, দেখেছি যে তাদের একমাত্র কথা হলো, আল-কোরানের বিধান আধুনিক যুগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়!! তারা আরও বলেন, অপরাধী নিছক এক অসুস্থ ব্যক্তি যার শাস্তি নয়, বরং চিকিৎসার প্রয়োজন। তারা ভুলে যান যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, **لَا تَجِدُ أُمَّةَ إِلَّا خَلَا كَسْبًا يَمَّا جَزَاءٌ** তাদের অর্জনের প্রতিদান ও আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় আজাবস্বরূপ’ - (সূরা আল মায়েদা, ৩৮)।

আল্লাহ তাআলা হলেন সকল সৃষ্টির স্রষ্টা, তিনি তাদের বিষয়-আশয়ে সমধিক অবহিত, তিনি মহাপরাক্রশালী, প্রজ্ঞাময়। তিনি অন্যান্য চোরদের সম্মুখে দৃষ্টান্ত কায়মের জন্য এ শাস্তির বিধান দিয়েছেন, যা অকাটা ও সুস্পষ্ট। অতএব তারা কোন দিকে যাচ্ছে? আমরা যারা মুসলমান, তাদের কাছে এ বিধানটি আকীদাসংশ্লিষ্ট একটি বিষয়, ঈমানের এক

অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইসলাম নামধারীদের যারা চোরের হাতকাটা অস্বীকার করে, যারা এ বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের কাছে আমার প্রশ্ন,

আপনাদের কি আল্লাহর প্রতি ঈমান আছে? তিনি যে জ্বিন-ইনসানসহ সকল সৃষ্টির স্রষ্টা তা কি আপনারা মানেন? যদি তারা বলে, হ্যাঁ, আমরা বিশ্বাস করি, তবে বলব, আল্লাহ তাআলা যে সকল বিষয় সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত, সৃষ্টিজীব নিজ সম্পর্কে যা জানে, তার থেকে অধিক জানেন আল্লাহ তাআলা, কিসে তাদের কল্যাণ এবং কিসে অকল্যাণ এ বিষয়েও তিনি সমধিক জ্ঞাত, এ কথা কি বিশ্বাস করেন? তারা বলবে, হ্যাঁ। বিশ্বাস করি। এবার প্রশ্ন হবে, আল্লাহ তাআলা যে তাঁর নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিদায়েত ও সত্যদ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, তার ওপর কোরান নাজিল করেছেন, যাতে আছে মানুষের জন্য হিদায়েত, ইহ-পরকালের কল্যাণ, এ কথা কি মানেন? তারা বলবে, হ্যাঁ, মানি। এবার প্রশ্ন হবে, তাহলে কি বিশ্বাস করেন যে, **فَاقْطِعُوا لِسَارِقَةَ وَالسَّارِقِ أَيْدِيَهُمَا** (আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও) আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছেন? তারা বলবে, হ্যাঁ, বিশ্বাস করি, তবে বলব, তাহলে আপনারা কোনদিকে মুখ ফেরাচ্ছেন? আপনারা কোন শরীয়ত বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছেন?

আর যদি মুসলিম নামধারী কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের কোনো একটির ব্যাপারে না-বাচক জবাব দেয়, তবে তো আর কোনো কথা নেই, তার পরিণতি কী তাতে আমাদের জানাই হয়ে গেল; কেননা প্রত্যেক মুসলিমই জানে, হোক সে জ্ঞানী বা মূর্খ, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যে, যে ব্যক্তি উল্লিখিত কোনো প্রশ্নের জবাবে না-বাচক জবাব দেবে সে মুসলমানদের দল থেকে বের হয়ে মুর্তাদদের কাতারে शामिल হয়ে যাবে। আর যারা শুরু থেকেই অমুসলিম, যারা মুসলমান নামধারী নয়, তাদের সঙ্গে তো এ ব্যাপারে আমরা কোনো তর্কে যাব না, এ ব্যাপারে তারা কোনো কথা বললে তাতে আমরা অংশ নিব না; কেননা আমরা যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছি, তারা সে-সবের প্রতি ঈমান আনেনি। [বর্তমান বিশ্বের চিন্তাজগতে অমুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। বৈজ্ঞানিক গবেষণার লেবাসে তারা তাদের চিন্তাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছে এবং দিচ্ছে, মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনাকে প্রভাবিত করছে। অতএব এ পরিস্থিতিতে আমাদের যা করণীয় তা হলো স্বচ্ছ আকীদা-বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে ধারণ করে বিশ্বময় ইসলামী চিন্তার আধিপত্য কায়েমের জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে যাওয়া, এ ক্ষেত্রেই সকল শক্তি নিয়োগ করা। চিন্তাকে চিন্তা দিয়ে পরাহত করা। যারা আল্লাহকে ভালোবাসেন, তাঁর রাসূলকে ভালোবাসেন এবং আল্লাহর বিধানকে সমুন্নত দেখতে চান, তাদের উচিত এ ময়দানে সামর্থ্যানুযায়ী অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা, শ্রম দেয়া।

[অনুবাদক] মুসলিম নামধারী ওইসব লোকেরা যদি বুদ্ধিমান হতো, তবে বুঝতে পারত, প্রতি বছর যদি মাত্র কয়েকজন চোরের হাতও কাটা হত, তবে সমগ্র দেশকে চোরের উৎপাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হত। সারা বছর হয়তো মাত্র কয়েকটি চুরির ঘটনা ঘটত, যা হিসেবে আসার মতো না। ফলে জেলখানাগুলোও হাজার হাজার চোর দিয়ে ভরে রাখতে হতো না। তারা বুদ্ধির পরিচয় দিলে এরূপ করত, তবে তারা ব্রাহ্মপথে চলতেই যেন জেদ ধরে আছে, তাদের মনিবদের, নেতাদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে।' [উমদাতুত-তাকফির

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৭২ : সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে কাফের বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন

সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে কাফের বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন আকীদায়ে তাহাবিয়া'র ব্যাখ্যাকার বলেন, 'সকল বাতিল বিদআতজাত বিকৃত কথা যা রাসূলের (স.) এর সাব্যস্তকৃত বিষয়কে অ-সাব্যস্ত করে, অথবা অ-সাব্যস্তকৃত বিষয়কে সাব্যস্ত করে, অথবা যা নিষিদ্ধ তার নির্দেশ প্রদান করে, অথবা যা নির্দেশিকৃত তা নিষিদ্ধ করে এমন সব কথার ক্ষেত্রে সত্য কি তা বয়ান করা হবে। এ জাতীয় কথাবার্তার যে শাস্তি আল-কোরানে আছে, তা বয়ান করা হবে, বলা হবে যে, এরূপ বলা কুফরি, এবং যে এরূপ বলে সে কাফের। তবে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে যদি বলা হয়, অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে আপনারা কি সাফ্য দেন যে, সে জাহান্নামী, সে কাফের? তবে এই ব্যক্তির কাফের হওয়ার ব্যাপারে সাফ্য দেয়া হবে না, যতক্ষণ না এমন বিষয় পাওয়া যাবে যার ওপর ভিত্তি করে এমন সাফ্য দেওয়া যাবে; কেননা সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে এরূপ প্রচার করা বড় জুলুম হবে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, আল্লাহ তাকে রহম করবেন না, বরং তাকে জাহান্নামে চিরস্থায়ী করবেন; এটাতো হলো মৃত্যুর পর কাফের ব্যক্তির হুকুম। [অর্থাৎ এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহর, মানুষের নয়।] কেননা, হতে পারে যে, সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি ইজতেহাদী ভুল করেছে যা ক্ষমা হয়ে যায়, অথবা হতে পারে যে তার কাছে শরীয়তের অন্যান্য টেক্সট পৌঁছেনি, অথবা হতে পারে যে, সে অনেক বড় ঈমান ও সংকর্মের অধিকারী, যার ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন, যেমন তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন ওই ব্যক্তিকে যে বলেছে, 'আমি যখন মারা যাব, আমাকে পিষে ফেলো এরপর আমাকে ছিটিয়ে দিয়ো।' সে আল্লাহর ভয়ে এরূপ করেছে বলে আল্লাহ তাকে মা'ফ করে দিয়েছেন। [নববী প্রণীত সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ১৭/৭২]

তবে আখেরাতের ব্যাপারে আমাদের এ নীরবতার অর্থ এটা নয়, যে আমরা তার বিদআতকে রহিত করার উদ্দেশে দুনিয়াতে তাকে শাস্তি দেব না। অতএব আমরা তাকে তাওবা করতে বলব, যদি না করে তবে [সরকারিভাবে] মৃত্যুদন্ডের শাস্তি কার্যকর করব। আর যদি খোদা কথাটাই কুফরি হয়ে থাকে, তবে বলা হবে যে, এরূপ কথা কুফরি এবং যে তা বলে সে কাফের, যদি এ ক্ষেত্রের শর্তসমূহ পাওয়া যায় এবং রহিতকারী বিষয়সমূহ অনুপস্থিত থাকে। [শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ পৃ. ৩৫৭-৩৫৮]

ওপরের কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে কাফের বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। উপরন্তু কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা রয়েছে, ইসলাম নস্যাৎকারী বিষয় সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে যা বিবেচনায় আনা অত্যন্ত জরুরি, প্রথমত : শাহাদাতাইন নস্যাৎকারী বিষয় অনেক, যা হয়তো আল্লাহর প্রতি ঈমানের বিপরীত হওয়ায় শাহাদাতাইন নস্যাৎকারী, অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন, তার বিপরীত হওয়ায় শাহাদাতাইন নস্যাৎকারী। অতএব যে তা জানে এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুরআনের আয়াত ও হাদিসগুলো জানে তার উচিত হবে এ ব্যাপারে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা, মানুষকে সতর্ক করা, এর প্রকারগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করা, এ ক্ষেত্রের নীতিমালাগুলো নিজের ইলম ও যোগ্যতা অনুযায়ী বয়ান করা। কোরান সুন্নাহ থেকে এ বিষয়ক দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করা। এটা হবে দ্বীন প্রচার ও আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার, যদি ইখলাস থাকে তবে এ কাজের জন্য আল্লাহর কাছে অফুরন্ত ছাওয়ার পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয়ত : কাউকে কাফের পরিণতকারী এ সব বিষয় কুফরি বুঝানোর ক্ষেত্রে মাত্রা ও শক্তির বিবেচনায় বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত। এ সর্বের মধ্যে কোনোটা হলো কুফরি-কথাজাত যা

সরাসরি কুফরি বোঝায়, কথার দাবি হিসেবে কুফরি বোঝায় না। আবার কোনোটা হলো এমন কথা যা সরাসরি কুফরি বোঝায় না, বরং কথার দাবি হিসেবে কুফরি বোঝায়।

এই দ্বিতীয় প্রকার কথা আবার দু-ধরনের।

একটা হলো কথার নিকটবর্তী দাবি হিসেবে কুফরি বোঝায়,
আরেকটা দূরবর্তী দাবি হিসেবে কুফরি বোঝায়।

যে ব্যক্তি প্রথম প্রকারে নিপতিত হয়, তার কুফরের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া যায়। এ ব্যাপারে (ইতোপূর্বে বর্ণিত) বাধ্যকৃত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও ওয়র গ্রহণ করা হবে না, অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাধ্য হয়ে শুধু মৌখিক উচ্চারণে কুফরি-বাক্য বলল, কিন্তু তার হৃদয় ঈমানে পরিতুষ্ট রইল। দ্বিতীয় প্রকারের কাছাকাছি বিষয়েরও অভিন্ন হুকুম হবে। যেমন, কোনো ব্যক্তি দাবি করল যে, সে ইলাহ। সে যদি এ দাবি করার পাশাপাশি ইলাহ হিসেবে আল্লাহকে অস্বীকার নাও করে, তবুও সে এ কথার দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক সাব্যস্ত করছে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি দাবি করবে যে, বান্দাদের জন্য হালাল-হারাম নির্ধারণ করার অধিকার তার আছে, যা উলুহিয়াতের একটি বৈশিষ্ট্যগত দাবি, তবে একই ধরনের অন্যায় করল। অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে যে এ মহাবিশ্ব অনাদিকাল থেকে আছে, তবে এ কথার দাবি হলো, আল্লাহ তাআলা তা সৃষ্টি করেননি। এ কথার অন্যকোনো ব্যাখ্যা নেই। শক্তির বিবেচনায় এ কথা সরাসরি কুফরি কথার মতোই। অতএব এ জাতীয় কথা যে বলবে, তার ওয়রও প্রত্যাখ্যাত হবে। একইভাবে যদি সরাসরি কুফরির প্রতি কোনো ব্যক্তির সন্তুষ্টচিত্ততা প্রকাশ পায়, যেমন আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলল, তুমি সত্য বলেছ, অথবা হকের ওপর আছ, তাহলে অর্থনির্দেশের ক্ষেত্রে এ কথার শক্তি সরাসরি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী কথার মতোই। কুফরি-বাক্য শক্ত হওয়ার এটাও একটা কারণ হতে পারে যে, সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি থেকে অধিকমাত্রায় কুফরি কাজ ও কথা প্রকাশ পাবে, সে তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এর মধ্যে शामिल হবে কাফেরদের সঙ্গে কোনো ব্যক্তির মুওয়ালাতের সম্পর্ক অব্যাহত রাখা, কাফেরদের মুওয়ালাতনির্ভর কার্যক্রম অধিক মাত্রায় প্রকাশ পাওয়া। কেননা প্রথা অনুযায়ী এটা অসম্ভব যে, ওয়রের কারণে আজীবন অথবা অধিকাংশ কাজ ও কথা এমন বলবে, যার দ্বারা কাফেরদের রাজি-খুশি করা উদ্দেশ্য হবে। যদি কোনো ব্যক্তি থেকে এমন কাজ বা কথা বের হয়, যার দাবি হলো ওই ব্যক্তির কাফের হয়ে যাওয়া, তাহলে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর তা আরোপ করার সময় সর্বক হতে হবে। এ দাবি যত দূরবর্তী হবে ততই সর্বকতার গুরুত্ব অধিক বেড়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে পরিবেশ-পরিস্থিতি, প্রকাশ্য ও প্রবল ইঙ্গিতমালা বিচার করে তবেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। [ইবনে হাজার আল হাইছামী, আয্যায়াজের আন ইকতিরাফিল কাবায়ের ১/৩৮]

আর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার মুসলিম জনসাধারণের নয়, বরং ইসলামী রাষ্ট্রে বিচার-ফয়সালার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। উদাহরণত, যদি কোনো ব্যক্তি আল-কোরানের কোনো অংশ নাপাক ময়লায় ফেলে দেয়, তাহলে ফকীহদের ঐকমত্য অনুযায়ী এ ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে; কেননা এ কাজের দ্বারা সে আল্লাহর কালামের অপমান করেছে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে। অতএব যদি অন্যকোনো ব্যক্তি ওই ব্যক্তিকে এরূপ করতে দেখে, তবে সে যা বলতে পারে, তা হলো যে, এরূপ কাজ কুফরি, কিন্তু যে লোকটি এ কাজ করেছে, তাকে সুনির্দিষ্টভাবে কাফের বলবে না যতক্ষণ না কমপক্ষে দু-বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবে,

এক. নিষ্পেক্ষকারী ব্যক্তি জানে যে সে যা নিষ্পেক্ষ করেছে তা কোরান।

দুই. যাতে নিষ্পেক্ষ করেছে তা নাপাক ময়লা।

নিষ্ক্ষেপকারী ব্যক্তির এ দুটি বিষয়ে জ্ঞান রয়েছে বলে যদি নিশ্চিত হওয়া যায়, যেমন সে স্বীকার করল যে জানে, তাহলে নির্দিষ্টভাবে তাকে কাফের বলা যাবে। তবে এমনও হতে পারে যে নিষ্ক্ষেপকারী ব্যক্তি মূর্খ এবং জানে না যে কি নিষ্ক্ষেপ করল, অথবা সে অন্ধও হতে পারে যে জানে না, কি নিষ্ক্ষেপ করল এবং কোথায় নিষ্ক্ষেপ করল। এমতাবস্থায় তা একটি শক্ত দলিল হবে যে সে আসলে অপমান করতে চায়নি। অতএব এই ব্যক্তিকে মায়ুর মনে করা হবে। এ কারণেই অমুক কাফের তমুক কাফের এ জাতীয় কথা বলার ক্ষেত্রে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ যতক্ষণ না স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন কুফরি প্রকাশ পাবে, যার অন্যকোনো ব্যাখ্যা নেই, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্টভাবে কাফের বলা যাবে না। আরও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ওইসব কথা ও কাজের ক্ষেত্রে যা সরাসরি কুফরি নয়, বরং যার দাবি হিসেবে কুফরি আসে, যদি এ ক্ষেত্রের শর্তসমূহ পাওয়া যায় এবং তা রহিতকারী বিষয়সমূহ না থাকে।

তৃতীয়ত : কোনো মুসলিম ব্যক্তির কাফের হয়ে যাওয়ার ওপর দুটি হুকুম বর্তায়। একটি হলো ইহকালীন হুকুম অর্থাৎ মুরতাদ ব্যক্তির ওপর ওইসব বিধান বাস্তবায়ন করা যা হাদিস অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব। এর ভিত্তি হলো, মানুষের আপাত-কাজ ও কথা বিচার করা, অন্তরে কি আছে তা বিবেচনায় না-এনে। অতঃপর মুরতাদ ব্যক্তি তাওবা না করলে তাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া, মুরতাদ ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য করে দেওয়া, মুরতাদ ব্যক্তির যবেহ করা জন্তু হারাম হওয়া, মুরতাদ ব্যক্তিকে বিবাহ না দেওয়া ইত্যাদি। এসব বিষয় বাস্তবায়নের দায়িত্ব মানুষের হাতে। তবে কিছু হুকুম এমন যা কেবল মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বভুক্ত, যেমন মুরতাদ ব্যক্তিকে তাওবা করতে বলা এবং তা অস্বীকার করলে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা। [অতএব সাধারণ কোনো নাগরিকের এ অধিকার নেই যে সে কোনো মুরতাদ ব্যক্তির ওপর মৃত্যুদন্ডের বিধান বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ নেবে] আরেকটি হুকুম হলো পরকালীন হুকুম অর্থাৎ মুরতাদ ব্যক্তির জাহান্নামে চিরস্থায়ী হওয়া। এ হুকুম বাস্তবায়ন করার কোনো অধিকার বা ক্ষমতা কোনো মানুষের নেই, তা বরং আহকামুল হাকেমীন আল্লাহর হাতে ন্যস্ত। অতএব এ দুনিয়াতে কেউ এ দাবি করতে পারবে না যে, সে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির অবস্থান জান্নাতে না জাহান্নামে তা জানে। হ্যাঁ, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন তাদের কথা আলাদা, যেমন নবি-রাসূলগণ অথবা যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, যেমন আশারায়ে মুবাশ্শারা। অথবা যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে সংবাদ দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদের জাহান্নামী হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন, যেমন আবু লাহাবের জাহান্নামী হওয়ার ব্যাপারে কুরআনেই বলা আছে। হ্যাঁ, আমরা এজমালিভাবে বলতে পারি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করল অথবা যে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে গেল সে জান্নামে চিরস্থায়ী হবে, জান্নাত তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। এটাই হলো একজন মুসলমানের সর্বশেষ সীমানা যা অতিক্রম করার অর্থ সীমালঙ্ঘন করা, যেমন আকীদায়ে তাহাবিয়ার ব্যাখ্যাকার উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে বলেছেন। ইমাম তাহাবীও অভিন্ন কথা এভাবে বলেছেন যে, 'আমরা তাদের কাউকে জান্নাতেও নামাব না, জাহান্নামেও নামাব না।' [শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ: পৃ ৪২৬]

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৭৩ : পরিশিষ্ট-০১ : গুনাহগারের হুকুম

পরিশিষ্ট -০১ : গুনাহগারের হুকুম শুধু গুনাহ করার কারণে কেউ আল্লাহর দ্বীন থেকে বের হয়ে যায় না, এ মর্মে ইমাম তাহাবীর একটি কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি, 'আহলে কিবলার কেউ যতক্ষণ না হালাল মনে করে কোনো গুনাহ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে আমরা কাফের বলব না, আমরা গুনাহকারীর ক্ষেত্রে এও বলব না যে, ঈমান থাকলে গুনাহ করাতে কোনো ক্ষতি নেই।

' ইমাম নববী র. বলেন, 'আহলে সুন্নত ও হকপন্থী পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষগণ যে ব্যাপারে একমত তা হলো- যে ব্যক্তি একস্ববাদী হিসেবে মারা গেল সে অবশ্যই জান্নাতের প্রবেশ করবে। যদি সে গুনাহ থেকে পবিত্র হয়, যেমন ছোট শিশু, পাগল, যে সাবালক হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই পাগল হয়ে গিয়েছে, যে শিরক ও অন্যান্য গুনাহ থেকে বিশুদ্ধ তাওবা করেছে- যদি তাওবার পরে কোনো পাপ-গুনাহ না-করে থাকে-, অনুরূপভাবে ঐ ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করেছেন। এদের সবাই জান্নাতে যাবে, জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। শুধু জাহান্নামে উপনীত হবে (কীভাবে উপনীত হবে সে-ব্যাপারে বিভিন্ন কথা রয়েছে) বিশুদ্ধ মতানুযায়ী উপনীত হওয়ার অর্থ-পুল সিরাতের ওপর দিয়ে অতিক্রম করা। পুল সিরাত জাহান্নামের ওপরে-পাতা পুল। (আল্লাহ আমাদের এ থেকে ও সকল কষ্টকর জিনিস থেকে হিফায়ত করুন)।

আর যার কবিরী গুনাহ রয়েছে এবং তাওবা ছাড়াই মারা গেছে, তার বিষয়টি আল্লাহ তাআলার ইখতিয়ারে, তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দেবেন অথবা তাকে ক্ষমা করে দেবেন, শুরুতেই প্রথম প্রকারের মতো জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা তিনি তাকে, যে-পরিমাণ চান সে-পরিমাণ শাস্তি দেবেন। অতএব যে তাওহীদের ওপর মারা গেল সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না, সে যত পাপই করে থাক না কেন? অনুরূপভাবে যে কুফরের ওপর মারা গেল সে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না, সে যত ভালো কাজই করে থাক না কেন? এ ব্যাপারেআহলে হকের এটাই হলো সংক্ষিপ্তাকারে শেষ কথা। কোরান, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মত এই নীতির পক্ষে দলিল। এ মর্মে কোরান সুন্নাহর বহু বাণী রয়েছে, যা অকাট্য-নিশ্চিত স্তর দেয়। এ নীতিটি আমরা মেনে নেওয়ার পর এ অধ্যায়ে [এখানে অধ্যায় বলতে ইমাম নববীর কিতাবে বর্ণিত অধ্যায়, যার শিরোনাম হলো: 'যে ব্যক্তি তাওহিদ নিয়ে মারা গেল সে নিশ্চয় জান্নাতে প্রবেশ করল।'] বর্ণিত হাদিস ও অন্যান্য হাদিসসমূহ এর ওপর বহন করব। অতএব যদি এমন কোনো হাদিস পাওয়া যায়, যা উক্ত নীতির বিপরীত, তবে তাবিল করতে হবে যাতে বিভিন্ন বাণীর মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। [নববী প্রণীত সহিহ মুসলিমে ব্যাখ্যাগ্রন্থ ১/২১৭]

অতএব যে ব্যক্তি ঈমান নিয়ে মারা গেল, ইখলাসের সঙ্গে অন্তর থেকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র সাক্ষ্য দিল, এ ব্যক্তির পরিণতি হলো জান্নাতে প্রবেশ করা ও জাহান্নামে চিরস্থায়ী না হওয়া, যতই পাপ-গুনাহ করে থাক না কেন, যতক্ষণ না সে তা হালাল মনে করবে, অথবা দ্বীনের এমন কোনো বিষয় অস্বীকার করবে যা স্বতসিদ্ধভাবে সবার কাছেই জানা, অথবা এমন কিছু করবে বা বলবে যা (ইতোপূর্বে উপস্থাপিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী) শাহাদাতাইনকে নস্যাত করে দেয়। অতএব শুধু গুনাহ করা শাহাদাতাইন নস্যাতকারী হিসেবে বিবেচিত হবে না, আর না তা কারও চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকার কারণ হবে। এ মৌলনীতির পক্ষে বহু হাদিস রয়েছে, যা স্পষ্টবাক্যে বলে যে, জান্নাত হলো প্রত্যেক ওইব্যক্তির পরিণতি যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র সাক্ষ্য দিল, অন্তরে ইখলাসের সঙ্গে এ সাক্ষ্যের সত্যতা বিশ্বাস করে নিল-এ দুটি বিষয়ের সমন্বয়কেই তাওহিদ বলা হয়। এর পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে

এসেছেন তা সত্য হিসেবে জানল। এ মর্মে বর্ণিত হাদিসসমূহের কিছু স্পষ্ট বক্তব্যে বলেছে যে কবিরী গুনাহ, সর্বশেষ পরিণতি হিসেবে, জান্নাতে প্রবেশের পথে বাধা হবে না, যদিও মুমিনকে এর কারণে জাহান্নামে আজাব দেয়া হয়। নিচে এ জাতীয় কিছু হাদিস উল্লেখ করা হলো,

১ - উসমান (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মারা গেল, আর সে জানে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করল।' [মুসলিম, আস-সহিহ (নববীর ব্যাখ্যাসহ) ১/২১৮]

২ - আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এবং আমি আল্লাহর রাসূল, সন্দেহমুক্তভাবে যে এ সাক্ষ্যদ্বয় নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' [প্রাগুক্ত: ১/২২৪]

৩ - উবাদা ইবনে সামেত (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, আর ঈসা আল্লাহর বান্দা ও তাঁর বান্দীর সন্তান এবং আল্লাহর নির্দেশ যা মারয়ামের ওপর আরোপ করেছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রুহ, আর জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য- আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতের আট দরজার মধ্যে যেটা দিয়ে প্রবেশ করতে চাইবে সেটা দিয়েই প্রবেশ করাবেন। অন্য-এক বর্ণনায় এসেছে, 'আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তার আমল যাই হোক না কেন।' [মুসলিম, আস-সহিহ ১/২২৭; বুখারি এ হাদিসটি আহাদীসূল আশ্বিয়া অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেছেন।]

৪ - আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ঈমানের স্বাদ গ্রহণে ঐ ব্যক্তি সক্ষম হলো যে, রব হিসেবে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত হলো, দ্বীন হিসেবে ইসলামের প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত হলো এবং রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদের (সা.) প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত হলো।' [প্রাগুক্ত ২/২]

৫ - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'জান্নাতের অধিবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামের অধিবাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, এরপর আল্লাহ তাআলা বলবেন, জাহান্নাম থেকে বের করো যার অন্তরে এক সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে।' [বুখারি ও মুসলিম]

৬ - মা'রুর ইবনে সুয়েদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু যর (রাযি.) কে নবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'জিবরীল আলাইহিস সালাম আমার কাছে এলেন ও সুসংবাদ দিলেন, তোমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কোনো জিনিস শরীক না করে মৃত্যুবরণ করল, সে জান্নাতে প্রবেশ করল, আমি বললাম, যদিও সে যিনা করে, যদিও সে চুরি করে? তিনি বললেন, যদিও সে যিনা করে, যদিও সে চুরি করে।' [বুখারি ও মুসলিম]

ইমাম নববী র. এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি মুশরিক অবস্থায় মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং যে অমুশরিক [মুমিন] অবস্থায় মারা যাবে সে জান্নাতে যাবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হুকুমের ব্যাপারে আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। মুশরিকরা সাধারণ অর্থেই জাহান্নামে যাবে এবং সেখানে চিরস্থায়ী হবে, এ ক্ষেত্রে কিতাবি- তথা ইহুদি-নাসারা-, মূর্তিপূজক ও অন্যান্য সকল কাফেরদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আহলে হক এ ক্ষেত্রে গোঁ কাফের ও অন্যান্য কাফেরদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন না, না তারা পার্থক্য করেন অমুসলিম ব্যক্তি ও মুসলিম ব্যক্তির মধ্যে যে অস্বীকৃতি ইত্যাদির কারণে কাফের হয়েছে। আর যে ব্যক্তি অমুশরিক [মুমিন] অবস্থায় মারা গেছে, তার জান্নাতে প্রবেশের বিষয়টি সুনিশ্চিত। আর এ অমুশরিক ব্যক্তি

যদি কবিরী গুনাহকারী হয়, কিন্তু কবিরী গুনাহ করে যাওয়ার প্রতি তার সঙ্কল্প ছিল না, তাহলে সে শুরুতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যদি কবিরী গুনাহ করে যাওয়ার সঙ্কল্প নিয়েই মারা যায়, তাহলে তার ব্যাপারটি আল্লাহর ইচ্ছাধীন, তিনি যদি চান মাফ করে দেবেন এবং শুরুতেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, আর যদি চান আজাব দেবেন এবং পরবর্তীতে জাহান্নাম থেকে বের করে চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতে থাকতে দেবেন। আর ‘যদিও যিনা করে, যদিও চুরি করে’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথাটি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের এ অভিমতের দলিল যে, কবিরী গুনাহকারীরী জাহান্নামে যাবেই তা অকাট্যভাবে বলা যাবে না, আর যদি জাহান্নামে যায় তাহলে তাদের বের করে নিয়ে আসা হবে এবং তাদের শেষ পরিণতি হবে চিরস্থায়ী জান্নাত।’ [ইমাম নববী প্রণীত সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ২/৯৭]

ইমাম নববী র. এর একটি কথা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ‘যদি কোনো হাদিসের আপাত-অর্থ এর (অর্থাৎ এ মূলনীতির) বিপরীত হয়, তবে এ অনুযায়ী তা তাবিল করে নিতে হবে, যাতে শরীয়তের বিভিন্ন টেক্সটের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।’ বস্তুত, এ ধরনের হাদিস বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে- কোনোটির আপাত-অর্থ থেকে বুঝা যায় যে কবিরী গুনাহকারীর ঈমান নেই, কোনোটির ভাষ্য মতে কবিরী গুনাহকারী থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন, আবার কোনোটিতে বিশেষ কিছু কবিরী গুনাহকে কুফরি ও শিরক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নিচে আমরা এ জাতীয় কিছু হাদিস উল্লেখ করছি,

১- ‘মুমিনকে গালমন্দ করা ফিসক এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কুফরি।’

২- ‘আমার চলে যাওয়ার পর তোমরা কাফেরে পরিণত হয়ো না, যে তোমরা পরস্পরের ঘারে আঘাত করবে [অর্থাৎ পরস্পরকে হত্যা করবে]।’ [বুখারি ও মুসলিম]

৩- ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কসম করল, সে শিরক করল।’ [আহমদ, তিরমিযি ও হাকেম]

৪- ‘দু-প্রকার মানুষের মধ্যে কুফরি আছে, কারও নসবে অপবাদ দেয়া এবং মৃতব্যক্তির জন্য চিৎকার করে কাঁদা।’ [মুসলিম, আস-সহিহ ২/৫৭]

৫- ‘যিনাকারী যখন যিনা করে, সে তা মুমিন অবস্থায় করে না, চোর যখন চুরি করে, সে তা মুমিন অবস্থায় করে না, মদ পানকারী যখন মদ পান করে, সে তা মুমিন অবস্থায় করে না।’ [বুখারি ও মুসলিম]

৬- ‘যে-ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়, আর যে আমাদের ধোঁকা দিল সেও আমাদের দলভুক্ত নয়।’ [মুসলিম, আস-সহিহ (নববীর ব্যাখ্যাসহ)

২/১০৮]

৭- ‘যে গাল চাপড়াল, পকেট ফারল অথবা জাহেলি আহবানে আহবান করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।’ [বুখারি ও মুসলিম]

এ জাতীয় আরও হাদিস আছে, যেগুলোকে কেবল খারিজী সম্প্রদায়-ই আপাত অর্থে ব্যবহার করেছে এবং কবিরী গুনাহকারীকে কাফের হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। আর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের অবস্থান হলো, এ জাতীয় হাদিস তাবিল করা হবে যাতে উল্লিখিত মূলনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আলেমগণ শুধু এতটুকুতেই একমত হয়েছেন, কি অর্থে তাবিল করা হবে সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। কেউ বলেছেন, উল্লিখিত হাদিসসমূহে যে কুফরি বা ধর্মচ্যুতির কথা বলা হয়েছে, তা হলো কুফরে নিয়ামত (আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করা) যা একজন মুসলিমকে অমুসলিমে পরিণত করে না। কেউ বলেছেন যে, এখানে উদ্দেশ্য হলো, কঠিনভাবে হুঁশিয়ার করা ও ভীতি প্রদর্শন করা। কেউ বলেছেন যে, যে ব্যক্তি হাদিসে উল্লিখিত গুনাহগুলো- হারাম জানা সত্ত্বেও- হালাল মনে করে করে, সে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় বলে ঘোষণা

করা হয়েছে। যারা এরূপ বলে তারা কুফরিকে মূল অর্থে নিয়েছেন এবং বলেছেন, যে ব্যক্তি হাদিসে উল্লিখিত গুনাহগুলো হালাল মনে করে করবে সে কাফের-মুর্তাদ হয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ অন্য পন্থায় তাবিল করেছেন-প্রতিটি হাদিসের ভিন্ন-ভিন্ন তাবিল করেছেন, উল্লিখিত মূলনীতি (কবির গুনাহকারীরা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না) -র সঙ্গে সাম্যুজ্য রেখে, তারা সকল হাদিসের একটি সামগ্রিক তাবিল করেননি। আবার কেউ কেউ এভাবে তাবিল করেছেন যে, উদ্দেশ্য হলো ঐসব কথা ও কর্ম বয়ান করা যা ঈমানের নয় বরং কুফরের ফলাফল ও দাবি হিসেবে প্রকাশ পায়। ঈমান এরূপ কথা ও কাজ দাবি করে না, বরং তা থেকে দূরে থাকতে বলে। [দেখুন আবু উবাইদ আল কাসেম ইবনে সাল্লাম, পৃ: ৮৪ ও তৎপরবর্তী।]

ইমাম আবু উবাইদ আল কাসেম ইবনে সাল্লাম র. ওপরে বর্ণিত কিছু তাবিল উল্লেখ করে তা দুর্বল বলে মন্তব্য করেন ও বলেন, 'এ অধ্যায় সম্পর্কে আমাদের কথা হলো, পাপ-গুনাহ ঈমান অপসারণকারী নয়, না তা কুফরি আবশ্যিককারী, কিন্তু তা ঈমানের হাকিকত ও ইখলাস ঐকান্তিকতা নস্যাত করে দেয়, যা মুমিনদের একটি গুণ বলে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন এবং আল-কোরানের কোথাও কোথাও তা মুমিনদের অবশ্যপালনীয় শর্ত হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

بِأَنَّ وَأَمْوَالَهُمْ أَنْفُسَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ اشْتَرَى اللَّهُ إِنَّ حَقًّا عَلَيْهِ وَعَدًّا وَيُقْتَلُونَ فَيُقْتَلُونَ اللَّهُ سَبِيلَ فِي يُقَاتِلُونَ الْجَنَّةَ لَهُمْ فَاسْتَبْشِرُوا اللَّهَ مِنْ بَعْدِهِ أَوْفَى وَمَنْ وَالْقُرْآنَ نُجِيلًا وَالْثَوْرَةَ فِي النَّائِبُونَ . الْعَظِيمُ الْقَوْرُ هُوَ وَذَلِكَ بِهِ بَايَعْتُمْ الَّذِي بَيَّعَكُمْ الْأَمْرُونَ السَّاجِدُونَ الرَّكَعُونَ السَّائِحُونَ الْخَامِدُونَ الْعَابِدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرَ اللَّهُ لِحُدُودٍ وَالْخَافِضُونَ الْمُتَكِرِّ عَنْ النَّاهُونَ عَزُوفِيَالَمْ

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে)

যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সংগে) যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য। তারা তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকুকারী, সিজ্দাকারী, সংকাজের আদেশদাতা, অসংকাজের নিষেধকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা হেফাযতকারী। আর মুমিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও' - (সূরা আত্তাওবা, ১১১-১১২)।

صَلَاتِهِمْ فِي هُمُ الَّذِينَ . الْمُؤْمِنُونَ أَفْلَحَ قَدْ لِلزَّكَاةِ هُمُ وَالَّذِينَ . مُعْرِضُونَ اللَّغْوِ عَنْ هُمُ وَالَّذِينَ . خَاشِعُونَ مَا أَوْ أَرْوَاجِهِمْ عَلَى إِلَّا . خَافِضُونَ لِفِرْوَاجِهِمْ هُمُ وَالَّذِينَ . قَاعِلُونَ أُولَئِكَ ذَلِكَ وَرَاءَ ابْتِغَى قَمَن . مَلُومِينَ غَيْرُ فَإِنَّهُمْ أَيْمَانُهُمْ مَلَكَتْ هُمُ وَالَّذِينَ . رَاعُونَ وَعَهْدِهِمْ لِأَمَانَاتِهِمْ هُمُ وَالَّذِينَ . الْعَادُونَ هُمُ يَرِثُونَ الَّذِينَ . الْوَارِثُونَ هُمُ أُولَئِكَ . يُخَافِضُونَ صَلَوَاتِهِمْ عَلَى

অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে, যারা নিজদের সালাতে বিনয়াবনত। আর যারা অনর্থক কথাকর্ম থেকে বিমুখ। আর যারা যাকাতের ক্ষেত্রে সক্রিয়। আর যারা তাদের নিজদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী। তবে তাদের স্ত্রী ও তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে তারা ছাড়া, নিশ্চয় এতে তারা নিন্দিত হবে না। অতঃপর যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। আর যারা নিজদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকারে যত্নবান। আর যারা নিজদের সালাতসমূহ হিফাযত করে। তারাই হবে ওয়ারিস। যারা ফিরদাউসের অধিকারী হবে। তারা সেখানে স্থায়ী হবে' - (সূরা আল মুমিনুন, ১-১১)।

عَلَيْهِمْ ثَلِيثٌ وَإِذَا قُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ لِلَّهِ ذُكِرَ إِذَا الَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا الصَّلَاةُ يُقِيمُونَ الَّذِينَ . يَتَوَكَّلُونَ رَبَّهُمْ وَعَلَى إِيْمَانًا زَادَتْهُمْ أَيْمَانُهُ

نَدَّ دَرَجَاتُ لَهُمْ حَقًّا الْمُؤْمِنُونَ هُمْ أُولَئِكَ . يُنْفِقُونَ رِزْقَنَا هُمْ وَمِمَّا
كَرِيمٌ وَرِزْقٌ وَمَغْفِرَةٌ رَبِّهِمْ .

‘মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে। যারা সালাত কয়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছি, তা হতে ব্যয় করে। তারাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট উচ্চ মর্যাদাসমূহ এবং ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয়ক - (সূরা আল আনফাল, ২-৪)।

আবু উবাইদ বলেন, ‘এ আয়াতগুলো, যা বান্দাদের ওপর ফরজকৃত শরীয়তের ব্যাখ্যা-বর্ণনা দিচ্ছে, সকল পাপ থেকে তাদের মুক্ত থাকতে বলছে, এরপর ঐসব হাদিস এসে তা ব্যাখ্যা করেছে যাতে আছে ঈমানের গুণবৈশিষ্ট্য ও দাবির বর্ণনা। এরপর যখন গুনাহ এসে এইসব গুণে গুণান্বিত ঈমানের সঙ্গে মিশ্রিত হয়, তখন বলা হয়, এটা ঐ শর্তসমূহের বিপরীত, যা আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ওপর আরোপ করেছেন, না তা ঐসব আলামতের মধ্যে পড়ে যার দ্বারা আহলে ঈমানদের চেনা যায়। অতএব পাপী মুমিনদের যথার্থ ঈমান [তথা ইখলাস ও স্বচ্ছতা] নেই বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে, তবে তাদের তখনো ঈমান অভিধাটি বহনকারী হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে, পাপী-মুমিন থেকে ঈমান অভিধাটি অপসারিত না হলে, কি করে বলা শুদ্ধ হবে যে, সে মুমিন নয়? এর উত্তর হলো, এ ধরনের অভিব্যক্তি আমাদের আরবি ভাষায় প্রচুর। কোনো ব্যক্তি যখন যথার্থরূপে কোনো কাজ করে না, তখন বলা হয়, ও ওই কাজটিই করেনি। উদাহরণত যদি কোনো তৈরিকারী তার তৈরিকৃত বস্তুটি নিখুঁতভাবে তৈরি না-করে, তবে আমরা তাকে বলি যে, তুমি কিছুই তৈরি করনি, তুমি কোনো কাজই করনি। এখানে যা খন্ডন করা হচ্ছে, তা হলো উত্তমতা ও নৈপুণ্যসহ কাজ করা। মূল কাজকে সমূলে নাকচ করা হচ্ছে না। অর্থাৎ সে নামেমাত্র তৈরিকারী, নৈপুণ্য ও যথার্থতার বিচারে সে তৈরিকারী নয়। আরবরা বরং এর থেকেও আরও কঠিন কথা বলে, যেমন একব্যক্তি তার পিতাকে কষ্ট দেয়, নির্যাতন করে। অতঃপর তারা বলে যে, এ আসলে ওর সন্তানই না। যদিও তারা জানে লোকটি তার সন্তান। ভাই ও স্ত্রীর ব্যাপারেও অভিন্ন কথা বলা হয়। এরপর আবু উবাইদ বলেন, অনুরূপভাবে যেসব হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন, তা আরবদের এ কথার মতো যে, যে ব্যক্তি এই করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। এ ক্ষেত্রে আহলে সুন্নতের মাযহাব অনুযায়ী অর্থ হবে যে, সে আমাদের আনুগত্যকারী নয়, আমাদের অনুসরণকারী নয়, আমাদের শরীয়ত গুরুত্বসহ চর্চাকারী নয়। আর যেসব হাদিসে গুনাহকারী ব্যক্তির কাফের অথবা মুশরিক হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, আমাদের কাছে তার অর্থ ঐ ব্যক্তির আদতেই কাফের অথবা মুশরিক হয়ে যাওয়া নয়, বরং বলা হবে যে, সে এমন কাজ করেছে, যা কাফের ও মুশরিকদের আদত-অভ্যাস ও রীতি-নীতির আওতাভুক্ত। [আবু উবাইদ আল কাসেম ইবনে সাল্লাম পৃ. ৮৯ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।]

এ জাতীয় তাবিলের আবশ্যকতার পেছনে বেশ কিছু শক্তিশালী কারণ রয়েছে, যা উল্লিখিত হাদিসের তাবিল দাবি করে। এ সব কারণের কয়েকটি হলো নিম্নরূপ,

প্রথমত : এমন বহুল সংখ্যক হাদিস যা পাপী ও কবিরা গুনাহকারী ব্যক্তিদের চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকার কথা বলে না, বরং শেষটায় তারা জান্নাতে যাবে বলে ঘোষণা করে, হয়ত সাময়িকভাবে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করার পর, অথবা অতি দয়ালু পরম ক্ষমাশীল আল্লাহ তাআলা তাকে মফ করে দেয়ার পর। এ পর্যায়ের কিছু হাদিস ওপরে গিয়েছে, যার কয়েকটিতে এমন কিছু কবিরা গুনাহের উল্লেখ আছে, যা অন্য হাদিসে যেসব আমলকে

কুফরি বলা হয়েছে, তা থেকেও মারাত্মক। যেমন যিনা ও চুরি, যা মুমিনকে গালমন্দ করা অথবা, মৃতব্যক্তির জন্য চিল্লিয়ে রোনাজারি করার চাইতেও মারাত্মক। অথচ শেষোক্ত দুটি আমলকে কুফরি বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : হাদিসসমূহে যেসব বিষয়কে কুফরি বলা হয়েছে, তা যদি মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কারণ হত, আল্লাহর দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণ হত, তাহলে মুরতাদদের ওপর যে শাস্তি আরোপিত হয়, এ ধরনের পাপে পাপীদের ওপরও একই শাস্তি প্রযোজ্য হতো, অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার শাস্তি, যা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তার দ্বীন পরিবর্তন করল, তাকে মেরে ফেলো।’ [فاقتلوه دينه بدل من] (বুখারি, কিতাবু জিহাদ)। অনুরূপ আমরা জানি যে, চোরের হাত কাটা এবং যিনাকারী ও সতী নারীর চরিত্রে অপবাদদাতাকে বেত্রাঘাত করতে বলা হয়েছে। অতএব যদি পাপকারী পাপের কারণে কাফের হয়ে যেত, তাহলে এদের শাস্তিও হত্যা ছাড়া অন্য কিছু হতো না। এরা যদি কাফের হতো তাহলে এদের শাস্তি হাত কাটা ও বেত্রাঘাত করা হতো না, হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির ওলীর পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেয়ার সুযোগও থাকত না; কারণ কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকেই মুরতাদকে ক্ষমা করে দেওয়া সুযোগ নেই। অথচ কোরান-সুন্নাহর টেক্সট ও ইজমায়ে উস্মত মূতাবেক অবিবাহিত যিনাকারী, চোর ও অপবাদদাতাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না, বরং তাদের ওপর শরঈ হদ কায়ম করা হয়; এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা মুরতাদ নয়।’ [শারহুল আকাদীয়া আত্-তাহাবিয়াহ পৃ.২৬১]

তৃতীয়ত : আমরা আল-কোরানে এমন কিছু টেক্সট পাই, যা কবির গুনাহকারীকে মুমিন বলে সম্বোধন করেছে, তাকে মুমিনের ভাই হিসেবে খেতাব করেছে।

الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ أُيْهَا يَا أَخِيهِ مِنْ لَهُ غُفِيَ فَمَنْ بِالْأُنْثَى وَالْأُنْثَى بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ الْحُرُّ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبَاعُ شَيْءٍ

হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর ‘কিসাস’ ফরয করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী। তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে সততার অনুসরণ করবে’ – (সূরা আল বাকারা, ১৭৮)।

উক্ত আয়াতে, আল্লাহ তাআলা, হত্যাকারীকে মুমিনদের দলভুক্ত রেখেই উল্লেখ করেছেন, তাকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের ভাই হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর ব্রাতৃষ বলতে এখানে দ্বিনি ব্রাতৃষ বুঝানো হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।’ [শারহুল আকীদা আত্-তাহাবিয়াহ পৃ.২৬১]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা বলেন, اقْتَتِلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَتَانِ وَإِنْ غِيَبَ الْتِي فَقَاتِلُوا الْآخَرَى عَلَى إِحْدَاهُمَا بَعَثَ فَإِنْ بَيْنَهُمَا فَاصْلِحُوا وَأَفْسِطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاصْلِحُوا فَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ إِلَى تَفِيءٍ حَتَّى أَخَوَيْكُمْ بَيْنَ فَاصْلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا . الْمُقْسِطِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنْ تَرَحَّمُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا

‘আর যদি মুমিনদের দু’দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সঙ্গে মীমাংসা কর এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন। নিশ্চয়

মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ- মীমাংসা করে দাও' - (সূরা আল-হজুরাত, ৯-১০)।

পবিত্র টেক্সট অনুযায়ী পাপের জন্যে নির্ধারিত শাস্তিকে আহলে সুন্নত প্রমাণ করে, ওনাহ যত বড় ও সঙ্গীনই হোক না কেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত, এর কারণে, একজন মুমিনকে মুরতাদ হিসেবে গণ্য করে না যতক্ষণ না তা কুফরের কোনো কারণ সংবলিত হবে। তারা বলে না, ঈমানের সঙ্গে কোনো ওনাহ ক্ষতিকারক নয়। এটা হলো মুরযিয়া ফেরকার কথা। তাদের বক্তব্য হলো, ব্যক্তি যতক্ষণ মুমিন থাকবে, ওনাহ তার পক্ষে ক্ষতিকারক হবে না। এ কথা কোরান-সুন্নাহর বিপরীত। শরীয়ত প্রবর্তক, অনেক ওনাহ ও হারাম কর্মের পরকালীন শাস্তির কথা বলেছেন। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নত প্রমাণ করে যে, ওনাহর বিপরীতে পরকালে শাস্তি হবে, এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা হুঁশিয়ার করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবানেও ওনাহকারীর শাস্তিভোগের সংবাদ এসেছে। কোরান-সুন্নাহর ভাষ্য অনুযায়ী পাপ-ওনাহ ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে, তবে ঈমান অবশিষ্ট থাকা অথবা সমূলে নস্যাৎ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি পাপের প্রভাবের আওতাভুক্ত নয়। বরং অতিমাত্রায় ওনাহ করে যাওয়া কখনো কখনো ব্যক্তিকে কুফরি ও রিদায় নিপতিত করে, কেননা, হতে পারে যে এমন ব্যক্তি নিজ কামনা-বাসনার পক্ষপাতিত্ব করতে গিয়ে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা-কিছু নিয়ে এসেছেন তার কিছু অস্বীকার করে বসবে। উপরন্তু পাপ-ওনাহ ও কামনা-বাসনার অনুসরণ যখন বেড়ে যায় তখন ব্যক্তির অন্তর মৃত্যুবরণ করে। এ সময় তা পাপী ব্যক্তিকে নানা ধরনের তাবিল ও যুক্তি দাঁড় করাতে উদ্বুদ্ধ করে, এমনকি একসময় সে ওনাহকে হালাল জ্ঞান করতে শুরু করে। ফলে সে কাকের হয়ে যায়- নাউযুবিল্লাহ। উল্লিখিত টেক্সটসমূহের আপাত-অর্থ হলো, ঈমানসহ মারা যাওয়ার মানে হলো জান্নাতে প্রবেশ করা। যেমন- 'যে ব্যক্তি মারা গেল, আর সে জানে যে, আল্লাহর ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করল।' [মুসলিম, আস-সহিহ (নববীর ব্যাখ্যাসহ) ১/২১৮] এ

থেকে মুরযিয়া ফেরকা ধারণা করে নিয়েছে যে, জান্নাতে প্রবেশের অর্থ শাস্তিভোগ না-করা। তবে এ দুটোর মধ্যে আবশ্যিক কোনো সম্পর্ক নেই। বরং পাপী মুমিনকে আল্লাহ ইচ্ছে করলে শাস্তি দেবেন, এরপর, পরিশেষে [নববী প্রণীত সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ১/২১৯], জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। [নববী প্রণীত সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ১/২১৯]

তারা হয়তো আল-কোরানের নিম্নোক্ত আয়াতটিকেও দলিল হিসেবে পেশ করেন, عَلَىٰ لَيْسَ اَتَّقُوا مَا اِذَا طَعِمُوا فِيمَا جُنَّاهُ الصَّالِحَاتِ وَغَمِلُوا اَمَنُوا اَلَّذِينَ الصَّالِحَاتِ وَغَمِلُوا وَامَنُوا

‘যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তারা যা আহার করেছে তাতে কোনো পাপ নেই, যখন তারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ঈমান আনে আর নেক আমল করে’ - (সূরা আল মায়েদা, ৯৩)

উক্ত আয়াতটি, মদ হারাম হওয়ার পূর্বে সাহাবীদের (রাযি.) মধ্যে যারা পরলোকগত হয়েছেন, তাদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে; কেননা তখনো মদপান পরিত্যাগ করার নির্দেশ আসেনি। আয়াতটির শানে-নুযূল এ কথার সাক্ষী। বর্ণনায় এসেছে, কুদামা ইবনে আবদুল্লাহ ও অন্য কয়েকজন মুসলিম মদ হারাম হওয়া সত্ত্বেও মদ পান করেন, ও আল্লাহ তাআলার কথা - ‘যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তারা যা আহার করেছে তাতে কোনো পাপ নেই, যখন তারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ঈমান আনে আর নেক আমল করে’ - এর তাবিল করেন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)-কে এ ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া হলে, তিনি, আলী ইবনে আবি তালেব ও সকল সাহাবী এ কথার ওপর একমত হন যে, যদি

এরা মদ হারাম হওয়ার বিষয়টি মেনে নেয়, তবে কেবল বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রদান করা হবে। আর যদি হালাল হওয়ার কথায় অবিচল থাকে তবে এদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। উমর (রাযি.) কুদামাকে বললেন, যদি তুমি তাকওয়া অবলম্বন করতে, ঈমান অটুট রাখতে, সংকাজ করতে তবে মদ পান করতে না; কারণ এ আয়াতটি নাজিল হওয়ার পটভূমিকা হলো, আল্লাহ তাআলা যখন মদপান হারাম করেন- আর তা ওহদযুদ্ধের পরে হারাম হয়- সাহাবীদের কেউ কেউ বললেন, তাহলে আমাদের সাথীদের কী হবে যারা মারা গেছে এবং মদ পান করত? অতঃপর আল্লাহ তাআলা এ আয়াতটি নাজিল করলেন। এতে তিনি বলেছেন যে, কোনো জিনিস হারাম হওয়ার পূর্বে যদি কেউ তা খেয়ে থাকে তবে এতে কোনো অপরাধ হবে না, যদি সে মুমিন, মুত্তাকী ও নেক-আমলকারী হয়। [তাকসিরে কুরতুবি ৬/২৯৩; শারহুল আকীদা আত্-তাহাবিয়্যাহ পৃ. ৩৬৪-৩৬৫]

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৭৪ : পরিশিষ্ট-০২ : কবির গুনাহের সংজ্ঞা ও মানদণ্ড

পরিশিষ্ট-০২ : কবির গুনাহের সংজ্ঞা ও মানদণ্ড কবির গুনাহ কবির কি ছগিরা, এটিই হলো সকল গুনাহের হুকুম- আল্লাহ সকল গুনাহ থেকে বান্দাদের হুঁশিয়ার করেছেন। অতএব মুমিনের ওপর আবশ্যিক হলো তাকওয়া-পরহেজগারিতে নিজেকে সজ্জিত করা, তাকওয়ার রসদ যত বেশি পারা যায় সংগ্রহ করা। সকল হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখা, আল্লাহর নির্ধারিত সীমানায় নিজেকে আবদ্ধ করে রাখা। এ ক্ষেত্রে কোনো টিলেমি বা ছাড় না দেয়া। এরূপ না বলা যে এটা তো ছগিরা গুনাহ! কারণ আল্লাহ তাআলা হুঁশিয়ার করে বলেছেন,

بِهِ يُجْزَ سُوءًا يَغْمَلُ مَنْ

‘نَصِيرًا وَلَا وَلِيًّا اللَّهُ ذُوْنِ مَنْ لَهُ يَجِدُ وَلَا

যে মন্দকাজ করবে তাকে

তার প্রতিফল দেয়া হবে। আর সে তার জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না’ - (সূরা আন-নিসা, ১২৩)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বান্দা যখন কোনো গোনাহ করে, তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে, এরপর যদি সে তাওবা করে, গুনাহ মাফ চায়, তার অন্তর অমলিন হয়ে যায়। আর যদি তাওবা না করে, তবে তা বেড়েই চলে, এমনকি এক পর্যায়ে তা পুরো অন্তরের ওপরই ছেয়ে যায়।’ [তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ। তিরমিযি বলেছেন, হাদিসটি হাসান-সহিহ।] এটাকে আল-কোরানে ‘ঢেকে-দেওয়া’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

بَلْ كَلَّا

‘يَكْسِبُونَ كَانُوا مَا قُلُوْهُمْ عَلَى رَانَ

কখনো নয়, বরং তারা যা অর্জন করত তা-ই তাদের অন্তরসমূহকে ঢেকে দিয়েছে’ - (সূরা আল মুতাক্কিফীন, ১৪)।

আলেমদের কেউ একজন বলেছেন, গুনাহর ছোটত্বের প্রতি তাকিয়ো না, যার গুনাহ করছে তার কথা মাথায় রেখো। হাসান আল বসরী র. বলেছেন, গুনাহ পরিত্যাগ করা তাওবা চাওয়ার চাইতে সহজ। [দেখুন আয্যাওয়াজের আন ইকতিরাফিল কাবায়ের ১/১২] একটি সহিহ হাদিসেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘আমি যা-কিছু থেকে তোমাদের বারণ করেছি, তা থেকে তোমরা বিরত থাকো, আর যে সবার নির্দেশ আমি তোমাদের দিয়েছি, সাধ্যমতো তোমরা তার ওপর আমল করো।’ [বুখারি ও মুসলিম]

এখানে দেখার বিষয় এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মামুরাত-যেসব বিষয় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে- এর উল্লেখ করেছেন, তখন ‘সাধ্য’র কথা বলেছেন, কিন্তু যখন মানহিয়াত- যা-কিছু করতে বারণ করা হয়েছে- এর উল্লেখ করেছেন তখন তিনি ‘সাধ্য’র কথা বলেননি, যা নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের সঙ্গীনতা-বীভৎসতা এবং তা থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয়ের আবশ্যিকতা নির্দেশ করছে। ফুযাইল বিন আযায় র. বলেন, তোমার দৃষ্টিতে গুনাহ যত ছোটো হবে, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ততো বড়ো হবে। আর তোমার দৃষ্টিতে যত বড়ো হবে, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ততো ছোটো হবে। সালফগণ বলেছেন, গুনাহ হলো কুফরির ডাক। [দেখুন আয্যাওয়াজের আন ইকতিরাফিল কাবায়ের ১/১২]

অধিক গুনাহ অন্তর শক্ত করে দেয়, ফলে অন্তর থেকে সকল কল্যাণ বিদূরিত হয়, আর তখন একজন মানুষ যাচ্ছেতাই করতে থাকে, যা-কিছু করতে ভালো লাগে করতে শুরু করে। এ অবস্থায় আল্লাহ ছাড়া শয়তানকে সে অভিভাবক বানিয়ে নেয়। শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করে, প্রবঞ্চিত করে, সত্যগ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সুযোগ পেলে কুফরি করিয়ে ছাড়ে; কারণ এটাই তার চূড়ান্ত লক্ষ্য। মুমিন ছোটো-বড়ো সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার পাশাপাশি, এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ থাকে যে, আল্লাহ তাআলা কিছু গুনাহ সম্পর্কে খুব কঠিনভাবে ইঁশিয়ার করেছেন, এ সব গুনাহের সঙ্গে জড়িতরা কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে বলে সতর্ক করেছেন। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও কিছু গুনাহকে বিধ্বংসী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিশুদ্ধ হাদিসে এ সব গুনাহকে কবির গুনাহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন-

১- আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। তিনি বললেন, কবির গুনাহসমূহের মধ্যে অধিক বড়ো গুনাহগুলো সম্পর্কে আমি কি তোমাদের সংবাদ দেব না? (তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন)। তা হলো- আল্লাহর সঙ্গে শরীক সাব্যস্ত করা, মাতা-পিতাকে কষ্ট দেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া অথবা মিথ্যা কথা বলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন হেলান- দেয়া অবস্থায় ছিলেন, তিনি বসলেন এবং তা বলেই চললেন। এমনকি আমরা পরিশেষে, মনে-মনে বললাম, তিনি যদি থামতেন। [মুসলিম, আস-সহিহ ২/৮২]

২- আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল আস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কবির গুনাহের মধ্যে একটি হলো মাতাপিতাকে গালি দেওয়া। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, কেউ কি তার মাতাপিতাকে গালি দেয়? তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তির পিতাকে সে গালি দেয়, অতঃপর সেও তার পিতাকে গালি দেয়, ঐ ব্যক্তির মাতাকে গালি দেয় অতঃপর সেও তার মাতাকে গালি দেয়।' [বুখারি ও মুসলিম]

আরও কিছু হাদিস আছে যেখানে কিছু গুনাহকে কবির গুনাহ বলা হয়েছে। বস্তুত কবির গুনাহ কয়টি তার সুনির্দিষ্ট সংখ্যা কোনো হাদিসে আসেনি। সুনির্দিষ্ট সংখ্যায় কবির গুনাহ সীমিত না-করার হেকমত-বোধহয়- মুমিনদের সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে উৎসাহ দেয়া, যাতে গুনাহ করতে গেলে কবির গুনাহ হয়ে যায় কি-না, এ আশঙ্কায় যেন তারা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়। তবে মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ আলেম, ছগিরা ও কবির এ দু-ভাগে গুনাহকে ভাগ করেছেন। এটা নিঃসন্দেহ যে প্রত্যেক গুনাহই, আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধাচরণ। আর আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধাচরণ মারাত্মক অপরাধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও গুনাহের নানা স্তর রয়েছে- কোনোটা হালকা আবার কোনোটা তার থেকেও হালকা। কবির গুনাহের সংজ্ঞা ও মানদণ্ড কবির গুনাহের সংজ্ঞায়নে এবং কবির গুনাহকে ছগিরা গুনাহ থেকে পার্থক্যকরণে আলেমগণ বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। [আলেমগণের বিভিন্ন মতামত জানতে দেখুন: আয্যাওয়াজের আন ইকতিরাফিল কাবায়ের ১/ পৃ.৪ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ; নববী প্রণীত সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ৩/৮৫ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।]

অধিকাংশ আলেমের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অভিমত হলো- যে গুনাহর বিপরীতে দুনিয়াতে সুনির্দিষ্ট শাস্তি (হদ) প্রয়োগের বিধান রয়েছে, জাহান্নামের শাস্তিভোগের ইঁশিয়ারি, লা'নত ও গযবের উপযোগী হওয়ার ধমক রয়েছে, সে গুনাহকেই কবির গুনাহ বলা হবে। ইবনে আববাস (রাযি.) ও হাসান আল বসরী র. এ অভিমতের পক্ষে রায় দিয়েছেন। [শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ, পৃ.৪১৮; নববী প্রণীত সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ২/৮৫]

ইমাম গায়ালী র. বলেছেন, প্রত্যেক ঐ গুনাহ যা করার সময় ব্যক্তির অন্তরে আদৌ কোনো ভয়ের উদ্রেক হয় না, কোনো লজ্জার অনুভূতি জাগ্রত হয় না, যেমন গুনাহকে তুচ্ছজ্ঞানকারী, নিভীকচিত্তে গুনাহকে নিজের অভ্যাসে পরিণতকারী। অতএব গুনাহ করার সময় যদি গুনাহকে তুচ্ছ মনে হয়, অগুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, তাহলে মনে করতে হবে, তা কবির গুনাহ। ছগিরা ও কবির গুনাহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আল-ইয়্য বিন আবদুস সালামের একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। তিনি তার কিতাব 'আল কাওয়াইদ' এ বলেন, 'আপনি যদি ছগিরা ও কবিরার মধ্যে পার্থক্য জানতে চান, তাহলে কোনো গুনাহের বিকার ও নেতিবাচক প্রভাবকে কোরান-সুন্নাহয় বর্ণিত কবির গুনাহের বিকার ও নেতিবাচক প্রভাবের সঙ্গে তুলনা করে দেখে নেবেন। যদি তা সমান-সমান হয়, তাহলে মনে করতে হবে যে তা কবির গুনাহ। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহকে গালি দিল, অথবা রাসুলকে গালি দিল, অথবা রাসুলগণকে তুচ্ছজ্ঞান করল, অথবা তাদের কাউকে অস্বীকার করল, অথবা ময়লা-আবর্জনা পবিত্র কোরান নিষ্ক্ষেপ করল তবে সে আকবারুল কাবায়ের, বড় থেকে বড় গুনাহ করল, যদিও শরীয়তে তা কবির গুনাহ নামে উল্লিখিত হয়নি। এ সবার অনিষ্ট-অকল্যাণ এতীমের সম্পদ অবৈধভাবে খাওয়া- পবিত্র টেক্সট অনুযায়ী যা কবির গুনাহ- থেকেও অধিক অকল্যাণবাহী। অনুরূপ মুসলমানদের গোপনীয় বিষয়গুলো কাফেরদের বলে দেয়া, এটা জানা সত্ত্বেও যে, এর ফলে কাফেররা মুসলমানদের মূলোৎপাটন করতে সক্ষম হবে, মুসলিম নারী ও শিশুদের বন্দী করতে সক্ষম হবে, মুসলমানদের সম্পদ মালে গণীমতে পরিণত করবে, মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করবে, তাদের ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত করবে। আর মুসলমানদের গোপনীয় বিষয় কাফেরদের বলে দেয়ার কারণে এ প্রকৃতির সুদূরপ্রসারী অকল্যাণ যা ঘটবে, তা যুদ্ধের দিন ওয়ার ছাড়া ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়ার অপরাধ থেকেও ঢের অকল্যাণবাহী যা কোরান সুন্নাহ অনুযায়ী কবির গুনাহ। তবে, অনিষ্ট-অকল্যাণের সমতা অথবা পার্থক্য নির্ণয় একটা কঠিন ব্যাপার। আল্লাহ যাদের তাওফীক দেন কেবল তারাই এটা পারেন। অনিষ্ট-অকল্যাণে দু-জিনিসের মধ্যে সমতা নির্ণয় পার্থক্য নির্ণয় থেকেও কঠিন। আর স্বার্থ ও অকল্যাণ নির্ণয়ের বিষয়টি আপেক্ষিক, অর্থাৎ দু-বিষয়ের অকল্যাণ কাটায়-কাটায় সমান হওয়া জরুরি নয়। [দেখুন কাওয়ায়েদুল আহকাম ১/৮৫]

এরপর তিনি বলেছেন, 'আলেমদের কেউ কেউ কবির গুনাহকে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায় আবদ্ধ করেছেন। তারা বলেছেন, কবির গুনাহ হলো প্রত্যেক ওই গুনাহ যার সঙ্গে শাস্তির হুঁশিয়ারি, হদ, লা'নত ইত্যাদি যুক্ত আছে... অতঃপর মুমিনকে হত্যা করা কবির গুনাহ; কেননা এর সঙ্গে শাস্তির হুঁশিয়ারি ও লা'নত যুক্ত আছে। মুসলমান কর্তৃক মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ, যিনা, চুরি, সতীত্বে অপবাদজ্ঞাপন ইত্যাদি কবির গুনাহ; কেননা এ সবার সঙ্গে হদ যুক্ত রয়েছে। একইভাবে প্রত্যেক ওই গুনাহ, যার অনিষ্টতা-শাস্তির হুঁশিয়ারি, লা'নত, হদ ইত্যাদি যুক্ত গুনাহের সমান হবে, সে-গুনাহও কবির গুনাহ বলে বিবেচিত হবে। [কাওয়ায়েদুল আহকাম ১/২৩-২৪]

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৭৫ : পরিশিষ্ট-০৩ : কয়েকটি কবির গুনাহ

পরিশিষ্ট-০৩ : কয়েকটি কবির গুনাহ ছগিরা-কবিরার পার্থক্য-বিষয়ে যে নীতিমালা উল্লেখ করা হলো, তা কেবলই আপেক্ষিক। আশা করি পাঠকমহোদয় এ ব্যাপারে ধারণা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। আপনি এটাও জেনেছেন যে, কিছু ছগিরা-কবিরার পরিচিত পবিত্র টেক্সটেই উল্লিখিত হয়েছে। এ ছাড়াও আরও অনেক গুনাহ রয়েছে, যার কোনোটি হয়তো ছগিরা, আবার কোনোটি হয়ত কবির। অতএব আপনার দায়িত্ব হলো, সকল প্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। পবিত্র টেক্সট যে গুনাহকে কবির বলেছে, তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা। অনুরূপ, যেসব গুনাহ কবির গুনাহের মধ্যে शामिल বলে আলেমগণ মতামত দিয়েছেন, সে সব থেকেও বেঁচে থাকা। গুনাহ যত ক্ষুদ্রই হোক, তা কখনো ছোট মনে না করা, গুরুত্বহীন মনে না করা; কেননা ছোট গুনাহ অবিরত করে যাওয়া কোনো কবির গুনাহ করার মতোই, আলেমগণ এরূপই বলেছেন। 'অবিরত করে যাওয়া'র অর্থ বার বার করে যাওয়া, যা দ্বীনের ব্যাপারে কোনো ব্যক্তির উদাসীন, গুরুত্বহীন হওয়ার আলামত। [কাওয়ায়েদুল আহকাম ১/৩৭]

অনুরূপভাবে ছগিরা গুনাহসমূহ অধিক মাত্রায় করা, হোক তা ভিন্ন-ভিন্ন গুনাহ, কোনো কবির গুনাহ করার অপরাধের চেয়ে কম নয়; কারণ ছগিরা গুনাহ অধিক মাত্রায় করে যাওয়ার অর্থ দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীন হওয়া, আল্লাহর মরজির বিপক্ষে কাজ করাকে তুচ্ছ মনে করা। এখানে আমি ইবনে হাজার আল-হায়ছামি-উল্লিখিত কিছু কবির গুনাহের বর্ণনা দিচ্ছি। তিনি তার মূল্যবান গ্রন্থ (আয-যাওয়াজের আন ইকতিরাফিল কাবায়ের) - এ কিছু কবির গুনাহ এভাবে উল্লেখ করেন, বড় শিরক। ছোট শিরক। রিয়া। না-হক রাগ। হিংসা-বিদ্বেষ। কবির। অহংকার। দস্ত। প্রতারণা। নিফাক। দুরাচার। তুচ্ছ মনে করে মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। লোভ-লালসা। ভাগ্যের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ। ধনীদেবের প্রতি চোখ ফেরানো এবং ধনাঢ্যের কারণে তাদের তাশীম করা। দারিদ্র্যের কারণে দরিদ্রদের নিয়ে বিদ্রূপ করা। দুনিয়া অর্জনে পরস্পরে প্রতিযোগিতায় নামা। দুনিয়ার অর্থসম্পদ নিয়ে বড়াই করা। যা হারাম তা ব্যবহার করে মানুষের জন্য সৌন্দর্য অর্জন। অযাচিত তোষামোদ। ব্যক্তি যা করেনি, তার বিনিময়ে প্রশংসা পেতে চাওয়া। আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অন্য কিছুর ব্যাপারে গোঁড়ামি করা। আল্লাহর আদেশ-নিষেধাঙ্গা হালকা মনে করা। কামনা-বাসনার অনুসরণ করা এবং সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। মুসলমানের ব্যাপারে কু-ধারণা রাখা। নিজের খেয়াল-খুশির বিপরীত হলে অথবা এমন ব্যক্তির মাধ্যমে তা প্রকাশ পেলে যাকে সে অপছন্দ করে, সত্যকে বর্জন করা। গুনাহ করার পর খুশি হওয়া এবং গুনাহ থেকে বিরত না হওয়া। আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যাওয়া, পরকাল ভুলে যাওয়া। আল্লাহ তাআলার পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা। একের পর এক গুনাহ করে যাওয়া। আল্লাহর ব্যাপারে খারাপ ধারণা করা। আল্লাহর রহম থেকে নিরাশ হওয়া। দ্বীনি ইলম দুনিয়া অর্জনের জন্য শেখা। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করা। মানুষের মধ্যে কোনো খারাপ ধারা চালু করে দেওয়া এবং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুল্লত পরিত্যাগ করা। অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। ফাসেক-জালেমদের মহব্বত করা। নেককারদের ঘৃণা করা এবং তাদের কষ্ট দেওয়া। এমন কথা বলা যার অনিষ্টতা ব্যাপক, যার ক্ষতি সব দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং আল্লাহর তাআলার অসন্তুষ্টির কারণ হয়। হারাম খেল-তামাশায় মত্ত থাকার ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম এলে তার ওপর দরুদ না পড়া। কবির গুনাহয় সন্তুষ্টি প্রকাশ এবং তা করতে অন্যকে সাহায্য করা। দুষ্কর্ম ও অশ্লীলতা এমনভাবে আঁকড়ে ধরা যে মানুষের মধ্যে তার ব্যাপারে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

কোরান ভুলে যাওয়া। ঝগড়া-বিবাদ করা। আল কোরান পরাজিত হোক বা দ্বীন পরাজিত হোক, এ ধরনের বাসনা পোষণ করা। শরীর ও কাপড়ে পেশাবের নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন না করা। নিষ্প্রয়োজনে সতর উন্মুক্ত করা। মাসিক চলা অবস্থায় সহবাস করা। ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দেয়া, অথবা সুনির্দিষ্ট সময়ের পড়ে আদায় করা, অথবা সফর, অসুস্থতার ওয়র ছাড়াই সময়ের পূর্বেই নামাজ আদায় করা। মুসল্লীদের অপছন্দ সত্ত্বেও ইমামতি চালিয়ে যাওয়া। নামাজের কাতার ভঙ্গ করা, কাতার সোজা না করা, ইমাম যে জায়গায় দাঁড়ান মুসল্লী সে জায়গার আগে দাঁড়ানো। কবরকে মসজিদে পরিণত করা, কবরে বাতি জ্বালানো এবং বরকত বা ছাওয়াবের আশায় কবর চুম্বন-স্পর্শ করা। নারীর একাকী সফর করা। কুলক্ষণে বিশ্বাস করে সফরে রওনা হওয়া থেকে বিরত হয়ে যাওয়া অথবা সফর থেকে ফিরে আসা। ওয়র ছাড়া জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় ছেড়ে দেওয়া। জুমার দিন মানুষের ঘর ডিঙ্গিয়ে সামনের দিকে যাওয়া। শরীয়তসম্মত ওয়র ছাড়া পুরুষের নিরেট সিল্কের কাপড় পড়া। পুরুষের সোনার অলংকার পড়, অথবা আংটি ছাড়া অন্যকোনো রূপার অলঙ্কার পড়া। পুরুষের, কথায়-বার্তায়, চলা- ফেরায়, পোশাক- আশাকে নারীর সাদৃশ্য অবলম্বন। অনুরূপভাবে নারীর পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন। চলার সময় দম্ভ-গর্ব প্রকাশ করে চলা। বিপদাক্রান্ত হলে গাল চাপড়ানো, পকেট ফাঁড়া, চিল্লিয়ে কান্না করা, আমার ধ্বংস হউক, আমার মৃত্যু হউক বলে দোয়া করা। জাকাত পরিত্যাগ করা, অথবা শরীয়তসম্মত ওয়র ছাড়া যথাসময়ে আদায় না করা। ঋণগ্রহীতার দুরবস্থা জানা সত্ত্বেও ঋণদাতার নিষ্করণ হওয়া। দান করার পর খোটা দেয়া। কারও কাছে-থাকা অতিরিক্ত পানি পিপাসিত-প্রয়োজনগ্রস্তকে না দেওয়া। রমজানের কোনো রোজা ছেড়ে দেওয়া। সফর অথবা অসুস্থতার ওয়র ছাড়া রমজানের রোজা ভেঙ্গে ফেলা। দুই ঈদের দিনে ও আইয়ামে তাশরীকে রোজা রাখা। সক্ষমতা সত্ত্বেও হজ না করা। মাদকদ্রব্য সেবন করা, হোক তা মদ, হিরোইন বা আফিম। শূকরের গোশত খাওয়া অথবা মৃত জন্তুর গোশত খাওয়া। সুদ খাওয়া, খাওয়ানো, সুদের চুক্তি লেখা অথবা সাক্ষী হওয়া, সুদভিত্তিক লেনদেনে শ্রম দেয়া, এ ব্যাপারে কাউকে সাহায্য করা। অবৈধ বেচা-কেনা ও সকল প্রকার হারাম উপার্জন থেকে আসা সম্পদ ভক্ষণ করা। বাজারে না ছেড়ে পণ্য আটকে রাখা। ব্যবসায় প্রতারণা করা। মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য চালিয়ে দেওয়া। মাপে কমবেশ করা। চাওয়া সত্ত্বেও পাওনা পরিশোধ করতে ধনী ব্যক্তির গড়িমসি করা। পিতৃহারা ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা। হারাম কাজে অর্থ ব্যয় করা। যতটুকু প্রয়োজন, অহংকারসরূপ, তার থেকেও অতিরিক্ত বিল্ডিং নির্মাণ। ব্যবসায়িক অংশীদার অথবা এজেন্টের খেয়ানত করা। অন্যায়ভাবে কারও সম্পত্তি দখল করে নেওয়া। শ্রমিককে মজুরি দিতে দেরি করা, অথবা কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর তা না দেওয়া। বৈধ মাল হস্তগত করা এবং বিপদগ্রস্ত মুসাফিরকে তা না দেওয়া। কারো কাছে রাখা আমানত অস্বীকার করা, পণ হিসেবে রাখা জিনিস অস্বীকার করা, ভাড়া-নেওয়া জিনিস অস্বীকার করা ইত্যাদি। ইবনে হাজার র. আরও কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে আরও অধ্যয়নের জন্য তার বইটি পড়ে দেখার অনুরোধ করছি। [দেখুন: আয-যাওয়াজের আন ইকতিরাফিল কাবায়ের, ১ম ও ২য় খন্ড]

কিতাবুল ইমান : প্রবন্ধ নং- ৭৬ : পরিশিষ্ট-০৪ : পাপের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের উপায়

পরিশিষ্ট-০৪ : পাপের শাস্তি থেকে মুক্তিলাভের উপায় মুমিন ব্যক্তির দ্বারা কোনো পাপকর্ম হয়ে গেলে নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহ তাআলা পাপীদের জন্যও তার রহমতের দরজা উন্মুক্ত রেখেছেন। পাপীরা যদি ঐকান্তিক হয়, আল্লাহর তাকওয়া অন্তরে ধারণ করে, তবে তারা আল্লাহর- দেওয়া সুযোগগুলো গ্রহণ করে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে জাহান্নাম থেকে বেঁচে যেতে পারে। কোরান-সুন্নাহয় পাপমুক্তির কি কি কারণ বলা হয়েছে, তা আলেমদের কেউ কেউ একত্র করেছেন। আমরা এখানে আকীদায়ে তাহাবিয়া থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরব। আকীদায়ে তাহাবিয়ার ব্যাখ্যাকার বলেন, 'দশ কারণে পাপকারীর জাহান্নামের শাস্তি মাফ হয়ে যেতে পারে। আমি কোরান-সুন্নাহ ঘেঁটে এ দশটি কারণ বের করতে সক্ষম হয়েছি। আর তা হলো,

প্রথম কারণ : তাওবা।

আল্লাহ তাআলা বলেন, خَلْفَ بَعْضِهِمْ مِنْ فَخْلٍ غِيًّا يَلْقَوْنَ فَسُوفَ الشَّهَوَاتِ وَاتَّبِعُوا الصَّلَاةَ أَضَاعُوا شَيْئًا يُظْلَمُونَ وَلَا الْجَنَّةَ يَدْخُلُونَ فَأُولَٰئِكَ صَالِحًا وَعَمِلَ

তাদের পরে আসল এমন এক অসং বংশধর যারা সালাত বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। তবে তারা নয় যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সংকর্ম করেছে; তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না। ১'- (সূরা মারয়াম, ৬০-৬১)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, ثَابُوا الَّذِينَ إِلَّا الرَّحِيمُ التَّوَابُ وَأَنَا عَلَيْهِمْ أَثُوبُ فَأُولَٰئِكَ وَابْيَأُوا وَأَصْلَحُوا 'তারা ছাড়া, যারা তাওবা করেছে, শুধরে নিয়েছে এবং স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। অতএব, আমি তাদের তাওবা কবুল করব। আর আমি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু' - (সূরা আল বাকারা, ১৬০)।

তবে যে তাওবার দ্বারা গুনাহ মাফ হয়, সে তাওবা হলো তাওবায়ে নাসুহ - ঐকান্তিক তাওবা যার শিকড় অন্তরের গভীরে প্রোথিত, যার সঙ্গে কৃত-পাপের জন্য লজ্জিত হওয়া, দ্বিতীয়বার তা না করার প্রতি সুদৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করা এবং সংকাজ করা জরুরি। অতএব, কেবল মৌখিক উচ্চারণে তাওবা করলে গুনাহ মাকফের জন্য তা যথেষ্ট হবে না। তাওবা গুনাহ মাকফের কারণ হওয়া এবং শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের কারণ হওয়ার ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই। আর বান্দার সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়ার একমাত্র পথই হলো তাওবা।

আল্লাহ তাআলা বলেন, الَّذِينَ عِبَادِي يَا قُلِ جَمِيعًا الذُّنُوبَ يَغْفِرُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ مَنْ تَقَنَّنُوا لَا أَنْفُسِهِمْ عَلَى أَسْرَفُوا الرَّحِيمِ الْغَفُورُ هُوَ إِنَّهُ

‘বল, ‘হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজদের উপর বাড়াবাড়ি করেছে তোমরা আল্লা-হর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’ - (সূরা আয-যুমার)। দ্বিতীয় কারণ : ইস্তিগফার বা কৃত-গুনাহর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করা ।

وَهُمْ مُعَذِّبُهُمْ ٱللَّهُ كَانَ وَمَا

يَسْتَغْفِرُونَ

‘এবং আল্লাহ তাদেরকে আজাব দানকারী নন
এমতাবস্থায় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে’ - (সূরা আল আনফাল, ৩৩)।

ইস্তিগফার তাওবার মধ্যে শামিল। তবে ইস্তিগফার তথা কৃত-পাপের জন্য আল্লাহর কাছে
ক্ষমাপ্রার্থনা করা তাওবারই একটি ধাপ। অর্থাৎ তাওবা করতে হলে কৃত-পাপের জন্য লজ্জিত
হতে হয়। ইস্তিগফার, লজ্জিত হওয়ার সে মানসিকতারই প্রকাশ। তাওবায় ইস্তিগফারের
অতিরিক্ত যে বিষয়টি রয়েছে, তা হলো, ভবিষ্যতে গুনাহ না-করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রত্যয়
পোষণ করা।

তৃতীয় কারণ : নেক-আমল করা ।

يُذْهِبْنَ ٱلْأَسَئَاتِ إِنَّ

ٱلسَّيِّئَاتِ

‘নিশ্চয়ই ভালকাজ মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয়’ -

(সূরা হূদ, ১১৪)।

চতুর্থ কারণ : পার্থিব বিপদ-আপদে আক্রান্ত হওয়া পার্থিব বিপদ-আপদে আক্রান্ত হওয়া
গুনাহ মাকের কারণ।

হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যা-
কিছু মুমিনকে আক্রান্ত করে- কষ্ট-যাতনা, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, বিষণ্ণতা এমনকি কাটার ঘা-
আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন।’ [বুখারি ও মুসলিম]

বিপদ-আপদে আক্রান্ত হওয়া গুনাহ মাকের কারণ। উপরন্তু, ব্যক্তি যদি
বিপদে ধৈর্য ধরে, তবে গুনাহ মাকের পাশাপাশি অতিরিক্ত ছাওয়ার পাবার উপযোগী হয়ে
যায়। আর যদি অসন্তোষ প্রকাশ করে, তা হলে বিগত গুনাহর সঙ্গে নতুন
গুনাহ সংযুক্ত করে নেয়। এরপর যা থাকে তা হলো বিপদ-মুসিবতের মাধ্যমে শুধু গুনাহ
মাফ হওয়া।

পঞ্চম কারণ : কবরের আজাব।

ষষ্ঠ কারণ : কিয়ামত-দিবসের ভীতি ও কঠিন অবস্থা।

সপ্তম কারণ : আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের ময়দানে যাদের সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন,
তাদের সুপারিশের মাধ্যমে পাপীদের গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়া।

অষ্টম কারণ : দয়াময়-পরম দয়ালু আল্লাহ তাআলার ক্ষমা।

لَ ٱللَّهُ إِنَّ

يَشَاءُ لِمَنْ ذَٰلِكَ دُونَ مَا وَيَغْفِرُ بِهِ يُشْرِكُ أَنْ يَغْفِرَ

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে

ক্ষমা করেন না। তিনি ক্ষমা করেন এ ছাড়া অন্যান্য পাপ, যার জন্য তিনি চান’ - (সূরা
আন-নিসা, ৪৮)।

নবম কারণ : ব্যক্তির জীবদ্দশায় অথবা মৃত্যুর পর তার জন্য মুমিনদের দোয়া ও
ইস্তিগফার।

দশম কারণ : বিভিন্ন আমল, যেমন সদাকা, কোরান তিলাওয়াত, হজ ইত্যাদির ছাওয়াব যা মুমিন বান্দার জন্য হাদিয়া হিসেবে পাঠানো হয়। আহলে সুন্নত এ ব্যাপারে একমত যে, মুমিন মৃত ব্যক্তির জীবিতদের বিভিন্ন কাজ থেকে দুভাবে উপকৃত হয়।

প্রথমত : ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় যে কাজের কারণ হয়েছে।

হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মানুষ যখন মারা যায়, তার আমল রহিত হয়ে যায়, তবে তিন বিষয় ব্যতীত, সদাকায়ে জারিয়া অথবা নেক-সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে অথবা এমন ইলম যার দ্বারা তার মৃত্যুর পর উপকৃত হওয়া যায়।' [মুসলিম]

দ্বিতীয়ত : মুসলমানদের দোয়া, ইস্তিগফার, সদাকা, হজ ইত্যাদি। তবে ইবাদতে বাদানিয়া যেমন-নামাজ, রোজা, কোরান তিলাওয়াত, যিকির ইত্যাদির ব্যাপারে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আহমদ ও অধিকাংশ সালাফদের মতানুযায়ী এ আমলের ছাওয়াব মৃতব্যক্তি পেয়ে যায়। আর শাফেঈ ও মালেকি মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত হলো, এ সবার ছাওয়াব মৃতব্যক্তির কাছে পৌঁছায় না। এমন আমল যাতে মৃতব্যক্তির কোনো হাত নেই, তার দ্বারা মৃতব্যক্তির উপকৃত হওয়ার দলিল--

وَالَّذِينَ
سَبَقُونَا الَّذِينَ وَلِإِخْوَانِنَا لَنَا اغْفِرْ رَبَّنَا يَقُولُونَ بَعْدَهُمْ مِنْ جَاءُوا
بِالْإِيمَانِ

‘যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন’ - (সূরা আল হাশর, ১০)।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঐ সব মুমিনদের প্রশংসা করেছেন, যারা তাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হওয়া মুমিনদের জন্য ইস্তিগফার করে। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, জীবিত মুমিনদের ইস্তিগফার থেকে মৃত মুমিনরা উপকৃত হয়। জীবিতদের দোয়ার দ্বারা মৃতদের উপকৃত হওয়ার দলিল হলো জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় কালে, জানাজার নামাজে ও দাফনের পর মৃতব্যক্তিদের জন্য দোয়া করা বৈধ হওয়া।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের শেখাতেন যে, তারা যখন কবরস্থানে যাবে, বলবে, ‘আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীরা, আমরা, ইনশাআল্লাহ, আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হব। আমরা আমাদের জন্য ও আপনাদের জন্য পরিগ্রাণ প্রার্থনা করি। [মুসলিম]

মৃতব্যক্তির কাছে সদাকার ছাওয়াব পৌঁছায়, এ ব্যাপারে আয়েশা (রাযি.) থেকে এক বর্ণনায় এসেছে,

তিনি বলেন, ‘একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমার মা মারা গেছেন। তিনি কোনো ওসিওত করে যাননি। আমার ধারণা, তিনি যদি কথা বলতেন, তবে সদাকা করতেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে সদাকা করি, তবে কি তিনি ছাওয়াব পাবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পাবে।’ [বুখারি ও মুসলিম]

হজের ছাওয়াব মৃতব্যক্তির কাছে পৌঁছার ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বুখারির এক বর্ণনায় এসেছে যে, জুহাইনা গোত্রের জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এল এবং বলল, আমার মা হজ করবেন বলে মানত করেছেন। তবে তিনি হজ করার পূর্বেই মারা গেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ করে দেব? তিনি বললেন, তার পক্ষ থেকে হজ করো, যদি তোমার মায়ের ওপর কোনো ঋণ থাকত, তবে কি তুমি তার পক্ষ থেকে আদায় করতে না? আল্লাহর হক আদায় করো; কেননা হকপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাঁর অধিকারই বেশি।' [বুখারি]

এ বক্তব্যের সঙ্গে নিম্নবর্ণিত আয়াতসমূহের কোনো সংঘর্ষ নেই,

سَعَى مَا

إِلَّا لِلْإِنْسَانِ لَيْسَ وَ أَنْ

‘আর এই যে, মানুষ যা

চেষ্টা করে, তাই সে পায়’ - (সূরা আন-নাজম, ৩৯)।

كَسَبَتْ مَا لَهَا

সে যা অর্জন করে তা তার

জন্যই’ - (সূরা আল বাকারা, ২৮৬)।

مَا إِلَّا تَجَزُونَ وَلَا

تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ

এবং তোমরা যা আমল

করছিলে শুধু তারই প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে’ - (সূরা ইয়াসীন, ৫৪)।

কেননা একজন মানুষ, ইসলাম গ্রহণের পর অন্যান্য মুসলমানের সঙ্গে ঈমানী ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যখন তাদের সঙ্গে সদাচারী হয়, কল্যাণকামী হয়, তাদের উপকারসাধন করে, এসবের মাধ্যমে বস্তুত সে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে মানুষের দোয়া পাওয়ার সাধনা চালিয়ে যায়। অর্থাৎ মানুষ তার জন্য দোয়া করবে, ইস্তিগফার করবে, তার প্রতি যাতে আল্লাহ তাআলা রহমত-করুণা বর্ষণ করেন সে জন্য প্রার্থনা করবে, বিভিন্ন আমলের ছাওয়াব তার জন্য হাদিয়া হিসেবে পাঠাবে। আর তাই এ পরকালীন অর্জন বান্দার ইহকালীন চেষ্টাসাধনারই ফসল। অতএব মুসলমান ভাইদের পক্ষ থেকে তাদের মৃত ভাইদের জন্য যে ছাওয়াব পাঠানো হয় তা পৌঁছার সঙ্গে উল্লিখিত আয়াতসমূহের কোনো সম্পর্ক নেই; কারণ এ সব আয়াত মুহকাম, যা আল্লাহর ইনসাফের দাবিকে উপস্থাপন করছে, একজনের পাপের শাস্তি অন্যজনকে দেওয়া হবে না, এ কথা ব্যক্ত করছে। যেমন দুনিয়ার রাজা-বাদশারা করে থাকে। উক্ত আয়াতগুলোর আরও একটি দাবি হচ্ছে যে, পরকালে মানুষ নিজের আমলের মাধ্যমেই সফলকাম হবে; যাতে বাপদাদা, পূর্বপুরুষ, উস্তাদ-মুরবিব এদের আমল দ্বারা উপকৃত হওয়ার আশা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। বলে রাখা ভালো যে, কিছু এমন আচার-অভ্যাস ও বিদআত আছে যা উল্লিখিত বর্ণনার মধ্যে शामिल হয় না। এ ব্যাপারে শরীয়তের কোনো দলিলও আসেনি। আলেমদের মধ্যে এরূপ কাজ বৈধ হওয়ার পক্ষে কেউ সাক্ষ্য দেননি। যেমন- মানুষ ভারা করে এনে তাদের দিয়ে কোরান তিলাওয়াত করানো। আলেমদের কেউ-ই এ কাজ জায়েয বলেননি। হ্যাঁ, কুরআনের শিক্ষক হিসেবে কাউকে টাকার বিনিময়ে নিয়োগ দেওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। কিন্তু টাকার বিনিময়ে কাউকে দিয়ে কোরান পড়িয়ে নেওয়া এবং সে পড়ার ছাওয়াব মৃতব্যক্তিকে হাদিয়া হিসেবে দেওয়া, অথবা টাকার বিনিময়ে কাউকে দিয়ে নামাজ পড়ানো, রোজা রাখানো এবং এর ছাওয়াব হাদিয়া হিসেবে মৃতব্যক্তিকে প্রদান করা না-জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কেউ ইখতিলাফ করেননি। হ্যাঁ, যদি কেউ স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে, টাকা না নিয়ে, কোরান তিলাওয়াত করে তবে তার ছাওয়াব মৃতব্যক্তির কাছে পৌঁছাবে।

অনুবাদ : ড. মাওলানা শামসুল হক সিদ্দিক